সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

৪৪

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বাঁশি।

——:*:——

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা—প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেচে। অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখ-দুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কি করে? কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজ্‌চে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈববাণীতে এ সব বার্ত্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দ্দা একটানে ছেড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্চে

কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠ্ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখ্লেম—তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দু'গাছি মল,—সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ বলে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন্ ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভ্যতার কষ্টিপাথর।

——:*:——

বনে যেমন অনেক রকম ফুল থাকে, যাদের চেহারা দেখলেই তাদের শুঁকতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু পরিমল লোভীকে তাদের নিকট হতে শেষে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়, সেইরূপ সাহিত্য-কাননেও অনেক ফুল আছে যাদের বাহ্যিক চাকচিক্যই তাদের একমাত্র সম্বল। সে দিন জনৈক বন্ধুর হাতে ডাক্তার ফারেল লিখিত "Modern man & his Forerunners" বলে একখানি বই দেখলুম। বইটির নাম, মলাট, ছবি প্রভৃতি আমার মনকে গ্রেপ্তার করে বসল। ধার নিয়ে সেটিকে আদ্যোপান্ত পড়লুম। পড়ে কিন্তু লেখকের উপর রাগও হল আর মায়াও জন্মাল। রাগ হল তাঁর অদ্ভুত materialistic মতগুলো দেখে, আর মায়া হল তাঁর ঐতিহাসিক অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে। লেখক পুস্তকের উপক্রমণিকায় বলেছেন যে তিনি ১৫।১৬ বৎসরের গবেষণার পরে বইটি লিখেছেন। যদি তাই হয় তাহলে আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে তিনি যদি ইতিহাস চর্চ্চা ছেড়ে ডাক্তারিতে মনোনিবেশ করেন তাহলে তাঁর পক্ষে ও জগতের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।

(২)

লেখক সভ্যতা নামক জিনিসটির ধর্ম্ম নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের নামই হচ্চে

সভ্যতা। যে জাত এ বিষয় যত বেশি কৃতিত্ব লাভ করেছে সেই জাতিই তত বেশি সভ্য। প্রকৃতির উপর আধিপত্যই হচ্চে সভ্যতার কষ্টি-পাথর। কোনো জাতির সভ্যতার পরিচয় নিতে হলে তার এই ক্ষমতার খবর নিতে হবে। ডাক্তার ফারেল আরও বলেন যে দাসত্বই হচ্চে সভ্যতার বনেদ। দাসত্বের উপর ভর করেই সভ্যতার চারুহর্ম্ম্য সর্ব্বস্থানে গঠিত হয়ে উঠেছে। দাসত্ব কোন না কোন আকারে সব সভ্যদেশেই বর্ত্তমান আছে। যে দিন এই মঙ্গলময় দাসত্ব প্রথা উঠে যাবে, সে দিন সভ্যতাও ভিত্তিহীন অট্টালিকার ন্যায় অচিরাৎ ধূলিসাৎ হবে। এইরূপ খেয়ালের চশমা দিয়ে বর্ত্তমান যুগকে নিরীক্ষণ করে যে ডাক্তার সাহেবের মনে কতকটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। জনসাধারণ চারিদিকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার পাবার জন্য চীৎকার করচে, মারামারি কাটাকাটি করচে, বিপুল অন্দোলন করচে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত একচেটে ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্চে। এই সব দেখেশুনে লেখক নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। ফলে সভ্যতার, বিশেষত ইউরোপীয় সভ্যতার, স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মেছে।

(৩)

লেখক সভ্যতার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং যে-সামাজিক প্রথাকে সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ রূপে নির্দ্ধারিত করেছেন, প্রকৃত ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে সভ্যতার বিলোপের উপর চোখের জল ফেলবার বিশেষ কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। রুশো (Rousseau) বলেছেন "আমি যদি কোন বর্ব্বর দেশের রাজা হই

তা হলে যে ব্যক্তি সে দেশে সভ্যতার আমদানী করবে ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবো"। লেখক সভ্যতার যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা পড়ে রুশোর সঙ্গে সায় দেবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে। জগতের উন্নতি যদি কষাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর দাসের শ্রমার্জ্জিত সম্পদের নাম হয়, তাহলে সে উন্নতির শেষ যবনিকার যত শীঘ্র পতন হয় ততই মঙ্গল। সভ্যতার যদি কোন আধ্যাত্মিক অর্থ না থাকে, তাহলে সে সভ্যতার দ্বারা মানবের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হতে পারে না। বাহুবলের সঙ্গে যদি নৈতিক বলের বিকাশ না হয়, তাহলে সেটা একটা মহা ভয়াবহ বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

(৪)

লেখক যে সামাজিক অবস্থাকে সভ্যতার পরিচায়ক বলে বর্ণনা করেছেন তার দৃষ্টান্তের জন্য পুরাকালের ইতিহাসের জীর্ণ নথি খোলবার দরকার নেই, একবার বর্ত্তমান জগতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যাবে। এই গত জুন মাসের Edinburgh Revew-এ Mr. W. C. Soully "The Colour Problem in South Africa" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেটি পড়ে বোঝা যায় যে ডাক্তার ফারেল নিরুপিত সভ্যতার গুণনিচয় দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করচে। সেখানে মানুষ প্রকৃতির উপর দৃঢ়রূপে আধিপত্য স্থাপন করেছে, সেখানে শ্রেণীবিভাগ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করচে এবং দাসত্ব তার ক্রূর অট্টহাসিতে দিগন্ত মুখরিত করছে। Mr. Soully

বলেন " within the union limits there is a population of six million souls, only a million and a quarter of whom are Europeans and throughout the greater area comprised by the four provinces—Cape, Transval, Free State and Natal—such a stringent and illiberal colour line is drawn that not alone have the non-European inhabitants, no voice in the management of the country but their social and economic conditions are such as to practically debar them from advancement. Moreover they are subjected to vexations, discriminating laws and are the victims of a deep and growing race-prejudice on the part of the Europeans." দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়, ডাক্তার ফারেল যা চান, তাই আছে। কিন্তু তাই বলেই কি, দক্ষিণ আফ্রিকা সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হবে? এই কি সেই সভ্যতা যার জন্য কোনো মানুষের মত মানুষ অকাতরে আত্ম বলিদান করতে পারে? এই কি সেই সভ্যতা যা নিয়ে আমরা এত গৌরব করে বেড়াই?

(৫)

এই গত ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মাণীর প্রতিপক্ষ দলের লেখকগণ, জার্ম্মাণীকে নানা বিশেষণে বিভুষিত করেন। জার্ম্মাণদের বলা হয় সভ্য-বর্ব্বর (Civilized Barbarian)। কথাটি অর্থহীন নয়, কারণ এর মর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ কথাটির দ্বারা কি এ সত্যের

প্রকাশ হয় না যে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য ছাড়া অন্য কোন গুণের অস্তিত্ব না থাকলে একটা জাতিকে সভ্য বলে গণ্য করা যায় না। জার্ম্মাণদের মধ্যে বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, বিজ্ঞান ছিল, organization ছিল, কিন্তু তবুও তারা বর্ব্বর। কেন?—প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলবেন যে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, অপরের অস্তিত্বের সত্ত্ব তারা স্বীকার করে না, রাজনীতিতে যে ন্যায় অন্যায় পথ বলে একটা কথা আছে সেটা তারা মানে না, জাতীয় চুরি যে ব্যক্তিগত চুরির ন্যায় দোষনীয় একথা তারা বোঝে না, ইত্যাদি।

(৬)

কি কি গুণের ও ক্ষমতার সমাবেশ একটি জাতির মধ্যে ঘটলে তাকে সভ্য নামে অভিহিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে মত ভেদ আছে এবং থাকাও স্বাভাবিক, তবে একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে সভ্যতা নামক বিশেষণটি কেবল বাহুবলের নামান্তর মাত্র নয়। একজন আততায়ী যদি বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে তার পৈশাচিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে সুকৌশলে ব্যবহার করতে শেখে, আমরা তার জন্য তাকে, তার সভ্যতাকে আশীর্ব্বাদ করব না। সভ্যতার সম্বন্ধ পাশবিক ক্ষমতার সঙ্গে নয়—নৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে। বাহুবলের সঙ্গে সভ্যতার সম্বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু সে সম্বন্ধ নিত্য নয়—নৈমিত্তিক। যিশু খৃষ্ট একজন নিঃসহায় ব্যক্তি ছিলেন আর যে Pilate নাকি তাঁকে ক্রুশে টাঙিয়ে ছিল, সে ছিল একজন ক্ষমতাশালী রোম-প্রতিনিধি। রোমের

অতুলনীয় ক্ষমতা তার ইঙ্গিতে চলত। কিন্তু তাই বলে কি Pilate-কে যিশু অপেক্ষা বেশি সভ্য বলতে হবে? ব্যক্তিগত কথা ছেড়ে, জাতির কথাই নিন। নব্যযুগের গ্রীসের বিজ্ঞানবল প্লেটোর যুগের এথেন্স অপেক্ষা অনেক বেশি। এখন গ্রীসে রেল-গাড়ী আছে, মোটর ছুটছে, ষ্টিমার চলছে, তোপ, কামান, বন্দুক, কল-কারখানা সবই আছে, আর প্রাচীন এথেন্সে এসবের কোন চিহ্নই ছিল না। এ সব সত্বেও প্লেটোর এথেন্স কে আমরা নবীন গ্রীস অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। এর কারণ কি?—এর কারণ হচ্চে এই যে, প্রাচীন এথেন্সে মানবাত্মার যে বিকাশ হয়েছিল আজকালকার গ্রীসে তার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনের মূল উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে এথেন্স যে ব্যগ্রতা দেখিয়েছিল এখনকার গ্রীসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের চেষ্টা এথেন্সই করেছিল এখনকার গ্রীসে সে চেষ্টা নেই। এবং উক্ত মহান্ উদ্দেশ্যদ্বয়ের অনুশীলনে এথেন্সের যে কৃতিত্ব লাভ হয়েছিল এখনকার গ্রীসের তা স্বপ্নেরও অগোচর। এইজন্যই আমাদের নিকট প্রাচীন এথেন্সের এত কদর। এই একই কারণে আমরা প্রাচীন ভারতকে নব্য ভারত অপেক্ষা এবং গেটের জার্ম্মাণীকে নব্য জার্ম্মাণী অপেক্ষা বেশি মহামূল্য বলে মনে করি।

(৭)

সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যেমন আমাদের অন্তরে বিচার-বুদ্ধি নামক একটা ক্ষমতা আছে, ভালমন্দ প্রশংসনীয় নিন্দনীয় নিরূপণের জন্যও আমাদের সেইরূপ একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটির

বাঙলা নাম হচ্ছে ধর্ম্মজ্ঞান, আর ইংরাজিতে তাকে বলে "The sense of right and wrong." ক্যাণ্ট সেটাকে Practical Reason বলেছেন। এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির দ্বারা যে জিনিসটি অনুমোদিত হয় সেটি হচ্ছে বাঞ্ছনীয়—good. এই বুদ্ধির প্রাচুর্য্য যে জাতির মধ্যে ঘটেছে সেই জাতিই সভ্য আর যে জাতির অবস্থা ইহার বিপরীত, সে জাতিই বর্ব্বর। এই ন্যায়ান্যায় জ্ঞানই হচ্ছে সভ্যতার বিচারক। এর দ্বারা যাচাই করেই আমরা জানতে পারি যে কোন্ জাতি সভ্য আর কোন্ জাতি অসভ্য।

(৮)

কোন্ কোন্ ব্যক্তিগত এবং জাতীয় গুণ প্রশংসনীয়, কোন্ কোন্ গুণ নিন্দনীয়, সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তর মতভেদ আছে। এই মতভেদ-বশত কোন কোন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, morality ও এক রকম রুচি বিশেষ। একই কাজ এক জনের নিকট প্রশংসনীয় এবং অন্য জনের নিকট নিন্দনীয় বিবেচিত হয়। নৈতিক কর্ম্মের মধ্যে এমন কোন সাধারণ গুণ (common element) নেই যাকে সকলেই শিরোধার্য্য করে নিতে পারে। যদি থাকত তাহলে এ বিষয়ে এরূপ ব্যক্তিগত ও জাতিগত মতবৈষম্য দেখা যেত না। ভাল মন্দের বিচারও জ্যামিতির সিদ্ধান্তের মত অকাট্য হত। তাঁরা বলেন আমাদের ভাল মন্দের বিচার কতকটা খাদ্যদ্রব্যের উপাদেয়তার বিচারের ন্যায়। দুই ব্যক্তির মধ্যে যেমন কাঁটাল এক জনের নিকট অমৃততুল্য অনুভূত হয় এবং সেই একই ফল দ্বিতীয় ব্যক্তির বমনেচ্ছা আনয়ন করে, সেইরূপ মাতৃ-হত্যাও কারও নিকট এক বিষম পাপ

রূপে অনুভূত হয় এবং কেউ তাকে একটা প্রশংসনীয় কাজ বলে মনে করে। কাঁটাল সম্বন্ধে রুচির বিভিন্নতা যেমন একটা ব্যক্তিগত জিনিস, মাতৃহত্যা সম্বন্ধে মতভেদও ঠিক সেইরূপ একটা ব্যক্তিগত রুচি-ভেদ মাত্র। সার্ব্বভৌমিক নীতি (Universal moral Law) বলে কোন জিনিস নেই, ওটা একটা অলিক স্বপ্ন মাত্র।

(৯)

এই জাতীয় দার্শনিক এ কথা ভুলে যান যে, যদি কোন রুক্ষ মেজাজের লোক তার এই অদ্ভুত মত শুনে ধৈর্য্য হারিয়ে লাঠি মেরে তাঁকে ঘায়েল করে বসে, তাহলে তিনিই তারস্বরে বলে উঠবেন—লোকটির সাজা হওয়া উচিত। জজ-সাহেব যদি রায়েতে লেখেন যে রুচির বিভিন্নতা দোষণীয় নয়, অতএব আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হোক, তাহলে দার্শনিক ম'শায় ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করে বলে উঠবেন, "বড় অন্যায় হয়েছে, সমাজ আর টিকবে না, শীগ্‌গির অরাজকতা আরম্ভ হবে। সভ্যতা এবারে লোপ পাবে," ইত্যাদি। কেউ যদি উত্তরে বলে, "কেন, অরাজকতা এলই বা—ক্ষতি কি?" দার্শনিক অমনই উত্তর দেবেন, "তাহলে বর্ব্বরতা ফিরে আসবে"। তার্কিক যদি বলে, "বর্ব্বরতা এলই বা ক্ষতি কি"? দার্শনিক বলবেন, "মানুষের সুখ চলে যাবে, দর্শন বিজ্ঞান লোপ পাবে, আরও নানা রকম অনিষ্ট হবে"। বোঝা গেল দার্শনিক মশায় ঐ জিনিসগুলিকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। তার্কিক কিন্তু অত সহজে হার না মেনে তাঁর কথাতেই উত্তর দেবে, "যে সে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে না। এ সব জিনিস তার নিকট অরুচিকর, এর প্রতিকার কি

কি কর্ব্বেন" ? দার্শনিককে তখন বলতেই হবে, "ও-ব্যাটার মাথার দোষ আছে, ওকে পাগলা গারদে পোরা দরকার, না হলে ও বিষম প্রমাদ ঘটাবে ইত্যাদি"। নীতিটাকে আম কাঁটালের সঙ্গে তুলনা করলে তার ফল এই রকমই হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের শত্রু হওয়া দোষণীয়, তা না হলে শত্রুকে জেলে পুরবার আমাদের কি অধিকার আছে ? দার্শনিক যদি বলেন, "আত্মরক্ষার জন্য আমরা ও-কাজ করতে বাধ্য"। তার্কিক তখনই বলে উঠবে "আত্মরক্ষার প্রয়োজন কি ? আমরা সকলে মরলুমই বা" ? তখন দার্শনিককে বাধ্য হয়ে বলতে হবে "জীবনটা বাঞ্ছনীয়, এটা একটা অমূল্য জিনিস। এ থেকে যা পার আদায় করে নেও"।

(১০)

দর্শন বিজ্ঞানের সব কচকচি ছেড়ে দিলে আমরা দেখতে পাই যে, আসল কথা এই যে ভালমন্দ বিচারের একটা ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে এবং আমরা যেটাকে ভাল মনে করি সেটা হওয়া উচিতও মনে করি। ভাল মন্দের জ্ঞানটাকে আমরা রুচিবিশেষ বলে মনে করি নে। যা পাপ তা যে কেউ করুক আমরা সেটাকে দোষণীয় মনে করি। আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান (Practical Reason) বলে, ভাল কাজ সকলেরই করা উচিত আর মন্দ কাজ থেকে সকলেরই দূরে থাকা উচিত। জ্ঞানী যে-কারণে তাঁর বিচার বুদ্ধিকে মানেন, ঠিক সেই কারণেই তাঁর বিবেক বুদ্ধিকেও মানেন। দুটিই মানুষের ঈশ্বর দত্ত অমূল্য ধন, দুটিই সমান শিরোধার্য্য। অবশ্য কোন্ বিশেষ কাজটি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ

সেই নিয়ে মত ভেদ আছে। কিন্তু কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা এ নিয়ে কি মতভেদ নাই? বৈজ্ঞানিকেরা এক সময় পৃথিবীকে চতুর্ভুজ বলতেন আর এখন বলেন সেটা গোলাকার। কিন্তু এ রূপ বিভিন্নতা ঘটেছে বলেই কি আমরা বলতে পারি যে পৃথিবী গোলও বটে আর চতুর্ভুজও বটে? এখন একজন যদি বলে যে রাম তার মাকে খুন করে মহাপাপ করেছে এবং আর একজন যদি বলে যে, না সে অক্ষয় পূণ্য অর্জ্জন করেছে, তাহলে এই দুইটি মত কখনো সত্য হতে পারে না। এর মধ্যে একটি সত্য আর একটি মিথ্যা। সত্যাসত্য নিয়ে মতভেদ ঘটলেই যেন আমরা বলে উঠিনা যে, সত্যাসত্য বলে কোন জিনিস নাই। সেইরূপ ভাল মন্দের বিষয় মতভেদ ঘটলেও এ কথা যুক্তিযুক্ত নয় যে, ভাল মন্দ বলে কোন জিনিস নেই। এ সব কথা হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে platitude কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের প্রকোপ যখন বড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায় তখন platitude হয় আমাদের প্রধান আশ্রয়স্থল।

(১১)

ভাল মানে, হওয়া উচিত। সভ্যতাকে যে আমরা ভাল বলি তার মানে সেটা হওয়া উচিত। আমাদের প্রথম স্থির করতে হবে যে কি কি জিনিস হওয়া উচিত। তারপর দেখতে হবে যে সে জিনিসগুলি কোন সমাজবিশেষে আছে কি না। যদি থাকে তবে সে সমাজ সভ্য আর যদি না থাকে তাহলে সে সমাজ বর্ব্বর। অবশ্য নিখুঁত সভ্যতা perfect civilization কোথাও পাওয়া যায় না। কখনও আমরা perfect state-এ পৌঁছুব কিনা, সে কথা আমি এখানে আলোচনা

করচি নে। আমি এখানে এই বলতে চাই যে perfection-এর একটা নক্সা পরিস্ফুট ভাবেই হোক আর অপরিস্ফুট ভাবেই হোক, আমাদের মনের মধ্যে অন্তরনিহিত আছে এবং সে নক্সার সঙ্গে যে-সমাজের যত বেশি সৌসাদৃশ্য আছে সেই সমাজ তত বেশি সভ্য।

আমি পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করলেই সভ্যতা লাভ হয় না। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে মনুষ্যত্বের বিকাশ যথোপযুক্তরূপে হয় নি বলেই বেঞ্জামিন কিড আক্ষেপ করে বলেছেন—"Civilization has not yet arrived, for that of the West is as yet scarcely more than glorified savagery." সভ্যতার সম্বন্ধও বাহ্যিক সম্পদের প্রতাপের সঙ্গে নয়, মানসিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে; দাসত্বের সঙ্গে নয়, সাম্যের সঙ্গে; বিজ্ঞানের সঙ্গে নয়, জ্ঞানের সঙ্গে। যেখানে মানুষের মন ফুলের মত ফুটে উঠেছে, যেখানে তার আত্মা পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে উঠে যাচ্চে, যেখানে দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মমতা সমাজকে তাদের সুবর্ণ শৃঙ্খলে ক্রমেই দৃঢ় হতে দৃঢ়তর ভাবে বাঁধছে, সেখানেই প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ হচ্চে। এ সব কথা মামুলি হলেও সত্য।

(১২)

দাসত্ব—সভ্যতার ভিত্তি নয়, ভিত্তি অসভ্যতার। মানুষ আর যে-কোন কাজের জন্য সৃষ্ট হোক, গোলাম হবার জন্য সৃষ্ট হয় নি। সুতরাং যে-সমাজে দাসত্ব আছে, তার সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ আছে। দাসত্বের দ্বারা প্রকৃত সভ্যতা কোনও সমাজে গঠিত হয় নি,

দাসত্ব সত্বেও গঠিত হয়েছে। কলিকাতা, লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় নগরে অসংখ্য বারবনিতার সমাগম দেখতে পাওয়া যায়। এমন বড় সহর নাই যেখানে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তাদের জাল বিছিয়ে না বসে আছে। সমাজের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ চিরন্তন। কিন্তু তাই বলে কি আমরা বলতে পারি যে, উক্ত নগরগুলিতে যা কিছু সভ্যতা দেখতে পাওয়া যায়, তা বেশ্যা-প্রথার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে? ডাক্তার ফারেল দাসত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তাও কতকটা এই শ্রেণীরই যুক্তি।

(১৩)

সভ্যতা সমাজেই সম্ভবপর। সামাজিক-জীবন রক্ষার জন্য যে সব অনুষ্ঠান আবশ্যক সে সবের সংস্থান যে-সমাজে নেই তার সভ্যতাকে lopsided (একরোখা) বলতে হবে। যে সব জিনিসকে সমাজ মূল্যবান মনে করে তাদের রক্ষার ক্ষমতা যদি সমাজের না থাকে, তাহলে আমরা সে সমাজের সভ্যতাকে পূর্ণাবয়ব বলতে পারি নে। এই সমাজিক আত্মরক্ষার জন্য বিজ্ঞান একটি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতির শক্তিসমূহকে আমরা নিজের বশে আনতে পারি এবং তাদের সাহায্যে সমাজের মঙ্গল সাধন এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি। এই হিসেবে প্রকৃতির শক্তিসমুহের উপর আধিপত্য বিস্তার, জাতীয় জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনীয়। আমার মনে হয় এই সামাজিক সত্যটি ডাঃ ফারেলপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাঁরা জীবনের অন্য সব সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে পড়েছেন। জীবনের মঙ্গল দর্শনে তাঁরা এমন মেতে গেছেন যে

এ ছাড়া যে জীবনের আর কিছু আছে, তা তাঁরা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, জীবন কেবল একটা মল্ল-যুদ্ধ নয়, এটা আত্মার একটা অনন্তকালব্যাপী উন্নতির চেষ্টাও বটে। তাঁরা আত্মার এই মর্ম্মান্তিক মন্ত্র ভুলে গেছেন—"আজ বাহায়েম বাহরা দারম, আজ মালায়েক হাম, আজ বাহায়েম বোগজর তা আজ মালায়েক বুগজরি"। অর্থাৎ—আমাদের মধ্যে পশুও আছে আর ফেরিস্তাও (angel) আছে। পশুত্ব ছেড়ে উঠ, তাহলে ফেরিস্তাদেরও ছেড়ে উঠবে।

ওয়াজিদ আলি।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

——:*:——

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

সে যে কত বৎসর আগে, আজ আমার তা মনে নেই, মনে আমি করতেও চাই নে। এক সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে, ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে বনপথে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি হয়। তখন মাঘ মাস, আমি আমাদের দেশের বাড়ীতে ছিলাম। সেদিন ভোরে গাঁয়ের একজন লোক এসে আমায় খবর দিলে, গাঁয়ের সীমানায় আগের রাতে, তার একটা মস্ত মোষ বাঘে মেরে রেখে গিয়েছে। স্থানটি পরীক্ষা করে জানা গেল উভয় পক্ষের যুদ্ধের কোন চিহ্ন নেই। বাঘটি খুব সম্ভবত লুকিয়ে কাছাকাছি প্রতীক্ষা করে ছিল, ঘাড়ে এসে পড়ে বেচারীকে প্রাণে মেরেছে। মহিষ-মাংস অল্পই সে আহার করেছিল এবং পাশের চষা-ক্ষেতে যে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছিল, তাহতে স্পষ্টই জানা গেল—তিনি একটি অসুরবিশেষ। তখন আমার বয়স একেবারেই কাঁচা, তা ছাড়া শীকারীদের উপর, উপরওয়ালাদের কড়া হুকুম যে, আমাকে বাঘ ভালুক শীকারের কোন উৎসাহ না দেয় কিম্বা সাহায্য না করে। সেই জন্যে শীকারীদের সঙ্গে নিয়ে বন পিটিয়ে বাঘটিকে যে ঘেরাও করব, তার কোন আশাই ছিল না। কাছেই একটা গাছে মাচান বাঁধা হল—

আসনটি নিরাপদ হলেও নিঃশব্দ ছিল না, একটু নড়া চড়াতেই ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ করে উঠত। সূর্য্যাস্তের বহুপূর্ব্ব হতেই আমি গিয়ে আসন নিলাম, সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি না ছিলেন শীকারী, না জানতেন তার কায়দা কানুন। অল্প কালের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে স্নাইপ আর হাঁস আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, ক্রমে বন-প্রান্তর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে এল, শুধু রাত্রিচর পাখীর ডাকে মাঝে মাঝে সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্যে ভঙ্গ হচ্ছিল মাত্র। আকাশে প্রায় পূর্ণ-চন্দ্র, রাত্রিখানি যেন মাজা ফটিক। দুটি একটি বেজি টুক্‌টুক্ করে আসতে লাগল, ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে, মৃত মহিষের কাছে অগ্রসর হবার আগে, গলা বাড়িয়ে চারিদিক বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে নিলে, কিন্তু সেখানে অধিকক্ষণ রইল না। এর পরে দু'একটি শিয়াল দেখা দিলে, আর দলের মধ্যে যার ক্ষুধা কিম্বা লোভ একটু বেশি তিনি আহার সুরু করে দিলেন। আমরা উপর হতে ছোট্ট একটি শুক্‌নো ডাল ছুঁড়ে দিতেই, চম্‌কে উঠে দেদৌড়। অনেকক্ষণ ধরে বলবার মত কোন ঘটনাই ঘটল না। রাত ৯টার পর নদীর ধারে কুকুর ডাকতে আরম্ভ করল, ক্রমে বস্তির কুকুরেরাও তার সঙ্গে যোগ দিলে। এ ডাকাডাকিও অল্পক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল, আর কোন নড়াচড়াও কোন দিকে রইল না, কেবল কাছাকাছি একটা শিমুল গাছ হতে কতক-গুলো শকুন থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল, হাত বিশেক তফাতে বাঁ দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি বড় জানোয়ারের নিশ্বাসের গভীর শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। বন্ধু আমার ঘাড়ের উপর হাত রেখে, বাঁয়ে যে দিকে দেখালেন বহু চেষ্টাতেও সে দিকে আমার চোখে কিছু
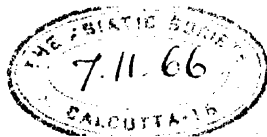
পড়ল না। একটি প্রকাণ্ড বাঘ ঠিক আমাদের মাচানের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল, বন্ধুর ধ্যাননিশ্চল দেহ আর তন্ময় দৃষ্টি হতেই বোঝ গেল তার সমস্ত মন বাঘটি আকর্ষণ করে নিয়েছে। দুএক নিমেষ সময় মাত্র, বাঘটি মাচানের নীচে হতে খোলা জমিতে বেরিয়ে ধীরে ধীরে মৃত মহিষের দিকে অগ্রসর হতে লাগল কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছিল সে এক অনন্ত যুগ।

সে এক চমৎকার দৃশ্য, সে যখন ধীরগম্ভীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল তখন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তার হলদের উপর কালো ডোরা-কাটা শরীর, এমন কি গলার কাছের দাড়ীগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। নিঃশব্দে আমার বন্দুকটি আমি বাড়িয়ে ধরলাম (তখন আমার সেকেলে ধরণের ভারী বন্দুক ছিল), ঘাড়ের কাছটিতে নিশানা করে আওয়াজ করব আর কি, এমন সময় বন্ধু আমার কাপড় ধরে আর একটান দিলেন। সেই লক্ষ্মীছাড়া টানে, আমি তাঁর দিকে ফিরে চাইলাম, প্রবীন ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে, তরুণ শীকারিটিকে 'উপদেশ' দিলেন, "আরে সবুর কর, যখন আহার সুরু করবে তখন মেরো"। হায় হায় আমার অদৃষ্ট! সবুরে মেওয়া ফল্‌লনা! যখন আবার ফিরলাম তখন আমার কামনার ধন অদৃশ্যপ্রায়। প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করে রইলাম, এই বুঝি ফিরবে কিন্তু "সে গেল ধীরে"—নাহি এল ফিরে! না আসবার কারণ হয়ত কিছু ঘটেছিল, মাচানটাতে কোন শব্দ হয়ত বা হয়েছিল, কিম্বা বন্ধুর চুপি চুপি কথা জোরে হয়ে গিয়েছিল (চুপি চুপি কথাও আমার কপালে জোরে হল!) যে অনিশ্চিত কারণই হোক, নিশ্চিত এই যে তাঁর দেখা আর পাওয়া গেল না। "মধুনিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে

যায় বার, সে বাঘ এল না আর যে গেল ফিরে"। এক শিক্ষা আমার হল, সুযোগ ছেড়ে, আরো ভালো সুযোগের জন্য আর কখনো মুহূর্ত্ত-মাত্র অপেক্ষা করা নয়। আমার দুঃখের বাড়া দুঃখ এই যে, যা করতে পারতাম তা করি নি, আর সেই কথা ভুলতেও পারি নি।

এখন আমি তোমাদের আমার প্রথম ব্যাঘ্র লাভের গল্পটি বলব। এ লাভ এক অপূর্ব্ব আনন্দ, সে আনন্দের সহানুভূতি শুধু শুনে হয়না, নিজের অভিজ্ঞতা থাকলে তবে ঠিক বোঝা যায়। এই ব্যাপারের রঙ্গভূমি ছিল মধ্য-প্রদেশে—রেলওয়ে ষ্টেশন হতে বহুদূরে আমাকে যেতে হয়েছিল। কতকটা পথ গাড়িতে, তার পর টাটু ঘোড়ায়, সব শেষ হাতীতে চড়ে গিয়েছিলাম। এই ভাবে একটি সন্ধ্যা আর সারাটি রাত কাটল। পথে কোথাও থামতে না পারায়, এ যাত্রা বড়ই শ্রান্তিজনক হয়েছিল, যে রমনীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, জ্যোৎস্নালোকে সে পথ আরো সুন্দর হয়েছিল। আমার হাতীকে দেখে একটি রাত্রিচর পাখী ডাকতে সুরু করল, তার তীব্রস্বর সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিল, যতক্ষণ আমার হাতী ঘন তরুসমাচ্ছন্ন উপত্যকার গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে না গেল, ততক্ষণ আর সে স্বর থামল না। যখন আমি আমার তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছিলাম—তখন পূর্ব্বের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি আর বিলম্ব না করে, শ্রান্ত শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল বলতে পারি নে কিন্তু মনে হল যেন, আমি যাঁর অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম, তিনি আমায় বড় বেশি শীগ্‌গির এসে জাগিয়ে দিলেন। শীকারীরা শুভ-সংবাদ নিয়ে এসেছে, যদি বাঘটিকে হস্তগত করতে চাই, তাহলে অবিলম্বে যাত্রা করা

আবশ্যক। বেলা দশটার সময় আবার আমরা গো-যানে যাত্রা করলাম—চৈত্র মাসের রৌদ্র মাথার উপর করে, পাহাড় পর্ব্বত ভেঙে, নদী নালা পার হয়ে, অগ্রসর হতে লাগলাম। শ্রান্ত বলদগুলি বদল করতে যে টুকু থামা আবশ্যক, তার বেশি আর কোথাও বিশ্রাম করা হয় না। শ্রান্তিকর দীর্ঘতম দিনেরও শেষ হয়, রাতটি ভালই কেটেছিল। আমাদের সঙ্গে প্রায়, ১০।১২টি বলদ ছিল, তার অধিকাংশই জরাজীর্ণ, বাঘকে লোভ দেখিয়ে আনবার উদ্দেশে এগুলিকে আনা হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশের হিন্দুর মত, মারহাট্টারা বাঘের উদর পূরণের জন্যে গরু বেঁধে দিতে আপত্তি করে না। সে যাই হোক এ গড্ডলিকা প্রবাহ অগ্রসর হয়েই চলল, আবার যখন কোন পাথরের উপর উঠে কিম্বা গর্ত্তের মধ্যে নেমে, আবার উঠে চললে তখন আমাদের এম্‌নি ঝাঁকানি আর ধাক্কা খাওয়ালে যে, তার স্মৃতিচিহ্ন বহুকাল যাবৎ আমাদের বুকের পাঁজরে দেহের হাড়েহাড়ে সজাগ রয়ে ছিল। রাত তুই প্রহরে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, জেগে দেখি গাড়ী নালায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আর আমি খদে গড়িয়ে চলেছি!

গাড়ীর বলদগুলো প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড় দিয়েছিল, কারণ গাড়ীর পিছনে যে সব বুড়ো বলদ বাঁধা ছিল, তারি একটার উপরে বাঘ এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল—অনেকক্ষণ হতেই খুব সম্ভবত এ পিছু নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। জেগে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, যমপুরীর রৌরব তার কাছে কোথায় লাগে! চীৎকার, বিলাপ, ক্রন্দন, হায় হায়, আক্রোশ, আক্ষেপ, এবং কপালে করাঘাত। আমার নাক দিয়ে কিঞ্চিৎ রক্তপাত ছাড়া আর বড় বেশি কিছু ক্ষতি

হয় নি। আবার সকলের যাত্রা করবার মত সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসতে কিছুক্ষণ সময় গেল, সূর্য্যোদয়ের অল্প পরেই আমরা তাঁবুতে পৌঁছিলাম। পথে আর কোন বাধা বিঘ্ন হয় নি। কিছুক্ষণ পরেই সুসংবাদ কর্ণ-গোচর হল,—"গারা হোগিয়া"—অর্থাৎ বাঘে শীকার ঘায়েল করে গিয়েছে, আমাদের তাঁবু হতে বেশি দূরে নয়—কাছেই। প্রাতরাশের পূর্ব্বে কিম্বা পরে, মৃগয়াযাত্রা হবে সেই বিষয়ে তর্ক উঠল। মীমাংসা হল যে, পূর্ব্বে যাত্রাই সমীচীন। মহারাষ্ট্রীয় খাদ্য সম্বন্ধে যাঁদের রসনার অশিক্ষিত পটুত্ব নেই—তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও"।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল, আমরা মৃগয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। বন্দুকধারী শীকারী সবেমাত্র দুজন, আমি আর আমার বন্ধু। এছাড়া বন্ধুর অনুচরবর্গ, নানা যুগের নানা আকারের বন্দুক ঘাড়ে করে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকজন গাছে উঠে বসেছিল—বাঘ যদি পালাবার চেষ্টা করে তাহলে যে কোন উপায়ে তাকে পথে আনাই তাদের কাজ। এগিয়ে যে, জায়গাটি বেছে নিয়েছিলাম, তার একটু বিশেষত্ব ছিল। সেখানে দাঁড়িয়েই চারিদিকে দৃষ্টি চলে। মাচানে উঠব না স্থির করেই, এই স্থান আমি মনোনীত করে ছিলাম। আমার গায়ের কাছে, উত্তর দক্ষিণে, গুল্ম-সমাচ্ছন্ন তৃণ-বিরল সঙ্কীর্ণ পথ। শীকার যেদিক হতে আসবে, সেদিকে ১০০ হাত পর্য্যন্ত আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। যদি বাঘটি আমার দিকে আসত, তাহলে সেই পথে যে ঘন সবুজ চারা গাছের সারি ছিল, সেখানে গা ঢাকা দিয়ে সহজেই আসতে পারত। অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারীদের সোরগোল বেশ

শোনা গেল। একটা দাঁড়কাক, পাশের একটা পলাশ গাছের উপর উড়ে এসে জুড়ে বসে, মুখ ফিরিয়ে গাছের নীচে কি দেখে কে জানে, কেবলি গাল পাড়তে লাগল। দেখতে পেলাম, একটা গাছের পাশ-হতে নুয়ে-পড়া ডালের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে নিঃশব্দে একটি বাঘ আসছে। তখনও সে অনেক দূরে, দেখে বুঝলাম বাঘ নয় বাঘিনী, ঘাড় নীচু করে এগিয়ে আসছিল বলে সহজেই আমি তার ঘাড় লক্ষ্য করে আওয়াজ করলাম। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে মাতালের মত টলতে টলতে চলতে লাগল। আমি দুটো গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়ে আবার আমার দোনলা বন্দুকের বাঁ নলের গুলিটা ছুড়লাম। যত দূর সম্ভব সে সবুজ গাছের সারির ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে এসেছিল, আমার বাঁয়ে পৌছবামাত্র আমি গুলি করি। আবার সে পড়ে গেল, আর একবার উঠবার চেষ্টা করে পারল না। তখন মাটীতে শুয়ে পড়ে গর্জ্জাতে লাগলে। আমি গাছের আড়ালে চুপি চুপি যতখানি পর্য্যন্ত এগোন নিরাপদ মনে হল, ততখানি পর্য্যন্ত গিয়ে, দুটো ডালের ফাঁক দিয়ে শেষ সংঘাতিক গুলিটি মারলাম। সামান্য কি এক আওয়াজে সে আমার উপস্থিতি জানতে পেরে, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত করে, আবার হুঙ্কার দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু শরীরে আর শক্তি ছিল না বলে পারলে না, পরমুহূর্ত্তেই আমি তাকে আত্মবশে আনলাম। সেই বিজয়-গৌরবে আমার সর্ব্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হয়েছিল, আজও তার প্রভাব অন্তর্হিত হয় নি। যখনি সেদিনের কথা মনে করি, আমার শরীর-মনে সেই তীব্র আনন্দ তেমনি করে আবার জেগে ওঠে।

একটা কথা বলে আজকার চিঠি শেষ করব। আমি যে স্থানটি মনোনীত করে, বাঘের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম, সেই পথে আসা ছাড়া তার আর অন্য উপায় ছিল না—কেন না "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যান,

বাঘের কথা আমার এখনও শেষ হয় নি, আর যতদিনে জরা-গ্রস্ত হয়ে, অকর্ম্মণ্য হয়ে না পড়ি, ততদিনে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজের অবসরে সেই সব শীকারের ব্যাপার আমি মনের মধ্যে, আবার অভিনয় করবার সুযোগ পাই, আর তখনি তোমাদের জন্যে সেগুলি লিখে সঞ্চিত করে রাখি। যাই হোক দেখি, এসব পুরানো কথা, তোমাদের কাছে কখনই পুরানো হয় না। আমি তোমাদের কাছে শীকার-সামন্ত সমীর খাঁর কথা বলেছি। এক সময় পুলিশ পাহারাওয়ালার কাজ তাকে করতে হত। সৌভাগ্যবশত, একদিন সে একজন মস্ত কর্ম্মচারীর সুনজরে পড়ে যায়—তিনি তাকে একখানি ছোট খাট জায়গীর দান করেন। এই সংস্থান হবার 'পর সে শীকার ব্যবসায়ে তার শরীর-মনের সব অধ্যবসায় নিয়োগ করে'

ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক করে তুলে ছিল। তার মত আর কাউকে অমন ব্যাঘ্র মহিষের খবর আনতে ও তাদের খুঁজে বার করতে দেখি নি। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯০২ সালে, তখন সে দাঁত-পড়া বুড়ো, তবে শরীরে তখনও শক্তি ছিল, এতখানি বয়সেও শীকারের আগ্রহ তার যায় নি, রাত ৪টের সময় প্রতিদিন সে আমার তাঁবুতে আসত, দুয়ারে দাঁড়িয়ে একটুখানি আস্তে কাশলেই আমার সজাগ ঘুম ভেঙ্গে যেত। তারপর আমি, সমীর আর সমীরের চিরসঙ্গী একজন গোঁড়, এই তিন জনে বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে পড়তাম। বনের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাঘ ভুলিয়ে আনবার জন্যে যে সব গরু বেঁধে রাখা হত, রাতের মধ্যে তাদের কার কি অবস্থা হল তাই আবিষ্কার করাই এ যাত্রার উদ্দেশ্য। রাত আর দিনের এই সন্ধিক্ষণেই বাঘ ভালুক সম্বর প্রভৃতি জন্তু রাত্রি ভ্রমণ শেষ করে' আপন আপন গুহা গহ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করে। সমীর খাঁর মত চতুর পথ প্রদর্শক সঙ্গে না থাকলে, একেবারে তাদের মুখে গিয়ে পড়া, কিছুই বিচিত্র নয়।

ঘাসবনে হরিণের স্বচ্ছন্দ পদধ্বনি, ভালুকের ধীর মন্থর পদক্ষেপের প্রভেদ অনায়াসেই বোঝা যায়, আর বাঘের পদশব্দের সঙ্গে এদের ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই! এক বিড়াল ছাড়া আর কোন জন্তু বাঘের মত অমন মৃদু ধীর নিঃশব্দ পা ফেলে আসতেই পারে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন ক্রমেই পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছিলাম, সমীর খাঁ তখন চুপি চুপি দুএকটি কথা কিম্বা সঙ্কেতে আমায় সতর্ক করে দিচ্ছিল। কিন্তু যখন বন-রাজ্যের সামান্য প্রজা, যথা মার্জ্জার, জম্বুক, সে পথে দেখা দিচ্ছিল তখন আর সমীর

খাঁ কিছুমাত্র সম্ভ্রম দেখায় নি, আর তাদের সম্বন্ধে এমন সব ভাষা প্রয়োগ করছিল যা তোমাদের না শোনাই ভাল। যে পথে বাঘ ভালুক সচরাচর আসা যাওয়া করে, সে পথ এড়িয়ে, বেশি দূর নিরাপদ স্থান হতেই, আমাদের বাঁধা গরুগুলির সন্ধান নিয়েছিলাম। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে অনেক সময়ই কিছু দেখা যেত না, বিশেষ যখন গরুগুলি শুয়ে থাকত কিম্বা যদি বাঘ তাদের মেরে ফেলে রেখে যেত। বিশেষ কাছে যাবার আগে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল হতে, গাছের ডালে চড়ে লুকিয়ে বসে, কিম্বা কোন প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে, পাখী কিম্বা জন্তু কোথায় কে কি শব্দ করছে, তাও ভাল করে লক্ষ্য করে, তবে কাছে এগোন হত। আগের দিন কতকগুলি স্ত্রীলোক জঙ্গলে মহুয়া কুড়োতে এসে, পাহাড়ে নদীর ধারে একটি বাঘ দেখতে পেয়ে, তাঁবুতে আমাদের কাছে এসে খবর দিয়ে গিয়ে ছিল। তখন বেলা পড়ে এসেছে, চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি আমরা বনের চারিদিকে ব্যাঘ্ররাজের নজর স্বরূপে গুটিকত গরু বেঁধে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটি যে তিনি গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণও অবিলম্বে পাওয়া গেল। পাশেই একটি নালা ছিল, আর সেখানে নামবার পথটি একেবারে খাড়া। কিন্তু এ অসুবিধা এড়াবার জন্যে গরুটিকে টেনে সে নালার কতক দূর নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নালার ধারে ধারে নেমে গিয়ে বাঘটিকে তখনই শীকার করে ফেলবার পরামর্শ সমীর খাঁ আমায় দিয়েছিল, আমারো যে সে প্রলোভন হয় নি তা বলতে পারি নে, তবে সেটা আমি সম্বরণ করেছিলাম। আমি যাঁর অতিথি, তাঁর অজানিতে এ কাজ করা ঠিক হত না। নালার ধারে ধারে লুকিয়ে বসবার মত,

গুটিকত জায়গা ছিল, কোন কোন শীকারী তখনি সেই সেই খানে উঁকি দিয়ে বাঘ কোথায় আছে তার সন্ধান নিতে চেয়েছিল কিন্তু দরকার হল না। পাশেই গজ পঞ্চাশ' দূরে, মহুয়া গাছে বসে একটা ময়ূর সে সংবাদ আমাদের জানিয়ে দিলে—পতিব্রতা ময়ূরীরাও চারি-দিক হতে তার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল 'ঠিক্ ঠিক্'। আমরা আর কিছু গোলযোগ না করে, মহানন্দে বাঘের শুভাগমনের সংবাদ নিয়ে তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথম বারে বাঘ আমাদের ফাঁদে পড়ে নি, পাহারাওয়ালাদের মাঝ দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে পালিয়ে ছিল। হঠাৎ চারিদিকে তাদের আনাগোণার শব্দ যে কেন থেমে গেল, আমরা সে কথা বুঝতে পারি নি, সমীর খাঁ ফিরে এসে তাড়া-তাড়ি আমাদের ঠাঁই বদল করিয়ে দিলে। কাছেই জঙ্গলের ঘাস পোড়ান ছাই-এর উপর বাঘের পায়ের দাগ দেখা গিয়েছিল। আমাকে নালার ওপারে গাছের নীচে জায়গা দিলে। বাঘ যে-পথে আসবে সে-পথের ঘাস উঁচুতে ছিল প্রায় তিন ফুট,—একটি গলিপথ নালার ধার পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ প্রায় বিশ হাত সোজা নালার মধ্যে নেমে তার পাশের পাহাড় মুখো উঠে গিয়েছিল। আমাদের শীকার-কর্ত্তা মাচানের উপর আসন করেছিলেন, তাঁর আপনার শীকারীর মতে সেইটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থান। এই শীকারিটিকে দেখলে, নিতান্ত হতচ্ছাড়া বদমায়েস ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু সমীর খাঁ শীকারতত্ত্ব জানত ভাল। এবারে বাঘটিকে নিঃশব্দে ঘেরাও করা হবে তারি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, দামামা কাড়া বাজবে না, শীকারীরা চুপচাপ আসবে, কেবল 'এগিয়ে আসছে' এই খবরটা জানাবার জন্যে মাঝে মাঝে শুধু গাছ কিম্বা পাথরের গায়ে কুড়লের

ঘা দেবে। আমি আমার দু'জন শীকারীর সঙ্গে আগে হতে ঠিক করে ছিলাম, তারা গাছ হতে ইসারা করে বাঘের গতিবিধি আমায় জানাবে। একজন শীকারী পাগড়ী নাড়াল দেখে বুঝতে পারলাম, বাঘ সোজা আমার দিকেই আসছে। দুএক মুহূর্ত্ত পরে প্রকাণ্ড জন্তুটিকে ঘাসের মধ্যে দিয়ে গজ সত্তর দূরে আমার দিকে আসতে দেখতে পেলাম। ঘাসের সেই সামান্য আড়ালের সমান হয়েই সে পিঠ নীচু করে এগিয়ে আসছিল। সমুখে পিছনে পাশে ১৫ গজ পরিমাণ জমিতে ঘাস দুলে দুলে, নদীতে নৌকা চলে যাবার পর, ঢেউ-খেলান যেমন একটি পথের চিহ্ন পড়ে, ঠিক তেম্নি দেখাতে লাগল। মাথা নীচু করে আসছিল তাই মাথার আড়ালে বুক ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মাথায় গুলি মারবার পক্ষপাতী আমি নই। বাঘের মস্তিষ্কাংশ থাকে মাথার পিছন দিকে, তাই গুলি অনেক সময় তত দূর অবধি, সহজে পোঁছয় না। ক্রমেই এগিয়ে আসছে, ত্রিশ হতে কুড়ি, কুড়ি হতে দশ গজ' কাছে এল, তবুও যে ভাবে আসছিল তার কোন বদল হল না। আমরা দু'জনেই শীকার এবং শীকারী সমান উঁচুতে ছিলাম, মাঝের ব্যবধান শুধু সেই সঙ্কীর্ণ নালা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঘাসের মধ্য হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে নালায় নামতে আরম্ভ না করলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আমার নিঃশ্বাস আর গুলি দু ই রোধ করে রেখেছিলাম। তার স্কন্ধ আর মস্তকের সন্ধি স্থলে একটি গুলি খেয়ে সে চমকে লাফিয়ে উঠে নালার মধ্যে পড়ে গেল। কুকুর যেমন পিছনের পায়ে ভর করে, সমুখের পা বিছিয়ে, তারি উপর মুখ রেখে বসে, সেও ঠিক তেম্নি ভাবে পড়ে মাথাটা একবার এদিক, একবার ওদিক নাড়াচ্ছিল, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাত-গ্রস্থ রোগীর মত একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। ঘাড়ের পিছনে আর

এক গুলি খাবার পর মাথা নাড়াও বন্ধ' হয়ে গেল, মনে হল সম্মুখের ডানদিকের থাবার উপর মাথা রেখে সে অঘোরে ঘুমচ্ছে। গৃহস্বামীর শীকারী, তার প্রভু বাঘ পেলেন না দেখে ভারী চটে গেল। সে আর সমীর খাঁ পরস্পরের প্রতি নানা রূপ সাধুভাষা প্রয়োগ করতে লাগল, এর মধ্যে তার মনিব আবার একটা অবিবেচনার কথা বলে ফেলাতে ব্যাপারটা ক্রমে গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। রাজার শীকারী বিদ্রূপ করে বললে, সমীর খাঁ আমায় সব চেয়ে ভাল জায়গাটি দিয়েছিল। সমীর তাকে বললে, "তুই একটা কুলি, তা না হলে বুঝতে পারতিস যে, বাঘকে বলদের মত ল্যাজে মোড়া দিয়ে চালান যায় না"। পরের দিন সমীর খাঁ তাদের উপর শোধ তুললে, আমার কপালে আর একটি বাঘ জুটে গেল। যে নালাতে আগের দিন বাঘটি তার শীকার-করা গরু টেনে নিয়ে গিয়ে ছিল, ঠিক তারি পাশাপাশি সোজা লাইনে নদীর একটি শুক্‌না খাল ছিল, সেই পথ ছাড়া বাঘের আর অন্য রাস্তা ছিল না। আগের দিন আমার অদৃষ্টে ব্যাঘ্র জুটেছিল বলে রাজা এসে নালার মুখে, যে দিক ছাড়া বাঘের আসবার ভিন্ন পথ ছিল না, সেই স্থানটি আগেভাগে দখল করে বস্‌লেন, এতে অন্যায় কিছু ছিল না, ঠিকই করে ছিলেন, তবে করবার ধরণটি ভদ্রোচিত হয় নি। তাঁর এই বে-শীকারী ব্যবহার সমীর খাঁর আদপেই পছন্দ হয় নি। যদিও বাক্যে বা ইঙ্গিতে, তখন কিম্বা পরে, সে তার মনোভাবের কোন আভাস কখনো দেয় নি। একটা জায়গায় সেই নালা হতে আর একটি নালা বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্কীর্ণ পথ সমীর খাঁর শ্যানদৃষ্টি এড়াতে পারে নি। ঠিক সেই খানটিতে সে একজন শীকারীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছিল, এই ব্যক্তি বাঘের পথরোধ করে, তাড়া দিয়ে তাকে

আমার দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, এই ছিল তার মতলব, ঘাসের মধ্য দিয়ে ব্যাঘ্রটী অগ্রসর হচ্ছিল, তার ব্যুঢ়োরস্ক ঘাসের জঙ্গল ছাড়িয়ে ঘাসের উপরে উঠেছিল। খোলা মাঠের সীমানায় এসে একবার সে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ঠিক আমার সম্মুখটিতে, পিছনে তার বনভূমির বিচিত্র শ্যাম যবনিকা, চিত্রপটে আঁকা, মুর্ত্তিমান মহিমার মত সে ছবি গম্ভীর ও সুন্দর। মুহূর্ত্ত কাল এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্চল নিবিষ্ট, মনে হ'ল যেন অনাবৃত প্রান্তরে পদার্পণ করবার আগে, শব্দ অনুসরণ করে আপন গন্তব্য পথ .স্থির করে নিচ্ছে। তার বিস্তৃত শুভ্র কবাট বক্ষ, আমার সম্মুখেই প্রসারিত, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বন্দুকের আওয়াজ হ'বামাত্র সে হাঁটু গেড়ে পড়ে গিয়ে, পরের মুহূর্ত্তেই আবার পিছনের পায়ে ভর করে দাঁড়াল, সম্মুখের পা দিয়ে আঁচড়ে যেন আকাশ চিরে ফেলবে! রাগে অধীর হয়ে আপন বুকে কামড় দিতে লাগ্‌ল, এইবার তাকে আগের চেয়ে আরো ভয়ানক অধিকতর বিস্ময়জনক মনে হয়েছিল। ডাইনে আর বাঁয়ে অনবরত স্নাইপ মারতে হলে যত শীগ্‌গির গুলি চালাতে হয়, ততটুকু সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় গুলি খেয়ে সে মৃত্যুশয্যায় ধরাশায়ী হ'ল। সন্ধ্যার সময় আমি যখন তাঁবুর বাহিরে বসে ছিলাম সমীর খাঁ

"Whispered there in the cool night air
What he dared not day by day light."

কথাটি হচ্ছে—ভারি কৌশলে বাঘ আমার পথে এসেছিল, রাজার শীকারীকে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারতে গালে চড়" শেখাবার জন্য সে এ কাজ করে ছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯

হাওদা–শীকার।

"হাতীপর হাওদা"—আবার তার উপর নিজে রাজার মত বসে শীকার করতে খুব আরাম। হিমালয়ের তরাই, আসাম আর শ্রীহট্টের জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, সাম্বর, হরিণ প্রভৃতি বড় বড় শীকার, এমন কি তিতির প্রভৃতি ছোট শীকার করবারও এই একমাত্র উপায়। এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল যেন লম্বা ঘাস আর শরের গভীর সমুদ্র; এ ঘাস এতই লম্বা যে মাঝে মাঝে হাওদা ছাড়িয়ে ওঠে, আর এম্নি ঘন যে, সম্মুখে যে সব প্রকাণ্ড হাতি, শীকার সন্ধানে আরোহীকে নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের একেবারে চোখের আড়াল করে ফেলে। প্রতি পদেই গতিরোধ হয়, আর হাতীর পায়ের চাপে যে সব ঘাস ভেঙে পড়ে, সে এম্নি মজবুত যে ভাঙবার আওয়াজটা পিস্তলের শব্দের মত শোনায়। এই উপায়ে প্রথম যেদিন আমি শীকার সন্ধানে গিয়ে ছিলাম, সে কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে—এ যেন বিচালীর গাদায়—হারাণ সূচ খুঁজতে যাওয়া, তবে মস্ত এই প্রভেদ যে একে যে খুঁজতে যায়, তার নিরাশ হতে হয় না—যার আশায় "ঢুঁড়ত ফিরি" তাকে ঠিক পাওয়া যায়। চলন্ত হাতির উপর দোল খেতে খেতে তাক্ ঠিক্ রাখা অভ্যাস হতে একটু সময় লাগে, আর তা ছাড়া ঢেউ এর মত দোলায়মান ঘন ঘাসের মধ্যে কোন জানোয়ার চলে বেড়াচ্ছে, সে কথা ভাল করে বুঝতেও বিশেষ অভ্যাস আবশ্যক। হাওদা-শীকার ব্যয় সাধ্য—খুব কম লোকেরি এ রকম হাতি রাখবার সামর্থ্য হয়—আর যে দু চার জন রাখেন তাঁরাও এ সব হাতীকে

রীতিমত শিক্ষা দেবার কষ্ট স্বীকার করেন না, এ ব্যাপারে গুটিকত রীতিমত শিক্ষিত হাতি নিতান্তই দরকার, আর এ রকম একটি হাতি পাওয়া সহজ নয়, যদি পাওয়াই যায় তাহলে তার দাম দিতে যে সোনার খনি উজাড় করে ফেলতে হয়, তাই বা ক'জনে পারে? হাওদা শীকারে কৃতকার্য্য হতে হলে, এই রকম হাতি অন্তত ২৪, ২৫টি নইলে চলে না—কাজেই বুঝেছ, আলাদিনের অপূর্ব্ব প্রদীপ যার নাই, তার ভাগ্যে এ শীকার ঘটা দুঃসাধ্য।

এক সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্য আর প্রদেশের চেয়ে শীকার ব্যাপারে বেশি উন্নতি করেছিল। দেশের জমিদারদের মধ্যে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শীকার তাঁরা গৌরবের কথা মনে করতেন, আর এই সূত্রে পরস্পরে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এখন আর সেদিন নেই বল্লেই হয়। বর্ত্তমান জমিদারবর্গ অনেকেই পাশ্চাত্য আহার বিহারে, বিলাস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছেন। কলপ-দেওয়া কড়া কামিজ 'কলার' ধারণ, তাঁরা মুনি ঋষির কৃচ্ছ্র সাধনের মতই অপরিহার্য্য মনে করেন। ব্যামিশ্র নিষিদ্ধ আহার্য্য, সনাতন স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অপেক্ষা লোভনীয় হয়ে পড়েছে। যে সকল উগ্র পানীয়, এক সময়ে কেবল মাত্র ঔষধার্থে ব্যবহার করবার বিধি ছিল, এখন সে সকল সেবন তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মধ্যে করে নিয়েছেন, আর তার অপরিমিত ব্যবহারই পৌরুষ বলে জ্ঞান করেন। নিঃশব্দসঞ্চার মখমল মোড়া হাওয়া-গাড়ী ব্যতীত চলা-ফেরা করতে তাদের মন ওঠে না। এই গুলি হচ্ছে আধুনিক জমিদারবর্গের আধ্যাত্মিক পরিমাপ—দৈহিক মাপটি তাদের ইংরাজ দর্জ্জির কাছে পাওয়া সহজ। এঁদের তরঙ্গায়িত বরবপু গুলি কোট প্যাণ্টে সাম্য করে রাখা

তাদেরই কর্ত্তব্য। কোথায় কখন কি ভাবে এ সৌন্দর্য্য ফেটে পড়বে, তার জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। একবার, দরবারে একজন রাজকীয় কর্ম্মচারী কোনো জমিদার রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"রাজা একটি সিগারেট খাবে কি"? আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত এই হঠাৎ-নবাবটি বলে উঠলেন,—"আমি শুধু হাভানা ব্যবহার করে থাকি—(হাভানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা দামী চুরুট)। আজ কালকার দিনে ম্যানিলা (Manilla) আর মিউরিয়ার (Muria) প্রভেদ বুঝতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার ও শালীনতার বিশিষ্ট পরিচয়; বিবিধ মদ্যের জাতি, গোত্র, গাঁই কুলজি, জ্ঞান যদি থাকে, তাহলে সেত ইংরাজী কিম্বা সংস্কৃত সাহিত্যের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক অধিক গৌরবের পরিচয়। বাক্যালাপ অধিকাংশ সময়ই অতি অকথ্য বিষয় সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। যদিও এঁরা ছুরি কাঁটায় খাবার কায়দাটা খুব ভালই শিখে নিয়েছেন, তবু পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ প্রভাবের বাহিরে পড়ে থাকায় তার শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ সর্ব্বদা কেবল মাত্র বাহ্যাড়ম্বর ও অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে এঁরা দিন দিন অকর্ম্মণ্য ও হীন-চরিত্র হয়ে পড়েছেন। মাঝ হতে রাজ-সুলভ মৃগয়া ব্যবসায়ের সমাদর চলে যাচ্ছে।

হাওদার উপর কোন কোন শীকারীর অভ্যাস আছে, অনেকগুলি করে গুলি-ভরা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যান, তাতে নানান দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। আমার মনে আছে যে, একজন অল্পবয়স্ক জমিদার এই অভ্যাস-বশত মারা যান। হাতি যখন উপরের দিকে উঠছিল, বন্দুক গড়িয়ে পড়ে আওয়াজ হয়ে যায়, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভ্যাস করলে

একটি বন্দুক রেখে আর একটি তুলে নিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তাতেই অনায়াসে সেটিতে গুলি ভরে নিতে পারা যায়। আর যে বন্দুকটি সর্ব্বদা ব্যবহার করে করে একেবারে আপনার হয়ে গিয়েছে, তার কাছে যেমন কাজ পাওয়া যায়, নতুন অজানা বন্দুকের কাছ থেকে তা হ'বার যো নেই। আর একটি কাজ কখনো করো না; সম্মুখে ঘাস শুধু নড়ে উঠেছে বলে, জন্তুটিকে যতক্ষণ না স্বচক্ষে দেখতে পাও, ততক্ষণ বন্দুক ছুঁড়ো না। হাওদা শীকারের লাইন বাঁধবার দুটি নিয়ম আছে—তার মধ্যে একটা হচ্ছে সূর্ত্তি খেলে, যার যেমন নাম উঠবে, সেই ভাবে সাজান, কিম্বা শীকারের দলপতি আর সকলে যাঁর নিমন্ত্রিত অতিথি, তিনি যে ভাবে দল ভাগ করে দেবেন, সেই মত সাজান। এই সারি-বাঁধাটা ধমুকের আকারে করা ভাল। পাশের জায়গা হচ্ছে শীকারের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধা-জনক। পতাকার সঙ্কেতে, এগোতে, পিছতে, সারিটা প্রশস্ত কিম্বা সঙ্কীর্ণ করে নিতে হয়। দুএক জন শীকারীকে সম্মুখে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে শীকার জড় করিয়ে নিলে বেশি সুবিধা হবে। কোথায় কি ভাবে এ সব হাতি সারি বেঁধে দাঁড়াবে, সে বিষয় স্থির করতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। তার পরে বাঘ এসে পাশ কাটিয়ে না পালিয়ে যায়, কিম্বা এই সব হাতির উপর এসে না পড়ে সে সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্যে সাহস এবং চাতুরী দু-ই কাজে লাগান দরকার। অনেক সময় এমনও হয় যে, বাঘ গুঁড়ি মেরে বসে থাকার দরুণ অন্তত সেই সময়ের জন্য চোখে পড়ে না। সব সময়েই যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য উদ্ধার হয় তা নয়, কেন না বাঘ যেম্নি এই হাওদাধারী হাতিটিকে দেখে, আর অম্নি চার পা তুলে লাফিয়ে ছুটে আসে।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাঘ যখন আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে আসে, সে বড় চমৎকার দৃশ্য, দেবতারা দেখলেও খুসি হয়ে যান। এস্থলে শুধু হাতিটি নির্ব্বিকার হলে চলে না—শীকারীর গুলিটিও অবিকল সোজা চলা চাই, তবেই বিপদ এড়ান যায়। গুলি না ছাড়লে ত শীকার মরে না, আর সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা করা চলে না, গুলি ছুঁড়তেই হয়, তা তোমার লক্ষ্য যেমনই হোকনা কেন, গুলি ফস্‌কে গেলেও এ সময় কাজ হয়। কেননা শব্দ শুনে অনেক সময় বাঘ পালিয়ে যায়, কারো ক্ষতি করবার সুবিধা পায় না।

এ সব জায়গায় বাঘ কোথায় খুন খারাবী করেছে এ সংবাদ না পাওয়া গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলেও এই ঘন ঘাস জঙ্গলে, সে খবর জানতে দুএকদিন চলে যায়। যখন দেখা যায় মস্ত মস্ত শকুন, চক্র করে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, অথচ ঘাসের মধ্যে নামছে না, কিম্বা ভয়ে নেমে লাফিয়ে পালাচ্ছে না, তখনি বোঝা যায় খুনী ব্যাঘ্রটি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা নিয়েছে। এই দস্যুটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে গরু ভেড়া বেঁধে দিলে অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধন হতে দেখেছি—এই উপায়ে একবার চমৎকার একটি বাঘিনীকে হস্তগত করা গিয়েছিল।

এই হাওদা শীকারের প্রধান বিপদ জলাভূমিতে গিয়ে পড়া, হাতির মত সাহসী জন্তুও কাদায় পা বসে যাচ্ছে দেখলে, ভয়ে কাণ্ড-জ্ঞান রহিত হয়ে যায়। একটা দৃশ্য ঠিক যেন কালকের ঘটনার মত আমার স্পষ্ট মনে আছে। হাতির সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি হবে, তখন গারো পাহাড়ের চোরাবালির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে

লাগল, আমরা বন্য মহিষ আর জলাভূমির হরিণ-শীকারে বেরিয়ে ছিলাম, পথটা মাহুতদের পরিচিত। সেটা ভূমিকম্পের পরের বৎসর, খুব সম্ভবত পাহাড়ের উপরকার আলগা মাটি, বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে এসে পড়েছিল। যে জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা সযত্ন রক্ষিত শাদ্বলের মত মনে হয়েছিল, সেটি কয়েক হাত গভীর চোরবালি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা তখনি শরবনে ঢাকা একটা জলাভূমি হতে সবে মাত্র বেরিয়ে এই সঙ্কট স্থানে এসে পড়লাম—অনতি দূরে হাতচল্লিশ তফাতে শুক্‌নো ডাঙা ছিল। প্রত্যেকটি হাতি প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্রসর হতে লাগল—সবাই ভয়ে ডরে চীৎকার করতে করতে চলেছিল, যাদের পিঠে হাওদা ছিল সবচেয়ে দুরবস্থা হয়েছিল তাদেরি। এই দলের মধ্যে শ্রীহট্ট অরণ্যবাসিনী একটি হস্তিনী সব প্রথমে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছলে। এই বুদ্ধিমতী, বড় বড় ঘাসের বোঝা শুঁড়ের উপর নিয়ে পায়ের তলায় বিছিয়ে, পা, রাখবার ঠাঁই করে নিতে লাগল। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে উত্তীর্ণ হল, কিন্তু এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে তাদের এতই কষ্ট আর পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে, তার পর দুদিন আর তাদের চলৎশক্তি ছিল না। একটা খাল পার হতে গিয়ে রাজা—একটি হাতি হারালেন। সে পার-ঘাটার একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করেছিল, বৃথায়; আস্তে আস্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাহুত শুধু প্রাণ হাতে করে, সাঁতার দিয়ে অপর পারে গিয়ে উঠল।

শীকার করতে গিয়ে প্রত্যেক শীকারীর প্রধান কর্ত্তব্য একে অপরকে প্রীতমনে সাহায্য করা। যদিই বা শীকার নিয়ে দুর্ভাগ্য-বশত, কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহলে শীকার-কর্ত্তা

এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন, সেইটিই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের ন্যায্য দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল, তবু কলহ করে মৃগয়া-শিবিরের শান্তি ও সন্তোষ হানি করা কখনো উচিত নয়। একটুকুও মন ভারী না করে নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটি গ্রহণ করো। আর মনে করো সেইটিই তোমার পক্ষে সব চেয়ে বেশি সুবিধাজনক। স্বার্থপর অসন্তুষ্ট-চিত্ত লোকেরি "পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে"। নির্ব্বোধ কিম্বা মন্দমতির প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন না। গেল বৎসর আমারি চাক্ষুষ এই রকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। খবর এল একটি প্রকাণ্ড বাঘ, বাথানের সবচেয়ে ভাল গরুটিকে মেরেছে, তার পর সেটিকে টেনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছে, হেঁটে নদী পার হয়ে শীকার শুদ্ধ এক শিমুল তলায় উঠেছে। আমরা সেদিন একটি আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আগের দিন আমাদের শীকার কর্ত্তা সেটিকে গুলি করেছিলেন—মারা পড়ে নি। সেই জন্যে সেদিন আমরা নতুন আগন্তুকেব খোঁজে আর গেলাম না, যদিও সহজেই এ কাজটি সেই দিনই উদ্ধার হতে পারত। আমাদের শাকার-কর্ত্তা কিন্তু মৃগয়া-ব্যবসায়ীর সহজ সংস্কার বশতই হাতের কাজ শেষ করে, পরের দিনের অন্যটি স্থগিত রাখলেন। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেলই, উপরন্তু সেই জঙ্গলেই আর একটিও আমরা মারলাম। ডাক্তার শেষের বাঘটির জন্যে প্রথম গুলির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চরম-ঔষধ, নিদানকালের বিষবড়ি প্রয়োগ করবার ভার অন্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আশাতীত ফললাভ করে আনন্দে তাঁবুতে ফিরে, পরের দিনের অভীষ্ট লাভের প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

গরুর হাড়ের খবর বাড়ীতে লিখবার মত প্রসঙ্গ নয়, বিশেষত তা হ'তে কাক কি কোকিলের এক দানা মাংসেরও প্রত্যাশা ছিল না। আমরা এই গো-হত্যাকারীকে পাহাড়ে, মাঠে, খানা খন্দে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খুঁজে যখন বেলা দুটো পর্য্যন্ত কোন কিনারা করতে পারলাম না, তখন অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যাহ্ন-ভোজনের চেষ্টায় তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এই কারণে আমাদের লাইন হতে তিনটি হাতি কম পড়ে গেল। তাঁদের ফিরে আসতেও অনেক সময় কেটে গেল, আমাদের শীকার-নেতা এই সময়টি বৃথা অপব্যয় না করে, শীকারের সন্ধানেই ফিরছিলেন, বেলাও পড়ে আসছিল, তাই আর একটিবার মাত্র খোঁজে বেরবার মত সময় তখন হাতে ছিল। নদীটি যেখানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ঘুরে এসেছে, তারি তীরে, ঘাস আর শর দিয়ে ঢাকা একখণ্ড জমি ছিল। লম্বায় প্রায় তিন কি চারশ' আর প্রস্থে ১০০ কি ১৩০ গজ হবে। দুকোণায় জঙ্গলটি ফাঁক হয়ে এসেছে, গাছ পালা বড় একটা ছিল না। বাঘ যে পথে আসছিল, সেটা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল, তাই আমাদেরও এগোবার লাইন নতুন করে হাতির মুখ ঘুরিয়ে, বিপরীত পথে যাত্রা করতে হল। আমি একেবারে লাইনের শেষে ছিলাম, ডানের দিকে খানিকটে খোলা ময়দান আর গো চারণের মাঠ ছিল। আমার বাঁয়ে তিনটি হাওদায় তিন জন শীকারী ছিলেন, উভয় দিক হতেই তাঁদের অধিকৃত স্থানগুলিকে, উত্তম, উত্তমতর আর অত্যুত্তম বলা যেতে পারে। পঞ্চম হাওদা যাঁর অধিকারে ছিল, তিনি নদীর পারে বিরাজ করছিলেন। আমি যে জায়গাটি পেয়েছিলাম, তাতে দৈব সুপ্রসন্ন না হলে কিছুই ঘটবার আশা ছিল না। সম্মুখে প্রায় ৮০

গঞ্জ পর্য্যন্ত ফাঁকা জমির মাঝে দুএকটি গাছের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল, সে যেন ঠিক ন্যাড়ার মাথায় অর্ক ফলার মত, এদিকে ওদিকে খোঁচ খোঁচ শূয়োরের কুঁচির মত খাড়া খাড়া দুএকটি গাছ, সমস্ত মাঠটির অনুর্ব্বরতা, আরো যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। নদীর বাঁক ধরে হাতির সারি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল, অল্প কালের মধ্যে বাঘের সান্নিধ্য যতই নিকটতর হতে লাগল, চারিদিকে উত্তেজনার আভাষ ততই দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হল। হাতীর হুঙ্কার, শুণ্ড আস্ফালন, প্রহরী জমাদারের ভঙ্গী হতেই বোঝা গেল যে বাঘ নির্দ্দিষ্ট পথে আসছে না, কিন্তু হাতির সারির মধ্যে যে স্থানটি সব চেয়ে নিরাপদ সেইখান দিয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে। হাতিগুলি যেমন দৃঢ় ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সহজে সেখান হতে পলায়নের সুযোগ পাওয়া কঠিন। আমার সম্মুখের ঘাসবন ঈষৎ নড়ে উঠতেই, আমার সমস্ত শরীর যেন সতর্ক হয়ে উঠল, আমি রুদ্ধনিশ্বাসে একাগ্র দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে রইলাম। দুএক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য সুন্দর শার্দ্দূল রাজের উত্তমাঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হল। তখন সে দূরে, অনেক দূরে, সম্মুখের খোলা মাঠ দিয়ে সে যে আরো কাছে এগিয়ে আসবে, তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার দৃষ্টি, মুষ্টি, মস্তিষ্ক সবই ঠিক ছিল— ৪৬৫ নং গুলি ছুটে গেল, ব্যাঘ্র রাজ কোথায়? কোথায় অদৃশ্য হলেন? না অদৃশ্য হন নি। বিরল তৃণরাজির মধ্যহতে দেখতে পেলাম, তিনি ধরাশয্যা গ্রহণ করেছেন, বিশাল শরীর নিস্পন্দ, জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। মাহুতকে হুকুম দিলাম "বাঢ়াও" ডান চোখের উপর একটি সামান্য ক্ষত চিহ্ন, নাক দিয়ে মস্তিষ্ক মিশ্রিত রক্তধারা বয়ে আসছে, শরীর পাথরের মত নিশ্চল, অসাড়। ক্রমশ—

"আনন্দ মঠ"

——ঃ০ঃ——
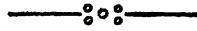
'বন্দেমাতরং' গানটিই হচ্ছে "আনন্দ মঠ"-এর মূল কথা, এমন কি এ উপন্যাসের চেয়ে গানটির মূল্য অনেক বেশি এই মত নাকি স্বয়ং বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন, এমনি একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা সত্য কিনা জানিনে কিন্তু এর মধ্যে যে সমালোচনাটুকু প্রচ্ছন্ন আছে, সেটা যে খুব সত্য সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। আনন্দমঠের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লিখেছিলেন, "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল"। কিন্তু আসলে তা প্রকৃত নয়। স্ত্রীলোক সকল সময়েই স্বামীর সহায় কিনা অথবা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্য ভগবানের ইচ্ছাতেই স্থাপিত কিনা এ সব কথা বোঝাবার জন্য উপন্যাস লেখবার দরকার ছিল না। এ সব সত্য প্রমাণ করবার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ বিস্তর অন্য উপায় ছিল। আশা করি এ কথা বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিম "আমন্দমঠে" কিছুই বোঝাতে চেষ্টা করেন নি, তাঁর মনে যে গভীর দেশভক্তি ছিল তাই তিনি আর্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ করবার চেষ্টা পেয়েছেন।

বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের মধ্যে আনন্দমঠ যে অধিকাংশ পাঠকের

এত ভাল লাগে তার কারণ আনন্দমঠে মাতৃবন্দনার যে সুরটি বেজে উঠেছে, সকলের মনেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বস্তুত আনন্দমঠ আমাদের জাতীয় ইতিহাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে—তাই বঙ্কিমের অন্য উপন্যাস আলোচনা করতে আমরা যদি বা সাহস পাই—আনন্দমঠের সমালোচনা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অথচ এ কথা যেন ভুলে না যাই যে, দেশকে ভক্তি করে যদি দেশের সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা না করি তবে তাতে দেশেরই ক্ষতি হবে।

(২)

আনন্দমঠ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে এ কথা সত্য, কিন্তু দেখতে হবে কোন্ গুণে আকর্ষণ করে। কেবল দেশের কথা আছে বলেই আমাদের ভাল লাগে, না দেশ-সেবার একটা মহৎ আদর্শ, দেশভক্তের একটা সর্ব্বত্যাগী বলিষ্ঠ স্বরূপ আর্টে ফুটে উঠেছে বলেই ভাল লাগে। দেশের কথা থাকলেই যাদের কাব্য বা উপন্যাস ভাল লাগে আমি তাঁদের দেশভক্তির প্রশংসা করি; কিন্তু অতি বিনীত ভাবে বলতে চাই যে, এই সব শ্রদ্ধেয় লোক যদি সাহিত্য-আলোচনা ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিতেন তবে যে-দেশকে তাঁরা এত ভালবাসেন সেই দেশের অনেক মঙ্গল হত। খুব সম্ভব তাঁদের মতে কংগ্রেসের বক্তৃতার চেয়ে উঁচু সাহিত্য পৃথিবীতে দুর্লভ। ইতিহাস গড়তে সাহায্য করলেই অথবা দেশভক্তি থাকলেই যে উপন্যাস বা কাব্য আর্ট হিসাবে বড় হবে না এ কথা সকলেরই জানা উচিত। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ইতিহাসে Uncle

Tom's Cabin-এর স্থান খুব উচ্চে; কিন্তু তাই বলে আর্ট হিসাবে ও-বই বড় নয়। "La Marseillese" ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করেছে, কোন দেশের ইতিহাসে কোন গান তা করে নি। কিন্তু তাই বলে "La Marseillese" যে কবিতা বলে গণ্য হয় নি সে কথা সকলেই জানেন। আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। "ভারত ভিক্ষা"তে ও "ভারত সঙ্গীতে" যতই দেশভক্তি থাক না কেন, আর্ট হিসাবে ও-দুই-ই অতি খেলো, একটি হচ্ছে বুড়ো স্ত্রীলোকের অনাবশ্যক নাকে চোখে অশ্রু বর্ষণ—অন্যটি যাত্রাদলের বীরপুরুষের হুঙ্কার—উভয়ই হাস্যজনক। আর্টে ও সাহিত্যে শিল্পীর কেবল উদার ভাব বা মহৎ সংকল্প থাকলেই চলে না, তার উপযুক্ত প্রকাশ চাই। এই প্রকাশের সফলতার উপরই আর্টের সফলতা নির্ভর করে। সাহিত্যের সমালোচনা কালে এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ওজঃগুণ সাহিত্যের একমাত্র গুণ নয়, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। রান্নায় যেমন ঝাল, সাহিত্যে তেমনই ওজঃগুণ অক্ষমতা ঢাকবার উপায়। বিশেষত, বাঙলা সাহিত্যে সাধারণত আমরা যে ওজঃগুণে মুগ্ধ হই সে হচ্ছে বক্তৃতার ওজঃগুণ—চরিত্রের নয়।

(৩)

উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে বঙ্কিম আনন্দমঠ লিখেছিলেন, সে সময়টা ছিল আমাদের পক্ষে আশা ও উদ্দীপনার যুগ। তখন টাট্‌কা Byron-এর কবিতা পড়ে ও Burke-এর বক্তৃতা পড়ে

আমাদের পক্ষে কেবল সহজ নয়, অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল। আমাদের তখনকার সাহিত্য এই অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। অথচ এই সব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না। তখনকার কাব্য-আলোচনা করলে এটা দেখা যায় যে, সকল উচ্ছ্বাসের চেয়ে বীরত্বের উচ্ছ্বাসটাই আমাদের সহজে আসত। আমাদের কবিরা উকীলই হউন বা হাকিমই থাকুন, যুদ্ধের প্রতি তাঁদের মনের একটু স্বাভাবিক টান ছিল। মাইকেল লিখলেন "মেঘনাদ বধ", হেমবাবু "বৃত্রসংহার", নবীনবাবু "পলাশীর যুদ্ধ"। বিদেশী কবিতা ও উপন্যাস পড়ে আমাদের মনে যে ভীষণ বীরত্বের উদ্রেক হয়েছিল, কাব্যে ও সাহিত্যে সেটা প্রকাশ না করে থাকবার উপায় ছিল না। এই Sentimentality-র যুগে আনন্দমঠের সৃষ্টি। বঙ্কিমের প্রতিভাও এই Sentimentality-কে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। আনন্দ-মঠের যা কিছু দোষ তার মূলে এই যুগের উল্লিখিত ভাবাতিশয্য। বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে, কপালকুণ্ডলায়, কৃষ্ণকান্তের উইলে—বঙ্কিমের লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা, তাঁর গল্প বলার অসাধারণ ভঙ্গী, এই ভাবাতিশয্য তেমন করে প্রকাশ হ'তে দেয় নি। কিন্তু আনন্দমঠের আখ্যায়িকা আমাদের সাহিত্যে এবং ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি মানুষের চরিত্র ও তার স্বাভাবিক পরিণতির ইতিহাস, কিন্তু আনন্দমঠে তিনি যে সকল চরিত্রের অবতারণা করেছেন সে সকল সম্পূর্ণ তাঁর কল্পনাপ্রসূত, এখানে জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁকে এতটুকু সাহায্যও করে নি। আনন্দমঠ যে মহাবনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই মহাবনের মধ্যে প্রার্থনা দিয়ে যে গল্প আরম্ভ হ'ল, আমার মনে হয় সেটা মোটেই প্রক্ষিপ্ত

নয়, এর পিছনে এই সত্য আছে যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে আনন্দ-মঠের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আনন্দমঠ স্বপ্নের মত সুন্দর হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নের মত অশরীরি, অতএব আর্ট হিসাবে সার্থক নয়।

(৪)

আনন্দমঠ বঙ্কিমের হাতে কঠিন নির্ম্মম হওয়া উচিত ছিল—বঙ্কি-মের হাতে এই জন্য বলছি যে, বঙ্কিমের প্রতিভাতে যে কেবল ব্রাহ্মণসুলভ শুচিতা ছিল তা নয়, ব্রাহ্মণসুলভ Austerity-ও ছিল। কিন্তু আনন্দমঠ Austere হয় নি। কুক্ষণে সত্যানন্দ প্রভু এত যত্ন করে "গীতগোবিন্দ" পড়েছিলেন। হয়ত যদি তেমনি যত্ন করে বেদ-ব্রাহ্মণ পড়তেন তাহ'লে আনন্দমঠ এতটা সৌখীন হ'ত না।

১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কথা দিয়ে আনন্দমঠ আরম্ভ হ'ল। পদচিহ্ন গ্রামের যে বর্ণনা আমরা পেলুম তা ভয়ঙ্কর। প্রখর রোদ, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা নির্জ্জন, বড় বড় বাড়ীগুলোতে জনমানব নেই। এই জনহীন নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্যে প্রকাণ্ড শূন্য বাড়ীতে মহেন্দ্র ও কল্যাণী। তারপর মহেন্দ্র ও কল্যাণীর পদচিহ্ন পরিত্যাগ—ডাকাতের হাতে পড়া—সেই ডাকাতের "চেহারা অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ" তাদের "অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট অতি দীর্ঘ শুষ্ক হস্তের শুষ্ক অঙ্গুলি"। আসন্ন বিপ্লবের রুদ্র সুর এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় বেশ বেজে উঠেছে। কিন্তু এ সুর শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা হয় নি। আমরা ভেবেছিলুম দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করে, পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করে, বজ্রগর্জ্জনে তন্দ্রা ভাঙিয়ে—প্রলয়ের

দেবতা আসবেন। তাঁর অসির আভায় বিদ্যুৎ চমকাবে, তাঁর রথের চাকায় লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন-প্রাণ পিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ঝড় এল না, এল জ্যোৎস্না রাত্রি, এল গেরুয়া বসন, গান, হাসি, রসিকতা।

আনন্দমঠের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা দুর্ব্বলতা, একটা সহজ সফলতার ভাব দেখা যায়। তাতেই সত্যানন্দ হ'তে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত কারো মধ্যে তপশ্চর্য্যার প্রখর তেজ দেখি নে, কোথায় সেই দাঁতে দাঁতে চাপা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—কোথায় বার বার পরাজয়েও অটল ধৈর্য্য। সন্তানেরা সন্ন্যাসী ছিলেন বটে কিন্তু তপস্বী ছিলেন না। বস্তুত কঠোর তপস্যার কোন প্রয়োজনই ছিল না। রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তাহা কঠিন—তার ফলেরও কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই সে বিদ্রোহের সঙ্গে গান রসিকতার কোন সম্পর্ক থাকা স্বতই অসম্ভব বলে মনে হয়। বঙ্কিম সন্তান-বিদ্রোহের বিপক্ষ মুসলমান রাজশক্তি বা ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যবল কাউকেও যথেষ্ট পরাক্রমশালী না করাতে, সন্তানদের প্রয়াসের মধ্যেও যথার্থ বিক্রম প্রকাশ পায় নি। প্রায় সকল যুদ্ধে অতি সহজেই মুসলমানেরা হেরেছে। সন্তানেরা কোন গ্রামে উপস্থিত হওয়ামাত্র মুসলমানেরা হিন্দু হয়েছে। সন্তানদের নেতারা কোন দিন মুসলমানের হাতে তেমন করে পড়েন নি, পড়লেও এমন কি জেলে বন্ধ থাকলেও, অতি সহজে সন্তানেরা তাঁদের উদ্ধার করেছে। যে অত্যাচার সন্তান-বিদ্রোহের কারণ এবং যে অরাজকতার উপর সন্তানব্রতের সার্থকতা নির্ভর করেছিল তার ছবি আমরা পাই নে। অথচ এটাই হচ্ছে এ বইয়ের background. ঘন কালো background-এর উপর রক্তের

মত লাল রং-এ অগ্নিকাণ্ডের ছবি আঁকা উচিত ছিল ; কিন্তু আকাশের কালো রং ফিঁকে হওয়াতে আগুনের রং লাল না হয়ে সুখস্বপ্নের মত গোলাপী হয়েছে। বিপক্ষেরা দুর্ব্বল হওয়াতে সন্তানেরাও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সর্ব্বাঙ্গে রাম নাম ছাপ দিয়ে, কপালে তিলক কেটে অতিকায়কে যে কবি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন, তিনি যে কেবল অতিকায়কে কাপুরুষ করলেন তা নয়, পাঠকদের মনে রামের বীরত্বের প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দিলেন।

(৫)

আনন্দমঠের দু'শ'পাতার মধ্যে প্রায় তিন চার বার যুদ্ধের কথা আছে। সন্তানেরা বেশির ভাগ সময়ে গান করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার উদ্ধার সাধন করেছেন। এই সকল যুদ্ধের পিছনে যে কোন রাজ্য স্থাপনের বা রাজধানী অধিকারের লক্ষ্য ছিল, তা মনে হয় না, তবু আনন্দমঠে যদি কিছু action থাকে তবে এই যুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠ করলে দেখা যায় যে এ action-ও অতি মৃদু। পূর্ব্বেই বলেছি যুদ্ধের দিকে বাঙালী লেখকদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন বাঙালী লেখক যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি। তবে মাইকেলের মেঘনাদ বধে কিম্বা হেমবাবুর বৃত্রসংহারে যে যুদ্ধ-বর্ণনা আছে সে হচ্ছে ধনুর্বানের যুদ্ধ। সে যুদ্ধ দীর্ঘ ছন্দে দীর্ঘকাল ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলে বিশেষ দোষ ধরা যায় না। রাম কি বাণ ছাড়লেন তারপর রাবণ কি করলেন—মহাকাব্যে সর্গের পর সর্গ এরূপ বর্ণনা দেওয়ার বিধি আছে। কিন্তু কামান গোলার যুদ্ধ যদি কেউ সেইরূপ গম্ভীর

অচল ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বর্ণনা করেন তবে সেটা সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। নবীনবাবুর পলাশী যুদ্ধের বর্ণনায় "আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন" অথবা নবাব সৈন্যের যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে মোহনলালের দীর্ঘ বক্তৃতা "May be magnificent but it is not war"—চমৎকার হতে পারে কিন্তু যুদ্ধ নয়। বঙ্কিমও যে যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি, তার প্রধান কারণ, তিনি যুদ্ধের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকের বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে চেষ্টা করব। এক যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত ভবানন্দকে কুড়িজন মাত্র সৈন্য নিয়ে পুল রক্ষা করতে হয়েছিল। বঙ্কিম লিখেছেন, "একা ভবানন্দ কুড়িজন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন; কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক, কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, যবন বাত্যা-পীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল —কিন্তু কুড়িজন সন্তান তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না"। কুড়িজন লোক নিয়ে এই যে rearguard action, এ যে কি strain তা কল্পনা করা কঠিন নয়। এই সামাল সামাল ভাব—সন্তান-সেনাপতিদের উদ্বেগ—বর্ণনায় একেবারেই প্রকাশ পায় নি, এমন কি বঙ্কিম এ ব্যাপারটাকে যেন অত্যন্ত সহজ করে ফেলেছেন। ভবানন্দ তোপ দখল করে হাততালি দিয়ে বলছেন "বন্দেমাতরং,"—আবার বলছেন,

"জীবানন্দ এই তোপ ঘুরাইযা বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি"। যুদ্ধক্ষেত্রেও রসিকতা চলছে। যুদ্ধে ভবানন্দ প্রাণ দিলেন। মৃত্যু-কালে তিনি ধীরানন্দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যুদ্ধ করছিলেন। আসল কথা সত্যানন্দ যে তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করেছিলেন সেটা মৃত্যুর পূর্ব্বে ভবানন্দকে না জানালে তাঁর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা দেখান হত বঙ্কিম তাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধ যে বিশেষ ভয়ঙ্কর নয় তার প্রমাণ এই যে, বইয়ের শেষে দেখা গেল যে সন্তানদের প্রায় সকল নেতাই জীবিত রইলেন এবং সত্যানন্দের তিরোধানের পর যখন সন্তান-দল ভেঙ্গে গেল তখন খুব সম্ভবত সকলেই সুবোধ ছেলের ন্যায় ঘরে ফিরে চাক-রীর চেষ্টা করলেন। মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর মিলন হল, তাঁরা পদচিহ্নে ফিরে গেলেন। জীবানন্দ মরে ছিলেন, তাঁকে বাঁচান হ'ল, না হলে শুভ মিলন হয় না,—তিনি ও শান্তি হিমালয়ে গেলেন। ধীরানন্দ জ্ঞানানন্দের মৃত্যুর কোন কথাই নেই, অতএব বোধ করি তাঁরাও বেঁচে রইলেন। এক ভবানন্দের মৃত্যু হ'ল—তবে তাঁর স্ত্রী·পুত্র নেই সুতরাং বিশেষ ক্ষতি হ'ল না।

(৬)

আনন্দ মঠের সঙ্গে যখনই আমাদের প্রথম পরিচয় হল—তখনই তা Complete. হাজার হাজার লোক সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করা হয়েছে—কামান সম্বন্ধে যে টুকু ত্রুটি ছিল, অতি সহজেই মহেন্দ্রকে দীক্ষিত করে সে অসুবিধাও আর রইল না। এখন

যুদ্ধ আরম্ভ করলেই জয়লাভ নিশ্চিত। এই সম্পূর্ণতার পিছনে কত বছরের নিষ্ফলপ্রয়াস, কত অত্যাচার, কত অবিচার ছিল বঙ্কিম তার আভাষও দেন নি, অথচ এই লক্ষাধিক সাধারণ সন্তান—যারা যুদ্ধ করেছে, লুট করেছে, বঙ্কিম যাদের পরিচয়ও দেন নি, সে সব লোক বর্ত্তমানের কোন দুঃসহ অত্যাচারের ফলে বা ভবিষ্যতের কোন মহিমান্বিত আদর্শের আকর্ষণে নিজের চির দিনকার ঘরকন্না, পুরুষানুগত সংস্কার ত্যাগ করে প্রলয়ের আহ্বানে ছুটে এসেছিল—প্রাণ দিতে। কোথায় ছিল পণ্ডিতের টোলে জীবানন্দ আর শান্তি, কোথায় ছিল প্রাসাদে মহেন্দ্র আর কল্যাণী, কোথায় ছিল ভবানন্দ, কত দ্বিধা কত চিন্তার পর তাঁরা সত্যানন্দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—তা আমরা জানি নে, কিন্তু একথা সত্য যে আনন্দ মঠের ঈষৎ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণু জগদ্ধাত্রী কালী ও দুর্গামূর্ত্তির সামনে সত্যানন্দের রূপক বক্তৃতার দ্বারা এ সকল সম্পাদিত হয় নি। এক মহেন্দ্রের দীক্ষা লওয়ার ইতিহাস আমরা পাই, তাও অতি বিচিত্র। আজন্ম ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত অতি সাধারণ লোক মহেন্দ্র, বেশি ইতস্তত না করে হঠাৎ দীক্ষা নিতে স্বীকার করলে। বাধা ছিল কল্যাণী, অন্য কোন স্বাভাবিক কারণের অভাবে এক স্বপ্ন দেখিয়ে কল্যাণীকে বিষ খাওয়ান হ'ল, মহেন্দ্রের দীক্ষার পথ নিষ্কণ্টক হ'ল।

(৭)

সন্তানদের মধ্যে আমরা যাদের পরিচয় পাই সে হচ্ছে সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও মহেন্দ্র, সমস্ত বইতে এঁরাই হচ্ছেন প্রধান পুরুষচরিত্র এবং সন্তানদের মধ্যে এঁরাই হচ্ছেন

সেনাপতি। যুদ্ধের সময়ে সব চেয়ে বেশি তরওয়াল ঘোরান এবং যুদ্ধান্তে বক্তৃতা দেওয়া আর সারং বাজিয়ে গান গাওয়া ভিন্ন এঁরা এমন কোন কাজই করেন নি, যাতে করে তাঁরা সেনাপতি হতে পারেন। সেনাপতির অপেক্ষা নভেলের নায়কত্ব এঁদের ভাল মানাত। সত্যানন্দ ও জীবানন্দ চমৎকার গাইতে পারতেন, ভবানন্দ দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, বঙ্কিম তাঁর "ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রু শোভিত সুন্দর মুখমণ্ডলের" বর্ণনা দিয়েছেন, ভবানন্দও গাইতে পারতেন। মহেন্দ্র জমীদারের ছেলে, সেও বেশ গাইতে জানত, ধীরানন্দ বা জ্ঞানানন্দের এ সব গুণের কোন উল্লেখ নেই, তবে তাঁরা বড় দরের নেতা ছিলেন না। বঙ্কিম এঁদের এত সুকুমার করে সৃষ্টি করেছেন যে, মনে হয় যুদ্ধের মত দারুন নিষ্ঠুর ব্যাপারে এই সব সেনাপতিদের সুন্দর গেরুয়া বসনে কাদা লাগতে পারে। এঁরা যুদ্ধ করেছিলেন বটে কিন্তু "নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে" যুদ্ধ করেছিলেন —এঁদের সৈন্যদের অস্ত্রের ঝঞ্জনাও "ললিত তালধ্বনি সম্বলিত" ছিল। এই সব কবি-যোদ্ধারা যে যুদ্ধ জয় করতে পেরেছিলেন তার-কারণ টমাস, হে প্রভৃতি ইংরেজ-সেনাপতিরা এঁদের চেয়েও অকর্ম্মণ্য ছিল। অনেক সময়ে মনে হয় সন্তান-সেনাপতিরা এ ব্রত গ্রহণ না করে "চির কুমার সভার" খাতায় নাম লেখালে—ঢের বেশি স্বাভাবিক হত। নায়িকাদের মধ্যে দেখতে পাই শান্তি সুন্দরী, বিদুষী; সত্যানন্দ জীবানন্দের তুল্য বলিষ্ঠ ছিলেন—সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ অধিকার, কারণ তিনি যে গান গাইতে পারতেন তা নয়, তবে "রাগ-তাল-লয় সম্পূর্ণ" করে গীতগোবিন্দ গাইতে পারতেন। কল্যাণীও সুন্দরী—তিনিও যে অল্প স্বল্প গাইতে না জানতেন তা নয়, কারণ বিষ খেয়ে

মৃত্যুর পূর্ব্বেই "অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে" মোহভরে ডাকিতে লাগলেন —হরেমুরারে মধুকৈটভারে। তিনি শান্তির মত সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করেন নি, তবে নানা রকম গুরুতর কাজ সত্বেও সন্তানদের নেতাদের কল্যাণীর বিদ্যা শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁকে ব্যাকরণ, অভিধান এবং গীতা পড়ান হত। বঙ্কিম সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থাতেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করেছিলেন। বোধ করি তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধই কর আর যাই কর না কেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"।

(৮)

সত্যানন্দকে দল থেকে একটু আলগা রেখে, একটু উচুঁতে দাঁড় করান বোধ হয় বঙ্কিমের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনেক সময়ে সে উচ্চতা রক্ষা হয় নি। নবীনানন্দ বেশে শান্তি যখন দীক্ষা গ্রহণ করল তখন সত্যানন্দ তার ছদ্ম বেশ ধরতে পারেন নি—যদিও পরে বলেছিলেন, "যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এ কাজে হাত দিতাম"। তার পর জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ যে ধনুকে গুণ চড়াতে পারতেন, শান্তি যখন সে ধনুকে গুণ দিল, তখন সত্যানন্দ যে কেবল বিস্মিত হয়েছিলেন তা নয়, ভীতও হয়েছিলেন। দাড়ির প্রাচুর্য্যে শান্তির প্রকৃত পরিচয় যখন প্রকাশ পেল তখন তার সঙ্গে তর্ক বিতর্কে সত্যানন্দ যেন খেলো হয়ে পড়লেন। আর একবার জীবানন্দের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তিনি শান্তিকে বলেছিলেন, "মা দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে,

আমি সকল জানি। তোমার 'প্রলোভনে' তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে"। হ'তে পারে কার্য্যোদ্ধারের উপায় এই, কিন্তু এ সব কৌশল সত্যানন্দের মুখে মানায় নি। সমস্ত সন্তান-সম্প্রদায় যাঁকে অবতারের মত ভক্তি করত, হিমালয়ের গুহায়, আনন্দ-কাননে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা যাঁকে সন্তানব্রতে ব্রতী করেছিলেন, তাঁর সামান্য কথা আদেশ বলে মান্য হওয়া উচিত ছিল। শান্তির সঙ্গে বাদানুবাদে এ সব অনুনয় বিনয় তাঁকে মোটেই শোভা পায় নি। এতে মনে হয় যে অন্তরে যে প্রেরণা, যে মহত্ব থাকলে মুখের কথা দৈববাণী হয়ে ওঠে, সত্যানন্দের তা ছিল না। মাঝে মাঝে বঙ্কিম সত্যানন্দকে অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলে দাঁড় করিয়েছেন। আবার পাছে বইর বাস্তবতা নষ্ট হয় তাই অলৌকিকতা বাদ দিয়ে কৌশলে ঘটনাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। ভবানন্দ যে কল্যাণীকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল, এ কথা সত্যানন্দ জানতে পারেন; কি করে জেনেছিলেন সেটা বঙ্কিম প্রথমটা বলেন নি। অন্ধকার রাত্রে বনমধ্যে ভবানন্দ যখন প্রার্থনা করেছিলেন যে, ধর্ম্মে যেন তাঁর মতি থাকে তখন অদৃশ্য সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সে সময়ে মনে হ'ল যেন সত্যানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা ভবানন্দের মনের অবস্থা জানতে পেরেছিলেন। তার পর জানা গেল যে, যে সময়ে ভবানন্দ কল্যাণীকে ও-সকল কথা বলেছিলেন তখন সত্যানন্দ কল্যাণীকে গীতা পড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত ভবানন্দ যাওয়াতে পাশের ঘরে লুকিয়ে কথাটা শুনেছিলেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন ভবানন্দের প্রার্থনার উত্তরে

অদৃশ্য সত্যানন্দ "অতি মধুর অথচ গম্ভীর মর্ম্মভেদী কণ্ঠে" তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ বনমধ্যে সত্যানন্দের কথা শুনে ভবানন্দের রোমাঞ্চ হয়েছিল এবং সত্যানন্দকে অনেক ডেকেছিলেন কিন্তু সত্যানন্দ কোনো জবাব দেন নি। যদি সত্যানন্দের কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই থাকে তবে এ সকল sensationalism-এর দরকার ছিল না—লুকিয়ে কথা শোনাতে, অস্বাভাবিক যায়গায় অপ্রত্যাশিত ভাবে অদৃশ্য থেকে হঠাৎ কথার জবাব দেওয়াতে যেন মনে হয় সত্যানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করছিলেন। এই সকল clap trap সত্যানন্দকে আরও হীন করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, সত্যানন্দ প্রভুর কি কাজ ছিল না—তীর্থপর্য্যটনের কথাটা না হয় মেনেই নিলাম, কারণ তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল যখন অনিশ্চিত, বহু বাধা বিপদের মধ্য দিয়ে তবে হয়ত দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা যাবে, হয়ত চেষ্টা সফল হবে না, এমনি সময়ে বিদ্রোহীদের নেতাকে কল্যাণীর বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এত মনোযোগ না দিলেও ক্ষতি ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, তীর্থপর্য্যটন থেকে ফিরে এসে প্রথমেই সত্যানন্দকে দেখা গেল গৌরী দেবীর বাড়ীতে কল্যাণীকে পড়াতে ব্যস্ত। সত্যানন্দ তখন আনন্দমঠেও যান নি। কল্যাণীর ঘরে ভবানন্দের সাক্ষাৎ হত, তাও তিনি করলেন না—বোধ হয় ভবানন্দ কি করে তাই দেখবার জন্যে। তা ছাড়া কল্যাণীর গীতাপাঠ না থাকলেও মহেন্দ্র-কল্যাণীর দাম্পত্য-জীবনে বিশেষ গোলযোগ হবার ত কোন সম্ভাবনা ছিল না—হয়ত বা কল্যাণী বেশি শাস্ত্র পাঠ করলেই গোলযোগ হত, কারণ মহেন্দ্র বেচারাকে আমরা যতদূর জানি সে শাস্ত্র টাস্ত্র কিছুই জানত না। দীক্ষার পূর্ব্বে মহেন্দ্রকে প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বোঝাতে সত্যা-

নন্দ প্রভুর অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। যা হোক, কল্যাণী তখন স্বামী-কন্যার কোনো খোঁজ না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ। বঙ্কিম আধ পাতা ভ'রে সে বিষণ্ণতার বর্ণনা দিয়েছেন। এমন অবস্থায় গীতার নির্লিপ্ততা শিক্ষা কল্যাণীর পক্ষে দরকার ছিল সন্দেহ নেই, তবে গীতা-পাঠের মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গল্পের ধারা ঝরণার মত চালিয়ে নিতে যে বঙ্কিমের তুল্য লেখক বঙ্গসাহিত্যে নেই, সেই বঙ্কিম আনন্দমঠে এমন সকল অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়েও গল্পের ধারা রক্ষা করতে পারেন নি। খুব সম্ভবত সত্যা-নন্দের নানাবিধ দুর্ব্বলতা বঙ্কিম বুঝেছিলেন এবং সেই কারণেই আবার এক চিকিৎসককে এনে এবং সন্তানব্রতের আরম্ভটাকে অলৌকিক রহস্যে আবৃত রেখে সমস্ত চেষ্টাকে গৌরব দিতে চেয়েছিলেন।

(৯)

সন্তানদের নায়কদের মধ্যে কারো character-ই বেশ স্বাভাবিক হয় নি। তবে মহেন্দ্রের চরিত্র অন্যের চেয়ে ফুটেছে। নানা রকম ভদ্রোচিত সংস্কারের মধ্যে আজন্ম পালিত মহেন্দ্র সন্তানদের হাতে পড়ে সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের বেশি বদল হল না। মহেন্দ্র সে রকম করে দলে মিশতে পারলেন না। জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি কাজেকর্ম্মে এমন কি নামে যেমন আনন্দ মঠের সঙ্গে জড়িত, মহেন্দ্র তেমন জড়িত হন নি। নীরব ভাল মানুষ মহেন্দ্রের মুখে বঙ্কিম কোন বীররসাত্মক বক্তৃতা দেন নি, এমন কি শেষ যুদ্ধে প্রথমে যখন সন্তানেরা পলায়ন করছিল এবং পরাজয় যখন অনিবার্য্য বলে মনে হয়েছিল, তখন জীবানন্দ মহেন্দ্রকে

বলেছিলেন "এস এইখানে মরি"। মহেন্দ্র বলেছিলেন "মরিলে যদি রণজয় হইত তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে"। অথচ অনাড়ম্বর ভাবে মহেন্দ্রই সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিলেন। মহেন্দ্রের মত লোকেরা হয়ত বোঝে কম, জীবানন্দ ভবানন্দের মত প্রতিভাশালী নয়, কিন্তু একবার বুঝলে এ শ্রেণীর লোকদের মন থেকে সে শিক্ষা দূর হয় না। জীবানন্দ ভবানন্দ নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন কিন্তু মহেন্দ্র তা করেন নি। জীবানন্দ ভবানন্দ যা করেন খুব চটপট করেই করেন, মহেন্দ্রের কিন্তু দ্বিধার অন্ত ছিল না এবং সে দ্বিধার পেছনে ছিল তাঁর সংস্কার ও শিক্ষা। মহেন্দ্রের সঙ্গে ভবানন্দের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। ভবানন্দ সিপাহীদের হাত হ'তে মহেন্দ্রকে উদ্ধার করেন, তার পর যখন সিপাহীদের সঙ্গে সন্তানদের যুদ্ধ বাধে, মহেন্দ্র সন্তানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর মনে হল যে সন্তানেরা দস্যু। মহেন্দ্র জানতেন যে ডাকাতি করা অন্যায়, অমনি তিনি সরে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ সিপাহীরা যে তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা ভবানন্দই যে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন এ সব কথার চেয়ে নীতি-শিক্ষার "চুরি করা মহা পাপ" এই শিক্ষাই প্রবল হল। আর একবার কল্যাণীর সঙ্গে মিলনের পর পদচিহ্নে নিজের অন্তপুরে কল্যাণীর শয়নগৃহে নবীনানন্দ বেশে শান্তিকে দেখে মহেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত ও রুষ্ট হয়েছিলেন, তারপর যখন কল্যাণী নিজে নবীনানন্দের বাঘছাল খুলে দিতে লাগলেন তখন মহেন্দ্রের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা মুস্কিল হল। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল—"কি গোঁসাই, সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস"! মহেন্দ্র বললেন—"ভবানন্দ ঠাকুর কি অবিশ্বাসী ছিলেন"?

অর্থাৎ বিশ্বাস টিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও, আমি এসব পছন্দ করি নে। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল, "কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে" ? জীবানন্দ বা ভবানন্দ খুব সম্ভবত এ অবস্থায় পড়লে, হয় সত্যই বিশ্বাস করতেন, না হয় নবীনানন্দের গলা ধরে বাড়ী থেকে বের করে দিতেন, কিন্তু মহেন্দ্র ফস করে মিথ্যা কথা বলে বসলেন, "কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম, কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল তাই আসিয়াছি"। আসলে মহেন্দ্র মহা বিপদে পড়েছিলেন, তিনি বিরক্ত বোধ করেছিলেন কিন্তু ভাবলেন "যে কল্যাণী একদিন অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল, সে কি অপরাধিণী হইতে পারে" ? আমার মনে হয় কল্যাণীর বিষ ভোজনটা মহেন্দ্র নিছক দুঃখ হিসাবে গণ্য করেন নি, অবশ্য কল্যাণীর মৃত্যুতে তাঁর খুব আঘাত লেগেছিল সন্দেহ নেই, তবু মনে মনে এই জন্য একটু আত্মপ্রসাদও অনুভব করেছিলেন যে, আমার স্ত্রীর মত পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী কার, যে আমার ব্রত-সেবার পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য এক মুহূর্ত্তে বিষ খেল, সে কি সোজা কথা। আর কারো স্ত্রী করুক দেখি। মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখে শান্তি আত্মপরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল, অবশেষে "সাহসে ভর করিয়া নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিল", শান্তির ছদ্মবেশ ধরা পড়ল। কিন্তু তবু নিস্তার নেই, নিজের স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু জীবানন্দ ঠাকুর কেন শান্তির সঙ্গে সহবাস করেন, এই ভেবে মহেন্দ্র ভারি বিষণ্ন হলেন। কল্যাণী শান্তির পরিচয় দিল, "মুহূর্ত্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, 'ইনি ব্রহ্মচারিণী"। যাহোক বাঁচা গেল, মহেন্দ্র এই ভেবে নিশ্চিন্ত

হলেন যে ভুলক্রমেও সে কোন দিন দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মেশেন নি। যে সব লোক দিব্যি খেয়েদেয়ে দিনে ঘুমিয়ে পান চিবিয়ে জীবন কাটায় এবং নীতিপাঠের সকল নীতিগুলি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পালন করে' পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারে, মহেন্দ্র সেই জাতের লোক। যে মহেন্দ্রের উচিত ছিল উকীল কি অধ্যাপক হওয়া, সেই মহেন্দ্র হঠাৎ এক দিন সন্তানব্রত গ্রহণ করলেম অথচ বঙ্কিম তার কোন জবাবদিহি করা দরকার বোধ করেন নি। মহেন্দ্রকে বঙ্কিম অনেক বিষয়ে অবহেলা করেছেন। এই অবহেলাতেই মহেন্দ্র একটা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন কিন্তু মনোযোগ দিলে মহেন্দ্র একটা ঘোরতর বীরপুরুষ বা মহাপুরুষ হয়ে উঠতেন এবং সেই পরিমাণে অস্বাভাবিক হতেন। আনন্দ মঠের মহাপুরুষদের গীতাপাঠ, হরিসংকীর্ত্তন, সুন্দর চেহারা এবং মাঝে মাঝে যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব ও বক্তৃতা পড়ে পড়ে মহেন্দ্রকে ভালই লাগে এ কথা স্বীকার করতে আমাদের লজ্জা নেই।

পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্র সৃষ্টিতেই যে বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত ছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। এই নারীচরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিম আশ্চর্য্য সাহস দেখিয়ে ছিলেন। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে যখন স্ত্রীলোক অর্থে আমরা অবলা, সরলা, পতিব্রতা, পাঁচ ছেলের মা'র কথা ভাবতুম সেই যুগে ভ্রমর, শৈবলিনী, দেবীচৌধুরাণী, কুন্দ, রোহিণী—এদের ছবি আঁকা যে কঠিন ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বঙ্কিম মেয়েদের কেবল স্বাধীনা করেন নি, সবলাও করেছেন। শান্তিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে, দেবী চৌধুরাণীকে ডাকাতের সর্দ্দারি করিয়ে ক্ষান্ত হন নি, এমন কি দলনীকে দিয়ে তকির্খাকে পদাঘাত

করিয়েছেন, মৃণালিনীকে দিয়ে হৃষীকেশকে পদাঘাত করিয়েছেন। কিন্তু নারীচরিত্রেও আনন্দমঠ অন্য সকল উপন্যাস অপেক্ষা হীন। ভ্রমর, শৈবলিনীর সঙ্গে শান্তি ও কল্যাণীর তুলনাই হতে পারে না। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর কিম্বা চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, রাজসিংহে চঞ্চলকুমারী—সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রের মত। তাদের বাদ দিয়ে ও-সকল বই লেখাই হতে পারে না। আনন্দমঠে কল্যাণীর স্থান খুব সঙ্কীর্ণ—তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন নেই; কিন্তু শান্তি অনেকটা জায়গা অধিকার করেছে। জীবানন্দ, সত্যানন্দ সকলেই তার কাছে মাথা হেঁট করেছেন অথচ এই বইতে তার প্রয়োজন ছিল না। তার সমস্ত লাফালাফি, ঘোড়ায় চড়া, সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা নিয়েও সে একেবারে অনাবশ্যক। শান্তিকে বাদ দিলে আনন্দমঠের কোন অঙ্গহানি হ'ত না। জীবানন্দের সঙ্গে মিলে সে এমন কোনো কাজই করে নি যা আর যে-কোন সন্তান করতে পারত না। আসলে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করা, কুস্তিগীর, নির্লিপ্তার একটা আদর্শই বঙ্কিম স্থষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শান্তিতে তার আরম্ভ—দেবীচৌধুরাণীতে তার পরিণতি। প্রথম যখন তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, প্রগল্ভা স্ত্রীলোক গড়েছিলেন তখন সে বেশ হয়েছিল কিন্তু যাই তাকে গীতা পড়িয়ে, কুস্তি শিখিয়ে, ঘোড়ার উপর চড়ালেন তখনই সে কেবল অবাস্তব নয়, অস্বাভাবিকও হয়ে পড়ল।

আনন্দমঠের মূল কল্পনার মধ্যে যে, কেবল ভাবাতিশয্য দেখা দিয়েছে তা নয়—অনেক সময় ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে তা অতিরিক্ত প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমের অনেক বইতেই একটু থিয়েটারি ঢং দেখা যায়—যেমন কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে গুলি করবার পূর্ব্বে

গোবিন্দলালের বক্তৃতা। আনন্দমঠে কল্যাণীর বিষ পানের দৃশ্যটাও প্রায় বাঙলা থিয়েটারের দৃশ্য হয়ে পড়েছে। কল্যাণী বিষ পাণ করে মহেন্দ্রের সঙ্গে duet গাইতে আরম্ভ করলেন, ইতিমধ্যে সত্যানন্দ এসে উপস্থিত হলেন, তিনিও যোগ দিলেন। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি যে ষ্টেজের অন্তরালে ক্ল্যারিওনেট এবং বাঁয়া তবলা বাজতে লাগল এবং গানটা শেষ হবার পূর্ব্বেই টেরিকাটা, লালগেঞ্জীর উপর মিহি পাঞ্জাবী-পরা দর্শক বাবুরা "এনকোর" "এনকোর" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কিছু পরে যখন মহেন্দ্র গিয়ে হঠাৎ সত্যানন্দের কোলে বসল তখনকার দৃশ্যটা বাঙলা থিয়েটারের দর্শক মহাশয়রাও সহ্য করবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।

আনন্দমঠের শেষ হ'ল ট্র্যাজেডিতে—দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সকল বাধা যখন দূর হয়ে গেল তখনই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজল। ইতিপূর্ব্বে আর একদিন বিদায়ের আহ্বান এসেছিল। সত্যানন্দ বলেছিলেন—"হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘীপূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব"। সেই মাঘীপূর্ণিমায় আবার যখন আহ্বান এল তখন না মেনে উপায় ছিল না। যুদ্ধ জয়ের পর কাউকেও কিছু না বলে সত্যানন্দ আনন্দমঠে একা ফিরে এসে বিষ্ণুমন্দিরে ধ্যানে বসলেন, তার পরে সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সামনে ক্ষীণালোকে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে নিয়ে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। সেই নিস্তব্ধ পাষাণ মন্দিরে স্তিমিতালোকে বিষ্ণুর অঙ্কে মোহিনী মূর্ত্তির চোখ থেকে অশ্রুকণা ঝড়ে পড়েছিল কিনা কে জানে। সেই জনহীন, শব্দহীন, মহারণ্যের মধ্যে পড়ে রইল নিরানন্দ আনন্দমঠে পূজাবিহীন দেবতা, আর পড়ে

রইল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের নীচে হাজার অখ্যাত অজ্ঞাত সন্তানের মৃত দেহ।

আনন্দমঠের দোষের কথাই আলোচনা করা গেল কিন্তু এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, আমরা বঙ্কিমের প্রতিভাকে হীন মনে করেছি। সত্যানন্দের প্রয়াসের বিপুলতা অস্ফুট থাকুক—বঙ্কিমের প্রয়াসের বিপুলতা বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত নয়। বঙ্কিমের প্রতিভা ত কেবল আনন্দমঠ সৃষ্টি করে নি—চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষের সঙ্গে আনন্দমঠ পড়লে সে প্রতিভার বিপুলতা বোঝা যায়। আনন্দ মঠের সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও একথা আমরা ভুলতে পারব নাত যে, "ভারতভিক্ষা" ও "ভারত বিলাপের" দিনে বঙ্কিম মাতাকেই বন্দনা করেছিলেন এবং সুবর্ণনির্ম্মিত দশভুজা জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিয়ে বলেছিলেন—"এই মা, যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ ধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিণী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী এস আমরা মাকে প্রণাম করি"।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

উপকথা।

———:*:———

মানুষ ছিল একদিন অতি নির্ব্বোধ, তাই সে তার পাশের সঙ্গিনীটিকে রেখেছিল ক্রীতদাসী ক'রে। তার পায়ে সে বেঁধে দিয়েছিল লোহার শিকল—এমনি একটু লম্বা যে ঘরের কাজে সে এদিক ওদিক করতে পারে ; কিন্তু বাইরে দৌড়ে ছুটে না পালায়।

সঙ্গিনীটিও থাকত, ঠিক ক্রীতদাসীর মতই।

তার মনের কথা কে জানে? মানুষের কুটীরখানি সে মেজে ঘসে ধুয়ে মুছে চকচকে ঝকঝকে করে রাখত। উঠানে নিজ হাতে তুলসীগাছ গোড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে সকল অমঙ্গলকে দূরে রাখবার প্রার্থনা জানাত। মানুষের ক্ষুধার আহার জুগিয়ে দিত, তৃষ্ণার জল এনে দিত, পূজোর ফুল সাজিয়ে দিত। মানুষ মনে মনে ভাবত, ও যে আমার জন্যে এত করে, তা আমি না হ'লে ওর চলে না বলে'।

মানুষের মনের কথা জেনে বিধাতা মনে মনে হাসলেন। তিনি মজা করবার জন্যে একদিন সঙ্গিনীটিকে তার পাশ থেকে সরিয়ে নিলেন।

মানুষ সে দিন কুটিরে ফিরে এসে দেখলে যে, ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই।

দেখে মানুষ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি, চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করলে ; কার সঙ্গে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে তা খুঁজতে লাগলে। এমন সময় বিধাতা এসে

উপস্থিত হলেন। নিতান্ত ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি ?

ব্যাপার কি ? মানুষ রেগে বলে উঠল,—ব্যাপার কি ? কোথায় গেল আমার সে ? ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই, সেই যে সব করত।

বিধাতা বললেন—কেবল এই ?

মানুষ বললেন—তা নয় ত কি !

বিধাতা বললেন—বেশ তুমি সবই ঠিক ঠিক পাবে। তোমার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, সব, কিছুরই ত্রুটি হবে না।

বিধাতার মন্ত্রগুণে মানুষ সব ঠিক ঠিক পেতে লাগল—তার ক্ষুধার আহার তৃষ্ণার জল পূজোর ফুল—সব ঠিক ঠিক আগেরই মত।

কিন্তু সঙ্গিনীটি আর ফিরলে না।

সেই ঠিক ঠিক সবই রইল—ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, কিন্তু সেই সুরটি ত তেমন করে বাজে না। সেই সুরটি—যে সুরটি তার আহার ও পানের মাঝামাঝি বিচ্ছেদটুকুকে পূর্ণ ক'রে রাখত, তার পান ও পূজোর মাঝামাঝি অবসরটুকুকে সন্তোষ আর তৃপ্তি দিয়ে ভরিয়ে দিত। আজ এ যে আহারের পিছনে কেবল আহারই আছে, জলের পিছনে কেবল জল, ফুলের পিছনে কেবলই ফুল—মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠুরতার মত, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়, হৃদয়হীন যন্ত্রের মত আপন আপন কর্ত্তব্য ক'রে যায়।

বাইরের কাজ সেরে মানুষ সেদিন ক্লান্তদেহে তার কুটীরে ফিরে এলো, দেখলে সব ঠিক ঠিক সাজান,—তার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কে চায়, কে চায় তোমার এ সব? কে চায়, কে চায় তোমার এই হৃদয়হীন বিদ্রূপ? কে চায়, কে চায় তোমার এই যন্ত্রচালিত নির্দ্দয়তা?

লাথি মেরে সে তার সমস্ত খাবার ছড়িয়ে দিল—জলের পাত্র উলটিয়ে দিল, ফুলের রাশি ছয়-নয় ক'রে দিল।

বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—আবার ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি? মানুষ ক্রুদ্ধস্বরে বললে,—ব্যাপার কি? কে চায় তোমার এ সব? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার ওই হৃদয়হীন ভোগ-সামগ্রি। আমার তাকে ফিরিয়ে দাও।

বিধাতা হাসলেন। তার সঙ্গিনীটিকে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

মানুষ সে দিন তার সঙ্গিনীটির পা থেকে লোহার শিকল খুলে নিয়ে তার হাত দু'খানিতে সোনার কাঁকন পড়িয়ে দিল, তার গলায় মুক্তাহার ঝুলিয়ে দিল, তাকে বক্ষে চেপে চুম্বন ক'রে বললে,—তুমি ত ক্রীতদাসী নও, তুমি যে পূর্ণা, তুমি অসম্পূর্ণকে পূর্ণ কর, তুমি শূন্যকে সম্পদশালী করে তোল, তুমি ক্রীতদাসী নও।

সে দিন মানুষ যে ফুল দিয়ে পূজো করতে বসল, সে ফুলের গন্ধে দেবতা জাগ্রত হয়ে উঠলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অদৃষ্ট ?

——:o:——
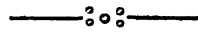
(Henri Barbusse-এর ফরাসী হইতে)

শাদা ফাঁকা দেওয়ালের গায়ে খোলা জানলাটি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সন্ধ্যার দৃশ্য—যেন একটা ছবি, যার শেষ নেই। আর বুড়ো দুটি বন্ধু ও সেখানে বসেছিল,—পাথরে-কাটা মূর্ত্তির মতই ভাবার্থহীন।

তারা দু'জনে জীবনের শেষ ক'টা দিন পাশাপাশি কাটিয়ে দিচ্ছিল; একই কোণটুকুর ছায়া ও রৌদ্রে দু'টিতে গড়িমসি করত, একই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টার প্রতীক্ষা করত, ও কখনো কখনো কথা কইত।

—"সকলি ভুল। অদৃষ্ট ছাড়া কিছু নেই,"—বুড়ো দমনক এমন ভাবে এই কথাগুলি বল্লে, যেন সে ইতিপূর্ব্বে যা বলেছে, বা মনে করেছে যে বলেছে, তারই এই শেষ কথা।

বুড়ো কুলদা উত্তরে বল্লে—"না, তা নয়। আর সকলের যেমন, অদৃষ্টেরও তেমনি ভুল হয়ে থাকে।"

প্রথম বক্তা মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করে দেখ্‌লে। সে দৃষ্টির ভিতর ছিল একটুখানি মায়া এবং একটুখানি তাচ্ছিল্য—কিন্তু আশ্চর্য্যের ভাব কিছুই ছিল না, কারণ, এ বয়সে তার পক্ষে একটু এলোমেলো বকাটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

অপর ব্যক্তি ঘাড় নাড়লে,—সে ঘাড় এক আঁটি কাঠের মত চিম্‌সে ও খাঁজকাটা; এবং শুকনো কাঠখানার মত হাত দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে হাঁটু চাপ্‌ড়ে বল্লে—

—হাঁ হয়। আর এমনও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে, যার আবার প্রতিকার হয়।"

দমনক চাপা গলায় হুঁঃ বলে তার নিস্তেজ, লাল কোটরগত চোখ দুটি আকাশের দিকে তুল্লে। এই ভেবে তার মনটা নরম হ'ল যে, কিছুদিন বাদেই সেও মুখ খুল্লে হয়ত এমনি বাজে কথাই বল্‌বে।

কুলদা বল্‌তে লাগল—"আমি এককালে বীরনন্দিনীকে বিয়ে করেছিলুম। এখন আর আমি তার কথা মনেও করি নে। কিন্তু সেদিন একটি মেয়েকে দেখলুম, অনেকটা তার মত দেখ্‌তে; তাই তাকে আবার চোখের সামনে দেখতে পেলুম, তার সব কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি তাকে বিয়ে করেছিলুম; আর তার দু'মাস আগে বন্দুকের এক গুলি মেরে তার বাপের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলুম।"

দমনকের হঠাৎ ভয় হ'ল যে, তার সঙ্গী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বক্‌ছে, এবং এ অবস্থায় সে নিজে বল্‌তে গেলে একলাই ঘরে রয়েছে। থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—

—"অ্যাঁ, কুলদা! তুমি ঘুমচ্ছ?"

—"না। আমি না ঘুমিয়ে ভাবছি। আমি যথার্থই সে মেয়েকে বিয়ে করেছিলুম এবং যথার্থই সে বুড়োর দুই রগের মধ্য দিয়ে এক গুলি চালিয়ে দিয়েছিলুম। প্রথমেই ব'লে রাখি যে, সে মেয়েটি

বাপকে দেবতার মত পূজো করত, আর বাপও তাকে তেমনি ভালবাসত।”

ছোট ছেলে যেমন ক'রে গল্প শোনে, দমনক তেমনি আবার শান্ত ও লক্ষ্মীটি হয়ে বল্লে—

—“সে অনেক দিনের কথা।”

—“হাঁ, এতদিন আগেকার যে, মনে হয় যেন অন্য কার কথা বল্‌ছি, আর এ সব যেন আমি জন্মাবার পূর্ব্বে ঘটেছিল।”

বুড়ো যেন এক যুগ পিছিয়ে গিয়ে, স্মৃতির মত তার পূর্ব্বজীবনের অনর্গল ভাষা ফিরে পেয়ে বলে' যেতে লাগল—

—“বীরবাহু কর্ত্তা ছিল ধূর্ত্ত ও খাঁটি লোক। তাই সে আমাকে তার মেয়ে দিতে নারাজ ছিল। কারণ, আমি ছিলুম এক অকর্ম্মার ধাড়ি। আমার দ্বারা বাস্তবিক কোন কাজই হ'ত না,—এক তার মেয়েকে ভালবাসা ছাড়া;—কিন্তু যারা একমাত্র কাজ নিয়ে থাকে, তারা যেমন সেটা ভাল ক'রেই করে, আমারও এ বিষয়ে সেই কৃতিত্বটুকু ছিল। আমাকে সে মেয়েটি যেরকম মুগ্ধ করেছিল, সেরকম অপর কারো পক্ষে হওয়া অসম্ভব। তার পরে ত সে বুড়ো হয়ে কতকাল হ'ল মরে গেছে। দমনক, শুনছ ত?”

—“হাঁ” বলে দমনক একটু কাছে এগিয়ে এল।

—“তাই বল্‌ছিলুম, তার বাপ মোটে রাজি ছিল না। চারপাশের সব লোকে তার মত বদ্‌লাবার অনেক চেষ্টা করলে; কিন্তু সে এমন ভাব দেখাত, যেন তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না, বা বুঝতে পারছে না। বেশি দূর এগোতে কেউ সাহস করত না। কারণ, বীরবাহুর শরীরে যেমন রাগ তেমনি সামর্থ্য ছিল। তার বাহু ছিল কুস্তিগীর

পালোয়ানের মত, আর হাত দুটো ছিল শক্ত যেন হাতিয়ার। একদিন আমি সাহস করে তার সাম্‌নাসাম্‌নি কথাটা পেড়েছিলুম,—অতি নীচু গলায়,—কিন্তু সে আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে। ততক্ষণ নন্দিনীসুন্দরী রান্নাঘরের এক কোণ আশ্রয় ক'রে দুই মুঠো দিয়ে দুই চোখ ঢেকে ফোঁস-ফোঁস করছিল। আমি অক্ষমতায় ও লজ্জায় পাগলের মত হয়ে গিয়ে মনে মনে ভাবলুম—এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এ প্রাণ রেখে আর কি লাভ, যখন জীবনের শ্রী ও আনন্দ যার হাতে, সে বেটা সয়তানের মত পাপিষ্ঠ ও ষাঁড়ের মত বলিষ্ঠ! আর যত কিছু চেষ্টা-চরিত্র করি না কেন, তার ফল হবে শুধু লোকের কাছে নিজেকে আরও বেশি অপদস্থ করা। তার চেয়ে জীবনের সঙ্গে শোধবোধ করাই ঢের সোজা কাজ ব'লে মনে হ'ল। আমার বন্দুকে এক গুলি ভরলুম,—আর প্রেমিক মানুষের মনের মত একটি সুন্দর রাত্রি দেখে মাঠের উপর দিয়ে সোজা দৌড়তে লাগলুম। কাজ হাঁসিল করবার উদ্দেশ্যে বুড়ি-ক্ষেতের মোড়ের কাছে রাস্তার ধারে বসলুম। কিন্তু বন্দুকটা মুঠোর মধ্যে সবে ঠিক করে ধরেছি, এমন সময় প্রথমে শুনতে পেলুম, পরে দেখতে পেলুম যে, একটি গাড়ী সেদিকে আসছে। বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল—বীরবাহু কর্ত্তার গাড়ি!—আমারও ভাল কথা মনে পড়ে গেল যে, মাসের এই দিনেই সন্ধ্যেবেলা সে তাম্‌লি গিন্নীকে এক থলে টাকা দিতে যায়। ঘোড়াটা কদম কদম চল্‌ছিল। গাড়ীটা আমার নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল, আর আমি তাকে দেখলুম,—সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে; সেই লম্বা প্রকাণ্ড শরীর—যা আমার চক্ষুঃশূল—সেই পাখীর ঠোঁটের মত নাক, সেই মস্ত ছুঁচোলো দাড়ি, সেই কালো বর্ব্বর মূর্ত্তি, যেন

কাফ্রিদের রাজা। তখন যে পশু আমাকে এমন ভাবে কোণঠেসা করে' দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত করেছে, তাকে একেবারে হাতের কাছে বাগে পেয়ে আমার মাথায় এরকম খুন চ'ড়ে গেল যে, সে বলবার নয়। আমি এক লম্ফে উঠে পড়ে' বন্দুকটা ঠিক তার রগে তাক করলুম, ছুঁড়লুম। টুঁ শব্দটি না করে' সে যেন ঝাঁপিয়ে ঘোড়ার লেজের দিকে একটা বোঝার মত মুখ থুব্‌ড়ে পড়ল। ঘোড়াটা ভড়্‌কে গিয়ে চার পা তুলে ছুট দিলে, ও মোড়ের কাছে রাস্তা ছেড়ে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে লাভচাঁদদের জোতজমার মধ্যিখানে গিয়ে পড়ল। আমি পালালুম—লম্বা লম্বা পা ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালুম,—চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে, আমাতে আর আমি নেই। পাগলের মত বেগে ছুটতে ছুটতে অনেক দূর এসে পড়বার পর তবে আমার হুঁস হতে লাগল যে কি করেছি। তখন যেন খোঁচা খেয়ে আরও মরিয়া হয়ে মাঠ ও বনের ভিতর দিয়ে দৌড় দিলুম। এই যে আমি সেকালের সব কথাই প্রায় ভুলে গেছি, কিন্তু আজও মনে আছে,—যেন সেদিনকার কথা—কোন্ কোন ভয়ঙ্কর ঝোপ সেদিন রাত্রিতে ডিঙ্গিয়ে গেছি, কোন্ কোন্ মারাত্মক বাধা উল্টে ফেলে দিয়ে পথ করে' নিয়েছি। মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা'তে যৎকিঞ্চিৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিল শুধু এই বিশ্বাসে যে, বাড়ী গিয়ে আত্মহত্যা করব, এটা নিশ্চিত। কিন্তু অভিশপ্তের মত ছুটতে ছুটতে দেখি যে তাদের বাড়ীতে এসে পড়েছি—যে বাড়ী একজন এইমাত্র ছেড়ে গেছে, কিন্তু যেখানে আর একজন আছে। যখন এ বিষয়ে চেতনা হ'ল, তখন সে এত কাছে এসে পড়েছে যে তাকে আর একবার দেখবার চেষ্টা না করে থাকতে পারলুম না। একবার তাকে দেখব—

জানলার ভিতর দিয়ে—কেমন অপেক্ষা করে' বসে আছে, আগুনের লাল আভায় অন্ধকারে আধ-ফুটন্ত! দেওয়ালের বরাবর যত আস্তে পারি হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গেলুম; ফিরলুম।—আঃ! ঐ যে, জানলা খোলা আছে, তার ধারে সে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে বসে আছে। সে বসে আছে যেন স্বর্গের দেবীর মত শাদা, আর আমার মনে হল তার ভিতর থেকে কি একটা আলো ফুটে বেরচ্ছে। সত্যি, সে হাসছিল! সে দেখতে পেলে আমি ক'হাত দূরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখে একটু চেঁচিয়ে উঠে হাতে তালি দিলে—আলো যেন আরও জ্বলে উঠল, হাসি যেন আরও ফুটে উঠল! সে বল্লে—"ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। বাবা রাজি হয়েছেন। তিনি দেখলেন আমি কি-রকম কষ্ট পাচ্ছি, তাই আমার দুঃখ দূর করবার জন্যে হঠাৎ হাঁ বল্লেন। এইমাত্র বেরিয়ে যাবার আগে তিনি হুঁা বল্লেন ও হাসলেন।"

আমি গলা দিয়ে একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত বের করতে পারলুম না। কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল, চোখ কানা করে দিয়েছিল। জানিনে কেমন করে পিছু হট্‌লুম, কেমন করে দেওয়াল টপ্‌কে তার দৃষ্টি এড়ালুম, কেমন ক'রে পালালুম। কেবল মনে আছে সেই মুহূর্ত্ত, যে সময় নিজের বাড়ী পৌঁছলুম,—এক হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে, আর এক হাতে বন্দুক আঁকড়ে ধরে'—পৃথিবীতে এখন ঐ হ'ল আমার একমাত্র সম্পত্তি! রান্নাঘরে ঢুকে, কোন আলো না জ্বালিয়েই, চোখ না খুলেই, আমার সাধের টোটা খুঁজলুম, পেলুম, ও বন্দুকে পুরলুম। কিন্তু অদৃষ্টের এই ভীষণ সর্ব্বনেশে অত্যাচার আমাকে এতদূর পিষে ফেলেছিল—আহা এমনি মারই মারলে যে, আমাকে যে বাঁচিয়েছে সে খবরটা জানবারও অবসর

দিলে না,—যে আমার আত্মহত্যা করবার উৎসাহ পর্য্যন্ত নিতে গিয়েছিল। সেই জন্যই কি গুলিটা ফস্‌কে গেল?—সে যাই হোক, ঘটনা এই যে, শুধু গুলির তপ্ত শ্বাসের আঁচটুকু আমার মুখে লাগল, আর সে শুধু আমার একগোছা চুল উড়িয়ে নিয়ে গেল। টল্‌তে টল্‌তে মাটীতে পড়ে গেলুম,—ভাবলুম মারা গেছি।

পরদিন বেলা দুফুরে ভরা দিনের আলোয় ঘুম ভাঙ্গল। সব কথা মনে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। কান ভোঁ ভোঁ করছিল, কিন্তু বাইরে একটা মহা সোরগোল হচ্ছিল; লোকজন পাড়া-পড়শীতে হৈ হৈ থৈ থৈ করছে। ঠিক সেই সময় জীবন জঙ্গ দরজায় এক ধাক্কা মারলে। আমার চেয়ে তখন সে বছর কতকের বড় ছিল, পরে বুড়োরোগে মারা গেছে। আর এক ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে তার ফোক্‌লা মুখ গলিয়ে সে চেঁচিয়ে বল্লে—

—বীরবাহু কর্ত্তাকে কাল রাস্তায় খুন করেছে।

—অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলতে বলতে আমি পাঙাস মেরে ঘরের শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে গেলুম।

—সেই পাপ বেদের কাজ। তারা টাকার থলে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ধরা পড়ে গেছে। তারা সব কথা খুলে বলেছে। তারা গ্রাম থেকে বেরবার মুখে গাড়ির উপর চড়াও হয়েছিল,—তার বাড়ী থেকে দু'পা বুড়ো পিঠে দশ ঘা ছুরি খেয়েছে, সে একেবারে মরে' কাঠ হয়ে গিয়েছিল, একগঙ্গা রক্ত পড়েছিল। তারপর তারা তাকে গাড়ির গদির উপর ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে, ঘোড়াকে আস্তে আস্তে যেতে দিলে।

অনেকক্ষণ পরে, বুড়ী-ক্ষেতের মোড়ে, ঘোড়াটা কংসপতির বাড়ীতে গিয়ে পড়েছিল।”

আমি তা'হলে তাকে মেরে ফেলি নি। কারণ সে আগেই মরে গিয়েছিল! মরাকে কেউ খুন করে না।—এখন দেখ্‌ছ,—এ স্থলে অদৃষ্টের হাত ছিল বটে, কিন্তু সে রাত্রিতে তার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

অদৃষ্ট।

——:*:——

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ফরাসী ভাষা থেকে "অদৃষ্ট" নামধেয় যে গল্পটি অনুবাদ করেছেন, তার মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের মন্দ করতে চাইলেও দৈবের কৃপায় তার ফল ভাল হয়।

এ কিন্তু বিলেতী অদৃষ্ট।

এ দেশে মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের ভাল করতে চাইলেও দৈবের গুণে তার ফল হয় মন্দ। এদেশী অদৃষ্টের একটি নমুনা দিচ্ছি। এ গল্পটি সত্য—অর্থাৎ গল্প যে পরিমাণ সত্য হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ সত্য, তার চাইতে একটু বেশিও নয়, কমও নয়।

(১)

এ ঘটনা ঘটেছিল পালবাবুদের বাড়ীতে। এই কলিকাতা সহরে খেলারাম পালের গলিতে খেলারাম পালের ভদ্রাসন কে না জানে? অত লম্বা-চৌড়া আর অত মাথা উঁচু-করা বাড়ী, যিনি চোখে কম দেখেন, তাঁর চোখ ও এড়িয়ে যায় না। দূর থেকে দেখতে সেটিকে সংস্কৃত কলেজ বলে ভুল হয়। সেই সার সার দোতালা সমান উঁচু করিন্থিয়ান থাম, সেই গড়ন, সেই মাপ, সেই রং, সেই ঢং। তবে কাছে এলে আর সন্দেহ থাকে না যে, এটি সরস্বতীর মন্দির নয়, লক্ষ্মীর আলয়। এর সুমুখে দীঘি নেই, আছে মাঠ, তাও আবার বড়

নয়, ছোট ; গোল নয়, চৌকোণ। এ ধাঁচের বাড়ী অবশ্য কলিকাতা সহরে বড় রাস্তায় ও গলিঘুঁচিতে আরো দশ বিশটা মেলে, তবে খেলারামের বসতবাটীর সুমুখে যা আছে, তা কলিকাতা সহরের অপর কোনো বনে'দী ঘরের ফটকের সামনে নেই। দুটি প্রকাণ্ড সিংহ—তার সিংহদরজার দু'ধার আগলে বসে আছে। তার একটিকে যে আর সিংহ বলে চেনা যায় না, আর পথচলতী লোকে বলে, বিলেতী-শেয়াল, তার কারণ, বয়েসের গুণে তাঁর ইঁটের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, আর তার চূণবালির জটা খসে পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ার হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল সন্ধ্যে, পয়সায় পাঁচটি করে খিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ বলে চেনা যায়।

(২)

এই সিংহ দুটির দুর্দ্দশা থেকেই অনুমান করা যায় যে, পাল বাবুদেরও ভগ্ন দশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অনুমান করা যায়, বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাল বাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানীর আমলে কলিকাতায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ খেলারামের মধ্যম পুত্র, কলিকাতার সব ব্রাহ্মণ কায়স্থ বড় মানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে সে ঘর বিলেতী-দস্তুর সাজিয়ে ছিলেন। পাশে পাশে টাঙানো আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়ে ও দেওয়ালগিরিতে সে ঘর চিকমিক করত, চকমক করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ত, তখন সব বালখিল্য ইন্দ্রধনু তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমে ঘরময় খেলা করে বেড়াত। সে এক বাহার! তারপর সাটিনে ও মখমলে

মোড়া কত যে কোচ-কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল, তার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মত জিনিষ ছিল সেই নাচঘরের সুমুখের বারান্দা। ইতালি থেকে আমদানী-করা তুষার-ধবল, নবনীতসুকুমার মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত, প্রমাণ সাইজের স্ত্রীমূর্ত্তি-সকল সেই বারান্দার দু'ধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত--তার প্রতিটি এক একটি বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাদের মধ্যে কেউ বা স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ বা সন্থ নেয়ে উঠেছে, কেউ বা সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ বা দুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে বাঁধছে, কেউ বা বাঁ হাতখানি ধনুকাকৃতি করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, দেখতে মনে হত, স্বর্গের বেবাক অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হয়ে মেজবাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য লোকদের কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পণ্ডিতদেরও হত। তার প্রমাণ—পাল-প্রাসাদের সভাপণ্ডিত স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় এক দিন বলেছিলেন,—"মেজবাবুর দৌলতে মর্ত্ত্যে থেকেই স্বর্গ চোখে দেখলুম। এই পাষাণীরা যদি কারো স্পর্শে সব বেঁচে ওঠে, তাহলে এ পুরা সত্যসত্যই অমরাপুরী হয়ে ওঠে" —একথা শুনে মেজবাবুর জনৈক পেয়ারা মো-সাহেব বলে ওঠেন, "তাহলে বাবুকে এক দিনেই ফতুর হতে হত—শাড়ীর দাম দিতে"। এ উত্তরে চারদিক থেকে হাসির তুফান উঠল। এমন কি, মনে হল যে, ঐ সব পাষাণমূর্ত্তিদেরও মুখে চোখে যেন ঈষৎ সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাহুল্য যে, এই কলিকাতা সহরেও উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচীদের নাচে গানে প্রতি সন্ধ্যে এ নাচঘর সরগরম হয়ে উঠত। আর আজকের দিনে তার কি অবস্থা?—বলছি।

(৩)

এই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙ্গা চৌকি। মেজেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাত্তর বৎসর বয়েসের একদম রঙ-জ্বলা এবং নানাস্থানে ইঁদুরে-কাটা কারপেট। এ ঘরে এখন ম্যানেজার সাহেব দিনে আফিস করেন, আর রাত্তিরে সেখানে নর্ত্তন হয় ইঁদুরের—কীর্ত্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ জানতে হলে পাল-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়ান্তরে শোনাব। কেননা, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষা-প্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাই নে এই জন্য যে, আমি জানি যে, উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের খিঁচুড়ি পাকালে, ও দুয়ের রসই সমান কষ হয়ে উঠে।

ফল কথা এই যে, পাল বাবুদের সম্পত্তি এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু সরিকী-বিবাদে তা উচ্ছন্ন যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ভাঙ্গা ঘর আবার গড়ে তোলবার ভার আপাতত একজন কমন-ম্যানেজারের হাতে পড়ছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোক সমাজে তিনি চাটুয্যে-সাহেব বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকিল, ব্যারিষ্টার নন, তা'হলেও তিনি ইংরেজী পোষাক পরেন—তাও আবার সাহেবের দোকানে তৈরী। চাটুয্যে-সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগাগোড়া পরীক্ষা একটানা ফার্ষ্ট ডিভিসনেই পাশ ক'রে এসেছেন, কিন্তু

আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাশ করতে পারলেন না। এর কারণ, তাঁর Literature-এ taste ছিল, অন্তত এই কথা ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষীরাজকে ছক্কড়ে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে' স্বামীর কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি, নিজের কপালের দোষ দিয়েই বসে' ছিলেন। যখন সাত বৎসর বিনে-রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে' মাসিক তিনশ' টাকা বেতনে পাল বাবুদের জমিদারী সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হলেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটখাটো উদাহরণ। বাঙালী উকীল না হয়ে সাহেব কৌঁচুলি হলে তিনি যে Bar-এ ফেল করে bench-এ যে প্রমোশন পেতেন, সে কথা ত আপনারা সবাই জানেন। যার এক পয়সার প্র্যাকটিস নেই, সে যে একদম তিনশ' টাকা মাইনের কাজ পায়, এ দেশের পক্ষে এই ত একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরল কি করে জানেন?—ছেরেপ মুরব্বির জোরে। তিনি ছিলেন একাধারে বনে'দী ঘরের ছেলে আর বড় মানুষের জামাই—অর্থাৎ তাঁর যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি সহায় ছিল।

(৪)

বলা বাহুল্য, জমিদারী সম্বন্ধে চাটুয্যে-সাহেবের জ্ঞান আইনের চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীতে B. L. পাশ করেন,

সুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অন্তত পুঁথিগত বিদ্যে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু কি হাতে-কলমে কি কাগজে-কলমে তিনি জমিদারী বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান কখনো অর্জ্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর আত্মীয় ও পরম হিতৈষী জনৈক বড় জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমূল্য। কেন না, তিনি ছিলেন একজন যেমনি হুঁসিয়ার, তেমনি জবরদস্ত জমিদার। তারপর জমিদার মহাশয় ছিলেন অতি স্বল্পভাষী লোক। তাই তাঁর আদ্যোপান্ত উপদেশ এখানে উদ্ধৃত করে দিতে পারছি। জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত—আমার বিশ্বাস, অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বললেন,—"দেখ বাবাজী, যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল শালিয়ানা দু'লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমি যে জমিদারীর উন্নতি করতে জানি এ কথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করে ;—আর দেশে আমার শত্রুরও অভাব নেই। জমিদারী করার অর্থ কি জানো ?—জমিদারীর কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে এক রকম ঘোড়ায় চড়া। লোকে যদি বোঝে যে পিঠে সোয়ার চড়েছে, তা হলে তাকে আর ফেলবার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারীর পিঠ আর আমলা-ফয়লা তার মুখ। তাই বলছি প্রজাকে সায়েস্তা রাখতে হবে খালি পায়ের চাপে ; কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, তা হলেই সে পুস্তক ঝাড়বে আর অমনি তুমি ডিগ্‌বাজি খাবে। অপর পক্ষে আমলাদের বাগে রেখে রাশ-কড়া করে ধরো, কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, তা হলেই তারা শির-পা করবে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগবাজি খাবে। এক কথায়

তোমাকে একটু রাশ-ভারি হতে হবে আর একটু কড়া হতে হবে। বাবাজি এ ত ওকালতি নয় যে, হাকিমের সুমুখে যত নুইয়ে পড়বে নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মন যোগানো কথা কইবে, তত তোমার পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারী করার কায়দা ঠিক উল্টো উল্টো।"

এ কথা শুনে চাটুয্যে-সাহেব আশ্বস্ত হলেন, মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তিনি ওকালতিতে ফেল করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারীতে পাশ করবেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর একটু ধোঁকাও রয়ে গেল। তিনি জানতেন যে, তাঁর পক্ষে রাশ-ভারি হওয়া অসম্ভব। তাঁর চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি হলেন একে মাথায় ছোট, তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্শা, তার পর তাঁর মুখটি ছিল স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডলের ন্যায় কেশহীন, অবশ্য হাল-ফেসান অনুযায়ী— দু'সন্ধ্যা স্বহস্তে ক্ষৌর-কার্য্যের প্রসাদে। ফলে, হঠাৎ দেখতে তাঁকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে ভুল হত। রাশ-ভারি হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি গম্ভীর হবেন। মধুর অভাবে গুড়ে যেমন দেবার্চ্চনার কাজ চলে যায়, তিনি ভাবলেন রাশ-ভারি হতে না পেরে গম্ভীর হতে পারলেই জমিদারী-শাসনের কাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তারপর এও তিনি জানতেন যে, মানুষের উপর কড়া হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। এমন কি, মেয়ে মানুষের উপরও তিনি কড়া হতে পারতেন না। তাই তিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন, এই বিশ্বাসে যে, নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াকড় হবে। তিনি আফিসে ঢুকেই হুকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারটায়

আপিসে উপস্থিত হতে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা যাবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আমলা-তান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চাটুয্যে-সাহেব তাতে এক চুলও টললেন না, আন্দোলন থেমে গেল।

(৫)

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল, বেলা বারোটা-সাড়েবারোটার সময় পান চিবুতে চিবুতে আপিসে আসা, তারপর এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আর নাবালক—সেথানে কর্ম্মচারীরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তারা যখন দেখলে যে ঘড়ির কাঁটার উপর হাজির হলেই হুজুর খুসি থাকেন, তখন তারা একটু কষ্টকর হলেও বেলা এগারটাতে হাজিরা সই করতে সুরু করে দিলে। অভ্যেস বদলাতে আর ক'দিন লাগে?

মুস্কিল হল কিন্তু প্রাণবন্ধু দাসের। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছারির সবচেয়ে পুরোণো আমলা। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়েসের মধ্যে বিশ বৎসরকাল সে এই ষ্টেটে একই পোষ্টে একই মাইনেতে—বরাবর কাজ করে' এসেছে। এতদিন যে তার চাকরী বজায় ছিল, তার কারণ—সে ছিল অতি সৎলোক, চুরি-চামারির দিক দিয়েও সে ঘেঁসত না। আর তার মাইনে যে কখনো বাড়েনি, তার কারণ, সে ছিল কাজে অতি ঢিলে।

প্রাণবন্ধু কাজ ভালবাসত না, পৃথিবীতে ভালবাসত শুধু দুটি জিনিস, এক তার স্ত্রী, আর এক তামাক। এই ঐকান্তিক ভালবাসার

প্রসাদে তার শরীরে দুটি অসাধারণ গুণ জন্মেছিল। বহুদিনের সাধনার ফলে তার হাতের লেখা হয়েছিল যে রকম চমৎকার, তার মাখা তামাকও হ'ত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তার নিত্য নিয়মিত কাজ ছিল—সর্ব্ব প্রথমে তার স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখা। গোড়ায় "প্রিয়ে, প্রিয়তরে প্রিয়তমে" এই সম্বোধন এবং শেষে "তোমারই প্রাণবন্ধু দাস" এই দ্ব্যর্থ-সূচক স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধীরে সুস্থিরে ধরে ধরে পুরো চারপৃষ্ঠা চিঠি লিখতে লিখতে তার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মত হয়ে উঠেছিল। এইজন্য আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে দেওয়া হত। এই অক্ষরের প্রসাদেই তার চাকরীর পরমায়ু অক্ষয় হয়েছিল।

তার পর প্রাণবন্ধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খেতেন—অবশ্য নিজ হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা-তামাক খাওয়া তাঁর পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল—পরের হাতের লেখা-চিঠি তাঁর স্ত্রীকে পাঠান তাঁর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল। তিনি কল্কেয় প্রথমে বেশ করে ঠিকরে দিয়ে তার উপর তামাক এলো করে' সেজে, তার উপর আলুগোছে মাটীর তাওয়া বসিয়ে, তার উপর আড় করে স্তরে স্তরে টিকে সাজিয়ে, তার পর সে টিকার মুখাগ্নি করে, হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে ধীরে ধীরে তামাক ধরাতেন। আধ ঘণ্টা তদ্বিরের কম যে আর ধোঁয়া গোল হয়ে, নিটোল হয়ে, মোলায়েম হয়ে' নলের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোয় না, এ কথা যারা কখনো হুঁকো টেনেছে, তাদের মধ্যে কে না জানে?

এই চিঠি লেখা আর তামাক সাজার ফুরসতে প্রাণবন্ধু আপিসের

কাজ করতেন এবং সে কাজও তিনি করতেন অন্যমনস্কভাবে। বলা বাহুল্য যে, সে ফুরসৎ তাঁর কত কম ছিল। এর চিঠি ওর খামে পুরে দেওয়া তাঁর একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও সমগ্র সেরেস্তা যে তাঁকে ছাড়তে চাইত না, সত্য কথা বলতে গেলে তার আসল কারণ এই যে, প্রাণবন্ধু সেরেস্তায় হুঁকোবরদারীর কাজ করত—আর সবাই জানত যে, অমন হুকোবরদার মুচিখোলার নবাব-বাড়ীতেও পাওয়া দুষ্কর। তার করস্পর্শে দা-কাটাও ভেলসা হয়ে, খরসান ও অম্বুরি হয়ে উঠত।

প্রাণবন্ধুর উপরে সকলে সন্তুষ্ট থাকলেও তিনি সকলের উপর সমান অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর মাইনে যে বাড়ে না, সে তিনি চোর নন বলে। অথচ তাঁর বেতন বৃদ্ধির বিশেষ দরকার ছিল। কেন না, তাঁর স্ত্রী ক্রমান্বয়ে নূতন ছেলের মুখ দেখতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে বেতন বৃদ্ধির যে কোনই যোগাযোগ নেই, এই মোটা কথাটা প্রাণবন্ধুর মনে আর কিছুতেই বসল না। ফলে তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেল যে, আপিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা গুণের আদর মোটেই করেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে, কি কথায়, কি কাজে, কর্ত্তৃপক্ষদের মন জুগিয়ে চলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেষটা দাঁড়াল এই, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করত, যা খুসি তাই বলত,—কারো কোনো পরোয়া রাখত না। কর্ত্তৃপক্ষেরাও তার কথায় কান দিতেন না; কেন না, তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাণবন্ধু হচ্ছে ষ্টেটের একজন পেনসানভোগী।

(৫)

এই নূতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে' প্রাণবন্ধু পড়ল মুস্কিলে। সে ভদ্রলোক বেলা এগারটায় আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। ফলে তাঁকে নিয়ে হুজুর পড়লেন আরও বেশি মুস্কিলে। নিত্য তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা—আর না কাটলেও তাঁর নিয়ম যায় মারা। এই উভয় সঙ্কটে তিনি তাকে কর্ম্ম হতে' অবসর দেওয়াই স্থির করলেন। এই মনস্থ করে তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইলেন, তার পর তার জবাবদিহি শুনে চাটুয্যে-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তাঁর স্থমুখে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বললে—হুজুর। সাড়ে আট্টার আগে ঘুমই ভাঙে না। তার পর চা আর তামাক খেতেই ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তার পর নাওয়া-খাওয়া করে, এক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কি আর এগারটার মধ্যে আপিসে পৌঁছান যায়" ?

এ জবাব শুনে হুজুর যে অবাক হয়ে রইলেন, তার কারণ তাঁর নিজেরও অভ্যেস ছিল ঐ সাড়ে আট্টায় ঘুম থেকে ওঠা। তার পর চা-চুরুট খেতে তাঁরও সাড়ে নয়টা বেজে যেত। সুতরাং পায়ে হেঁটে আপিসে আসতে হলে তিনি যে সেখানে এগারটার ভিতর পৌঁছুতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরি করে' আপিসে আসাটা চাটুয্যে-সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানেজারের উপর প্রাণবন্ধুর এই হলো প্রথম জিৎ।

দুদিন না যেতেই, চাটুয্যে-সাহেব আবিষ্কার করলেন যে, প্রাণ-

বন্ধুকে ডেকে কখনও তন্মুহূর্ত্তে পাওয়া যায় না। যখনই ডাকেন তখনই শোনেন যে প্রাণবন্ধু তামাক সাজছে। শেষটা বিরক্ত হয়ে এক দিন তাকে ধমক দেবামাত্র প্রাণবন্ধু কাতর স্বরে বললে—"হুজুর, আমি গরীব মানুষ, তাই আমাকে তামাক খেতে হয়, আর তা নিজেই সেজে খেতে হয়। পয়সা থাকলে সিগারেট খেতুম, তা হলে আমাকে কাজ থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উঠতে হত না। বাঁ হাতে অষ্ট প্রহর সিগারেট ধরে ডান হাতে কলম চালাতুম"।

এবারও হুজুরকে চুপ করে' থাকতে হ'ল ; কেন না, হুজুর নিজে অষ্টপ্রহর সিগারেট ফুঁকতেন, তার আর এক দণ্ডও কামাই ছিল না। তিনি মনে ভাবলেন, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করুক গে, তাকে আর তিনি ঘাঁটাবেন না।

কিন্তু প্রাণবন্ধুকে আবার তিনি ঘাঁটাতে বাধ্য হলেন। একখানি জরুরি দলিল যা এক দিনেই লিখে শেষ করা উচিত ছিল, সেখানা প্রাণবন্ধু যখন দুদিনেও শেষ করতে পারলে না, তখন তিনি দেওয়ানজীর প্রতি এই দোষারোপ করলেন যে তিনি আমলাদের দিয়ে কাজ তুলে নিতে পারেন না। দেওয়ানজী উত্তর করলেন যে, তিনি সকলের কাছে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এক প্রাণবন্ধুর কাছ থেকে যেহেতু প্রাণবন্ধু আপিসে এসে আপিসের কাজ না ক'রে নিত্য ঘণ্টাখানেক ধরে আর কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে।

প্রাণবন্ধুর তলব হল এবং কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল। হুজুরের উপর দু-দু-বার জিত হওয়ায় তার সাহস বেজায় বেড়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজার সাহেবের মুখের উপর এই জবাব করলে,—"হুজুর

আমার লেখার একটু হাত আছে, তাই লিখে লিখে হাত পাকাবার চেষ্টা করি"।

—"তোমার হাতের লেখা যথেষ্ট পাকা, তা আর বেশি পাকাবার দরকার নেই। আর যদি আরো পাকাতে হয় ত আপিসের লেখা লিখলেই হয়—বাজে লেখা কেন"?

—"হুজুর, হাতের লেখার কথা বলছি নে। আমার প্রাণে একটু কাব্যরস আছে, তাই প্রকাশ করবার জন্য লিখি। আর সে লেখা বাজে নয়। গরীব মানুষের না হলে সে লেখা সব পুস্তক আকারে প্রকাশিত হত। আমাকে তাই ঘরের লোকের পড়ার জন্যই লিখতে হয়। যদি আমার পয়সা থাকত, তা হলে ত ছাইপাঁশ লিখেও দেশের মাসিকপত্র ভরিয়ে দিতে পারতুম"।

এর উত্তরে চাটুয্যে-সাহেবের আঁতে ঘা লাগল। তিনি যে আপিসে বসে মাসিক পত্রিকার জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেকরকম বেনামী প্রবন্ধ লিখতেন আর সে লেখাকে সমালোচকেরা যে ছাইপাঁশ বলত, এ কথা আর যার কাছেই থাক, তাঁর কাছে ত আর অবিদিত ছিল না। তিনি আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলেন না, চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে উঠলেন—"দেখো, তোমার হওয়া উচিত ছিল—" তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রাণবন্ধু বলে ফেলল—"বড় মানুষের জামাই! কিন্তু অদৃষ্ট ত আর সবারই সমান নয়"।

রোষে ক্ষোভে হুজুরের বাকরোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে তর্জ্জনী দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, প্রাণবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল, আর এক ছিলিম ভাল করে তামাক সাজতে। প্রাণবন্ধুর কিন্তু হুজুরকে অপমান করবার কোনই অভিপ্রায় ছিল না। সে শুধু

নিজে সাফাই হবার জন্য ও-সব কথা বলেছিল। হিসেব করে কথা কওয়ার অভ্যাস তার কস্মিন্‌কালেও ছিল না, আর পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

(৭)

চাটুয্যে-সাহেব দেওয়ানজীকে ডেকে বললেন—"প্রাণবন্ধুকে দিয়ে আর কাজ চলবে না, তার জায়গায় নূতন লোক বহাল করা হোক। নূতন লোক খুঁজে বার করবার জন্যে দেওয়ানজী সাত দিনের সময় নিলেন। এর ভিতর তাঁর একটু গূঢ় মতলব ছিল। তিনি জানতেন প্রাণবন্ধুর দ্বারা কস্মিন্‌কালেও কাজ চলে নি, অতএব যে চাকরী তার এতদিন বজায় ছিল আজ তা যাবার এমন কোনো নূতন কারণ ঘটে নি। তা ছাড়া তিনি জানতেন যে, হুজুরের রাগ হপ্তা না পেরুতেই চলে যাবে আর প্রাণবন্ধু সেরেস্তার যে কাজ চিরকাল করে এসেছে ভবিষ্যতেও তাই করবে—অর্থাৎ তামাক সাজা। ফলে প্রায় হয়েছিলও তাই। যেমন দিন যেতে লাগল, তাঁর রাগও পড়ে আসতে লাগল, তারপর সপ্তম দিনের সকাল বেলা চাটুয্যে-সাহেব রাগের কণাটুকুও মনের কোনো কোণে খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে এবারকার জন্য প্রাণবন্ধুকে মাপ করবেন। তারপর তিনি যখন ধড়া-চূড়ো পরে আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, "দেখ ত, এ চিঠির অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।" সে চিঠি এই—

"প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে,

আজ তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারব না, কেননা আর একখানি

মস্ত চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই ত আমাদের ছোকরা হুজুর আমাকে নেক নজরে দেখেন না, কেন না আমি চোর নই অতএব খোসামুদেও নই। বরাবর দেখে আসছি যে পৃথিবীতে গুণের আদর কেউ করে না, সবাই খোসামোদের বশ। কিন্তু আমাদের এই নূতন ম্যানেজারের তুল্য খোসামোদ-প্রিয় লোক আমি ত আর কখনো দেখি নি। একমাত্র খোসামোদের জোরে যত বেটা চোর তার প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন তাদের মুখে হুজুরের সুখ্যাতি আর ধরে না। অমন রূপ অমন বুদ্ধি অমন বিদ্যে অমন মেজাজ একাধারে আর কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। এ সব শুনে তিনিও মহা খুসি। প্রিয়পাত্রেরা কাগজ সুমুখে ধরলেই অমনি তাতে চোখ বুজে সই মেরে বসেন। এঁর হাতে ষ্টেট্‌টা আর কিছু দিন থাকলে নির্ঘাত গোল্লায় যাবে। জমিদারীর ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন, গম্ভীর হয়ে কাঠের চৌকিতে কাঠের পুতুলের মত খাড়া হয়ে এগারটা-পাঁচটা ঠায় বসে থাকা। ইনি ভাবেন ওতে তাঁকে রাশভারি দেখায়, কিন্তু আসলে কি রকম দেখায় জান?—ঠিক একটি সাক্ষী-গোপালের মত। ইনি আপিসে ঢুকেই একটি কড়া হুকুম প্রচার করেছেন যে, কর্ম্মচারীদের সব এগারটায় হাজির হতে হবে আর পাঁচটায় ছুটি। আমি অবশ্য এ হুকুম মানি নে। কেন না, যারা কাজের হিসেব জানে না তারাই ঘণ্টার হিসেব করে—সেই পুরুতদের মত যারা মন্ত্র পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদেরা বলে, 'হুজুরের কাজের কায়দা একদম সাহেবি'। ইনি এতেই খুসি, কেন না এঁর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে লেপাফা-দুরস্ত হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত তা'হলে পোষাক পরলেও সাহেব

হওয়া যেত। এঁর বিশ্বাস ইনি সাহেব, কিন্তু আসলে কি জান?—মেম-সাহেব। অন্তত দূর থেকে দেখলে ত তাই মনে হয়। কেন জানো?—এঁর পুরুষের চেহারাই নয়। এঁর রংটা ফ্যাকাসে—সাবান মেখে, আর মুখে দাড়ি গোফের লেশমাত্র নেই কিন্তু আছে একমাথা চুল, তাও আবার ক'টা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে এই মেম-সাহেবের মেম-সাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ দুদিন থেকে কানাঘুষোয় শুনছি যে হুজুর নাকি আমাকে বরখাস্ত করবেন। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, আমার মত গুণী-লোকের চাকরীর ভাবনা নেই। তবে কিনা অনেক দিন আছি বলে জায়গাটার উপর মায়া পড়ে গেছে। মুনিবকে কিছু বলা বৃথা, কেন না তিনি মুখ থাকতেও বোবা, চোখ থাকতে কাণা। তাই তাঁকে কিছু না বলে যিনি এই মুনিবের মুনিব তাঁর অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছে একখানি দরখাস্ত করেছি। শুনতে পাই আমাদের সাহেব মেম-সাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। এ কথায় বিশ্বাস হয়, এঁর স্ত্রী শুনেছি ভারি সুন্দরী, প্রায় তোমার মত। তারপর এই অপদার্থটা তার স্ত্রীর ভাগ্যেই খায়, শুধু ভাত খায় না, মদও খায়, চুরুটও খায়। ইনি বিদ্যের মধ্যে শিখেছেন ঐ দুটি। সে যাই হোক এর গৃহিনীকে যে চিঠিখানি লিখেছি সে একটা পড়বার মত জিনিষ। আমার দুঃখ রইল এই যে সেখানি তোমার কাছে পাঠাতে পারলুম না। তার ভিতর সমান অংশে বীররস আর করুণরস পূরে দিয়েছি আর তার ভাষা একদম সীতার বনবাসের। শুনতে পাই কর্ত্তৃঠাকুরাণী খুব ভাল লেখা পড়া জানেন। আমার এই চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারবেন যে তাঁর স্বামী ও তোমার স্বামী এ দুজনের মধ্যে

কে বেশি গুণী। আশা করছি কাল তোমাকে দশ টাকা মাইনে বাড়ার সুখবর দিতে পারব।

তোমারই প্রাণবন্ধু দাস।"

চাটুয্যে-সাহেব চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ঈষৎ কাষ্টহাসি হেসে স্ত্রীকে বললেন—"এ চিঠি তোমার নয়, ভুল খামে পোড়া হয়েছে।'

বলাবাহুল্য পত্রপাঠ, প্রাণবন্ধুর বরখাস্তের হুকুম বেরল। চাটুয্যে-সাহেব সব বরদাস্ত করতে পারেন এবং স্ত্রীর কাছে অপদস্ত হওয়া ছাড়া। কেন না তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি পত্নী-গতপ্রাণ।

এই চিঠিই হল প্রাণবন্ধু দাসের স্ত্রীর যথার্থ অদৃষ্ট-লিপি, আর সে লিপি সংশোধনের কোনোরূপ উপায় ছিল না, কেন না তা ছাপার অক্ষরে লেখা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবযুগের কথা।*

——:*:——

মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যখন বেশি দিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার যো নেই, যে পথে হোক তাকে যখন চলতেই হয়, তখন যে-সভ্যতা কিছুদিন টিঁকে থাকে, তারই যুগের পর যুগ আসে। অর্থাৎ— এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের খানিকটাকে দু'একটা সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট লক্ষণ অনুসারে পূর্ব্বাপর থেকে সেটিকে তফাৎ করে তার একটা যুগ নাম দিয়ে পণ্ডিতেরা তাঁদের কারবার চালান। এবং এ হিসাবে পরবর্ত্তী যুগ মাত্রেই পূর্ব্বের যুগের তুলনায় নূতন যুগ। কিন্তু 'নবযুগ' কোন নূতন যুগ নয়, সে হ'ল নবীন যুগ। গাছের জীবনের বার্ষিক ইতিহাসে শীতে যখন পাতা ঝরে' ন্যাড়া ডাল ক'খানি টিঁকে থাকে সেও একটা নূতন যুগ; কিন্তু যখন বসন্তের স্পর্শে তার সারা দেহ রঙিন কিশলয়ে সাড়া দেয় সেইটি হ'ল তার নবযুগ।

কোনও সভ্যতারই এমন সৌভাগ্য ঘটে না যে আগাগোড়া তার জীবনটা হয়, একটা একটানা উন্নতির ইতিহাস। কখনও দৌড়িয়ে, কখনও খুঁড়িয়ে এমনি করেই মানুষের সভ্যতা চলে। কখনও তার জীবনে আসে প্রাণের জোয়ার, যা তাকে অপূর্ব্ব লীলা ও অভিনব সৃষ্টির পথে নিয়ে যায়। কখনও বা তার প্রাণের স্পন্দন মৃদু হয়ে

চন্দননগর প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

আসে, অবসাদ এসে সমস্ত শক্তিকে চেপে ধরে ; সে তখন প্রাণপণে প্রাচীন সৃষ্টিকেই আঁক্‌ড়ে ধরে থাকতে চায়, ভয়, পাছে নূতন পথে পা দিলেই যা-কিছু পুঁজি তাও বুঝি হারায়। সভ্যতার এই যে সম্প্রসারণের যুগ, মুক্ত-প্রাণের বিচিত্র লীলার যুগ, এর প্রারম্ভই হ'ল 'নবযুগ' ; যে-যুগ নবীন সৃষ্টির বেদনার পুলকে আকুল, যার অরুণালোক রাত্রিশেষে সভ্যতার নব সূর্য্যোদয় ঘোষণা করছে। যে প্রবন্ধ-পুস্তকখানি আমরা আলোচনা করছি, তার কথা এই যে বাঙালী জাতির সভ্যতায় আজ এই রকম একটি নবযুগ এসেছে।

নবযুগ যে এসেছে, ১০২ পৃষ্ঠার এই ছোট পুঁথিখানি তার একটা প্রমাণ। বইখানিতে লেখকের নাম নেই। প্রকাশক মহাশয় "প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে 'প্রবর্ত্তকে' বাহির হইয়াছিল"—এ ছাড়া বিজ্ঞাপনে আর কিছুই বলা আবশ্যক মনে করেন নি। সুতরাং লেখকের সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল দমন করে আমরা লেখার সঙ্গেই পরিচয় করব।

বইখানিতে 'মুখপত্র' ধরে মোট ন'টি প্রবন্ধ আছে। সবগুলি একই সুরে বাঁধা, এবং তাদের অন্তরের কথা মোটামুটি একই। লেখকের মর্ম্মবাণীটি এই প্রবন্ধগুলির নানা বি[illegible] মধ্য দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করেছে। প্রবন্ধগুলি[illegible] এই অন্তরের বাণীই হচ্ছে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পুঁথিখানিতে লেখক যা বলেছেন তার দু'টো ভাগ আছে। একটা হচ্ছে বিচার ও যুক্তির দিক—অর্থাৎ তত্ত্বাংশ, আর একটা হচ্ছে অনুভূতি ও তার প্রকাশের দিক—অর্থাৎ সাহিত্যাংশ। প্রথমটা তর্কের বিষয়, সুতরাং তা নিয়ে তর্ক উঠবেই। দ্বিতীয়টি নিয়ে কোনও তর্ক উঠবে না। সেটি নবীন বাঙলার একেবারে অন্তরে গিয়ে

পৌঁছিবে। কেননা বিংশ শতাব্দীর বাঙলার মর্ম্মকথাটি এ প্রবন্ধ-গুলিতে সাহিত্যের সুষমাময় মুর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বিচারের কথাই আগে বিচার করা যাক। বিচারের বিষয় হ'ল আমাদের অর্থাৎ—হিন্দু-সভ্যতার বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ। এ প্রশ্ন এবং তার সমাধান প্রায় সব ক'টি প্রবন্ধেই আকারে ইঙ্গিতে ফুঠে উঠেছে। কিন্তু 'মানুষের কথা' প্রবন্ধটিতে লেখক সোজাসুজি একটি প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন। "আমরা ত চির-কাল এরূপ ছিলাম না। এমন দিন ছিল যখন আমরাও ধরাপৃষ্ঠে গৌরবোন্নত শিরে বিচরণ করিতাম। তখন এই বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের চক্ষে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়া অপরের করুণা ও অবজ্ঞা উদ্রেক করিত না। তখন চিত্ত ছিল কুণ্ঠাহীন, হৃদয় ছিল উদার, জীবন ছিল খেলিবার সামগ্রী। সে সব আর নাই। কেন? অধঃপতনের কারণ কি? আমরা কোন্ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি যে আজ আমাদের এ অবস্থা?"—এবং মীমাংসায় লেখক বলেছেন, "ইহার একই উত্তর, সে উত্তর হইতেছে এই যে, আমরা মানুষ নামক জীবটিকে অস্বীকার করিয়াছি—তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। আমরা মনুষ্য-ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছি।" উত্তরের ব্যাখ্যায় লেখক বুঝিয়ে-ছেন যে মানুষ তার দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, বিজ্ঞান; তার বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়; তার কর্ম্ম, ভোগ, ত্যাগ এই সব নিয়েই তবে মানুষ। যদি এর মধ্যে কতকগুলিকে অস্বীকার করে, অমঙ্গল ভেবে পিষে ফেলবার চেষ্টা করা যায় তা হ'লে মনুষ্যত্বকেই পঙ্গু করা হয়। ফলে জাতির মন থেকে জীবনের যে সহজ আনন্দ, সে আনন্দ থেকে মানুষের সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও বৃহত্তের সৃষ্টি, সেটি চলে যায়।

তখন জীবনটাই হয়ে ওঠে দুর্ব্বহ ভার। তাতে আর কোনও প্রাচুর্য্য, কোনও লীলার জায়গা থাকে না। তখন কর্ম্ম হয় জীবনযাত্রা, ধর্ম্ম হয় প্রাণহীন আচারের লোহার শিকল, ভোগ হয় প্রাণপণে প্রাণকে আঁকড়ে থাকা, ত্যাগ হয় অপৌরষের অক্ষমতা। লেখক বলেন, "হিন্দুজাতিটা কয়েক শতাব্দী ধরে' এই অস্বীকারের, এই পিষে-ফেলার কাজটা করে আসছে। আর তার অধঃপতনও হয়েছে তখন থেকেই, আর সেই কারণেই। জাতির শিক্ষকেরা সমস্ত জাতিটাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবন দুঃখময়, জগৎ মায়া, ভোগ অমঙ্গল। আর এই দুঃখ থেকে, মায়া থেকে, অমঙ্গল থেকে মুক্তির এক উপায় কর্ম্ম-ত্যাগ, ভোগে বিরক্তি, জগৎকে অস্বীকার। জীবন ও জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিই হ'ল পুরুষার্থ। কিন্তু সে পথে পা' বাড়াতে হলেই চাই "ইহামুত্রফলভোগ বিরাগং," কি একালে কি পরকালে ফল ভোগে বিতৃষ্ণা। এই শিক্ষা যখন জাতির হাড়ে হাড়ে বসে গেল তখন তার জীবন হয়ে উঠল বিস্বাদ, প্রাণ হ'ল আনন্দহীন, কর্ম্ম হয়ে উঠল বেগার। দেহের রক্তপ্রবাহ মৃদু হয়ে গেল, তার হাত পা শিথিল হয়ে এল। তাতে জাতিটা যে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠল তা নয়, কেন না "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সে হয়ে উঠল আমরা বর্ত্তমানে যা, অর্থাৎ—'জড়ভরত'। তার কর্ম্মও থাকল, ভোগও গেল না ; কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা হয়ে উঠল একটা 'কর্ম্মভোগ'। এই পেষণের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন, "জীবনে উচ্ছ্বাস শক্তির অনুভব করিতেছি—মনে হইতেছে যে শক্তির বলে অশান্ত সিন্ধুকে তাড়িত মথিত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করিতে পারি। কিন্তু খবরদার—সে শক্তিকে সার্থক হইতে দিও না। মনে অনন্ত কল্পনার খেলা

খেলিতেছি, প্রাণে বিরাট ভোগসামর্থ্যের আভাস পাইতেছি, বুদ্ধিতে আশ্চর্য্যরূপ নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছি, বিজ্ঞানে ধীর প্রতিভার, জ্ঞানের, আলোকের সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু না, উহাদিগকে আপন আপন ধর্ম্মের আচরণ করিতে দিও না। উহাদিগকে চাপিয়া দাও, দমাইয়া দাও, পিষিয়া দাও। উহারা যেন তোমাকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতে না পারে—তোমাকে ভোগবান্ করিয়া ফেলিতে না পারে—এ সৃষ্টিরূপ পদ্ম হইতে আনন্দরূপ মধু যেন তুমি আহরণ করিতে না পার।"

এ বিষয়ে যে তর্ক উঠবে তা এই যে, সত্যিই কি হিন্দু জাতিটা তার দুঃখবাদী দার্শনিকদের আর মায়াবাদী আচার্য্যদের উপদেশ মনে আঁকড়ে ধরেই জীবনের আনন্দ হারিয়ে, সৃষ্টির ক্ষমতাকে পঙ্গু করে' ক্রমে 'জড়ভরত' হয়ে উঠেছে? এই দুঃখবাদ আর মায়াবাদ, এ কি জাতির জীবনের আনন্দহীনতার কারণ, না তার ফল? রোগের নিদান না রোগের লক্ষণ? হয়ত এ মতবাদগুলির উদ্ভব হয়েছে তখন যখন হিন্দুজাতির মন সরস ও সচল ছিল, কেন না দার্শনিক চিন্তাও একটা সৃষ্টি, সচল মনেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু জাতির জীবনের উপর লেখক এদের যেমন প্রভাব কল্পনা করেছেন সে কি সম্ভব? জাতি যখন 'জীবনে উচ্ছ্বাসশক্তির অনুভব' করছে, যখন তার মনে 'কল্পনার অনন্ত খেলা খেলছে,' 'বুদ্ধিতে নব নব উদ্ভাবনী শক্তি' ফুটে উঠছে, তখন সে কি বৈরাগ্যের বাণীতে কান দেয়; না, কান দিলেও মন দেয়? সৃষ্টিপদ্মের আনন্দমধু যার জিহ্বাতে লেগে রয়েছে তার কানে 'জগৎ মিথ্যা' মন্ত্র জপে দিলেই কি সে মধু তিতিয়ে উঠবে? বরং এই কি সত্য হওয়া বেশি সম্ভব নয় যে, হিন্দুজাতির জীবনে

যখন ভাটা ধরেছে, সহজ আনন্দের উৎস যখন শুকিয়ে এসেছে তখনি সে ঐ মতবাদগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েছে? এবং তাদের শিক্ষায় আরও বেশি করে নিরানন্দ, বেশি করে কর্ম্ম-বিমুখ হয়ে উঠেছে? জাতির জীবনে এই যে ওঠা নামা, উৎসাহ অবসাদের যুগ একটার পর আর একটা আসে, লেখক তা মোটেই ভোলেন নি। তাঁর 'মুখপত্রে' এ কথা তিনি চমৎকার করেই বলেছেন। কেন যে মানুষের সভ্যতার এই নিদ্রা জাগরণ, বিকাশ সংকোচ, একের পর আর আসে তার রহস্য কে জানে? এ ত জীবন মৃত্যুরই রহস্য! এবং সে পুরাণ রহস্য চিরদিনই গুহাম্বিত, এবং হয়ত চিরদিনই তেমনি থাকবে। অবশ্য প্রত্যেক সভ্যতারই উত্থান পতনের একটা ইতিহাস আছে। হিন্দুর সভ্যতারও তা আছে। এবং সে ইতিহাস নিশ্চয়ই জটিল; এক কথায়, একটা সূত্রে গেঁথে ফেলার বিষয় নয়। কারণ মানুষের সভ্যতা জিনিষটিই অতি জটিল, এবং হিন্দু-সভ্যতা আর সব সভ্যতার চেয়ে কম জটিল ছিল মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে সে ইতিহাস কল্পনায় ছাড়া এখনও গড়ে তোলা চলে না। কেননা তার খবর আনাই এখনও আমাদের অজ্ঞাত। এবং হয়ত তাকে ঠিক সত্যকরে বিচার করবার মত এখন আমাদের মনের অবস্থাও নয়। বর্ত্তমানের দারিদ্র্য না ঘুচলে পূর্ব্বপুরুষের কি ঐশ্বর্য্য কি দারিদ্র্য, কিছুই মন খুলে বিচার করা সহজ নয়।

কিন্তু এ সব বিচার বিতর্কের কথা এখানেই শেষ করা যাক। এই সব যুক্তি-বিচার এ প্রবন্ধগুলির প্রধান কথা নয়। লেখকও তাদের প্রধান করতে চান নি, লেখাতেও তারা প্রধান হয়ে ওঠে নি। এ প্রবন্ধ-পুঁথিখানির প্রধান কথা ও প্রাণের কথা হ'ল বাঙালীর

জীবনে আজ দীর্ঘরাত্রিশেষে জাগরণের যুগ ফিরে এসেছে। সেই সহজ আনন্দ ভগবান আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন যার প্রাচুর্য্য হল সভ্যতার সমস্ত সৃষ্টিধারার মূল উৎস। লেখকের প্রাণে এই আনন্দের যে সুর বেজে উঠেছে প্রবন্ধগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তারই ঝঙ্কারে মুখর। এবং আগেই বলেছি, এ সুরের ঢেউ নবীন বাঙলার একেবারে মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করবে। হিন্দু-সভ্যতার কেন পতন হ'ল, এ নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু লেখক যখন ডেকে বলেছেন—"আমরা যারা নবীন—যাদের মনে উৎসাহ আছে, আশা আছে; অতীতের বোঝা যাদের প্রাণ হ'তে নবীন নবীন স্পন্দনের অনুভূতিকে দূর করে রাখতে সক্ষম হয় নি—তাদের আজ লড়াই করতে হবে এই ত্যাগ মন্ত্রের বিরুদ্ধে। এ বিচার যারা সারাদিন মার্ত্তণ্ড-তাপে কাটিয়ে অবসন্ন দেহে শুষ্ক মুখে সন্ধ্যার আড়ালে তাদের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে চলে পড়ছে তারা করবে না—ঊষার স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিপুল স্পন্দনের সাথে সাথে হাসিমুখে যারা আজ জীবন-মন্দিরে সাধকের বেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তারা করবে, আমি আহ্বান করছি আজ নবীনকে, পুরাতন আজ বিদায় নি'ক।" তখন তাঁর আহ্বানে, আজ বাঙলায় যারা নবীন তারা সাড়া দেবেই দেবে। কেননা আনন্দের এ সুর তাদের প্রাণে এসেও পৌঁচেছে। এ সোনার কাঠি যাকেই স্পর্শ করেছে সেই মনে জানে—যে-ত্যাগের মন্ত্র বিশ্ব থেকে মানুষকে বিমুখ করে সে যারই ধর্ম্ম হোক আজ বাঙালীর পক্ষে সেটা পরধর্ম্ম। শীতের দীর্ঘ রাত্রির পক্ষে 'অচলায়তনের' পাথরের ঘের ও আচারের কম্বল-চাপ কতটা উপযোগী কি অনুপযোগী, এ নিয়ে বিচার চলে। কিন্তু আজ

বসন্তের ঊষায় রঙ্গীন উত্তরীয় গায়ে মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়াতেই হবে।

এ বইখানি যিনিই পড়বেন দুটি প্রবন্ধ বিশেষ করে' তাঁরই চোখে পড়বে। এর একটি হ'ল "দরকার," আর একটি হ'ল "ইয়োরোপের কথা।" দ্বিতীয় প্রবন্ধটির এক জায়গায় লেখক বলেছেন, "আসল, সে বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তা নয়—সে অন্তর দিয়ে কি অনুভব করে তাই।" ও কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলা যায়।—সাহিত্য মানুষ বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তার ব্যাখ্যা নয়, অন্তর দিয়ে কি অনুভব করে তারই প্রকাশ। অবশ্য যে চিন্তা করে আর যে করে না, এ দু'য়ের অন্তর এক রকম নয়, এবং তাদের সৃষ্ট-সাহিত্যও এক দরের নয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অন্তরের ভিতর দিয়ে না এলে জিনিষটি মোটে সাহিত্যই হয় না। এ দুটি প্রবন্ধে লেখক যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন বাঙলা দেশে তা সুলভ নয়; কিন্তু সে চিন্তা এসেছে লেখকের অন্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে, আর প্রকাশ হয়েছে সাহিত্যের সুন্দর মূর্ত্তিতে। "দরকার" প্রবন্ধটির কথা এই:—"দরকারের তাগিদে মানুষ সভ্যতা গড়ে নাই, কেননা বেশির ভাগ দরকার সভ্যতারই ফল। এই সৃষ্টিটা অদরকারা বলেই, এ পৃথিবীর হাজার বস্তু, হাজার বিষয় মানুষের অপ্রয়োজনীয় বলেই তাতে মানুষের এত আনন্দ। কারণ যেখানে দরকার সেখানেই দাসত্ব।" "Necessity is the mother of invention—এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা—necessity, invention-এর mother ত নয়ই, মাসী পিসীরও কেউ নয়—ওটা একটা নিতান্ত প্রাকৃত জনের কথা, ধরতাই বুলিরই একটা বুলি। Invention-ই বল, discovery-ই বল, আর যাই বল,

এর মূলে রয়েছে মানুষের আনন্দ—প্রকাশ করবার আনন্দ—সৃষ্টি করবার আনন্দ।” ‘ইয়োরোপের কথায়’ লেখক এই রকম আর একটি ‘ধরতাই’ বুলির’ টুঁটি চেপে ধরেছেন। সেটি হচ্ছে—আধুনিক ইয়োরোপ জড়সর্ব্বস্ব আর আধুনিক বা প্রাচীন হিন্দু আধ্যাত্মিক “ইয়োরোপ তার অন্তরের, তার প্রাণের, তার জীবনের আনন্দ দিয়ে যে সভ্যতা গড়ে’ তুল্‌ল—যে সভ্যতা সকল পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল—যে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের সনাতন জাতির পুরাতন দেহে নূতন প্রাণ জেগে উঠল—সে সভ্যতা একটা গভীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ’তে না পারে—তাতে হাজার রকম ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে—হয়ত তাতে মানুষের সম্বন্ধে সকল সমস্যার সমাধান হ’য়ে ওঠে নি—কিন্তু তাই বলে’ যে সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে’ আছে কতগুলো জড়বস্তুসমষ্টির উপরে এ কথা যে বলে তার মত জড়বাদী এ ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। জড়বস্তুর এমন শক্তি এক নাস্তিক ছাড়া আর কেউ মানবে না।” “বাহিরের বস্তুসমষ্টি ইউরোপকে গড়ে’ তোলে নি—ইউরোপই বস্তুসমষ্টির জন্ম দিয়েছে—আপনার অন্তরের শক্তিতে—জীবনের আনন্দের আতিশয্যে—প্রাণের গতির বেগে। আসল কথা হচ্ছে যে জড় জড়ই, যতক্ষণ না সেটা মানুষের অন্তরের শক্তিতে কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। সুতরাং ইউরোপ আজ যা, তার মূল কারণ হচ্ছে তার জীবনে অনুভূত—প্রাণে ওজস্‌-রূপিনী চিৎশক্তি—তার জীবনদেবতার, ভগবানের এ সৃষ্টিতে লীলা-বিলাস।” তারপর প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথায় লেখক অতি সরস করে’ দেখিয়েছেন যে, কথায় কথায় আমরা যে আধ্যাত্মিকতার মাপকাটি বের করি তার মাপে হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের যুগগুলিকে

জড়সর্ব্বস্ব বলে’ ঠেলে দিতে হয়।” যে যুগে আর্য্যেরা বেদ লিখেছে সে যুগে কি তারা অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি? স্বয়ং রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে ছিলেন তখন কি তিনি গাছের বল্কল পরে’ সীতাদেবীকে আলিঙ্গন করতেন—না সীতাদেবী নিজ হাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুল পাতার অম্বল রেঁধে রামচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার গোড়ায় সার দিতেন? গীতা রচনা হ’ল, সে ত একটা ভীষণ মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধবিগ্রহ বা ভোগ-বিলাসটা কেবল জড়বাদীদেরই একচেটে ব্যবসা নয়। তা যদি হত তবে এমন আধ্যাত্মিক জাতি যে হিন্দু, তাদের মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদি করবার জন্যে একটা পৃথক বর্ণই গড়ে’ উঠত না।” লেখক এই কথা বলে’ তাঁর “ইউরোপের কথা” শেষ করেছেন,—“আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ আবার জগতে আপনার পূর্ব্ব গৌরবের স্থান অধিকার করে’ বসবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে’ থাকেন যে সেদিন হিন্দু তাঁতিরা কেবল গেরুয়া কাপড় তাঁতে চড়াবে, আর হিন্দু চাষীরা কেবল অপক্ক কদলীর চাষ করবে, তবে তাঁরা নিরাশ হবেন নিশ্চয়।”

এ প্রবন্ধ দুটির অন্তর্দৃষ্টি যেমন গভীর, এদের ভাষাও তেমনি লঘু, প্রকাশের ভঙ্গীও তেমনি সরস ও বিচিত্র।

তাঁর ন’টি প্রবন্ধ জুড়ে লেখক তাঁর স্বজাতি সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার অনেকগুলিকে গালমন্দ বললে খুব ভুল হয় না। টুর্গেনিক তাঁর রুডিনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, “জাতিকে গাল দেবার কেবল তারই অধিকার আছে, জাতিকে যে ভালবাসে। “নবযুগের কথা” পড়ে’ কারও সন্দেহ থাকবে না যে, লেখকের সে অধিকার নেই।”

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

বাদল ধারা।

——ঃ✽ঃ——

আষাঢ়।

ভোর বরষার জলে ভাসা আজ এ আমার পল্লীপারে
বাজ্‌ল উতল একি রে সুর বাজ্‌ল আলোর বিভোর তারে,
বাজ্‌ল মোর এ বিভল হাওয়ায়, বাজ্‌ল জলের কলস্বরে,
বাজ্‌ল সবুজ রেখায় রেখায়, বাজ্‌ল মেঘের থরে থরে,
বাজ্‌ল সারা গগনেরি অযুত সাঁঝের কাজল পরা
আঁখিকোণের অবাক্ ধারায় কোন্ নিবেদন—বাঁধন হরা!

পাল টেনে ঐ বাতাসে কি ছুট্‌ল রে আজ ছুট্‌ল তরী
পরিয়ে দিয়ে গানের মালা ভোর সাগরের লহর ভরি,
সুরের শাড়ী উড়িয়ে ধু ধু নূতন জলের তেপান্তরে
সবুজ বাঁশী বাজিয়ে নিখিল ছুট্‌ল'রে আজ পাগল করে!
বন ভেঙে দূর ছায়াবীথির লহর-নাচা নিরুদ্দেশে
গেয়ে গেয়ে ধর্‌লে পাড়ি অশ্রুপাগল আলোর দেশে!

ফুলে' ফুলে' মেঘের কোলে কেঁপে কেঁপে ধানের ক্ষেতে
অথা' জলের পাপ্‌ড়িফোটা মেতে নাচের ফুলবনেতে

দোল্ খেয়ে ঐ পাতায় পাতায় ছুটল রে আজ ছুটল তরী
দুধারে তার ভাঙা ঢেউয়ে নূপুরে সুর পড়ছে ঝরি,
পড়ছে ঝরে' পাখীর মুখে—সিঁদুর-আঁকা যাত্রাপথে
বুকে বুকে ভোরেরি থৈ ভুবন ভরে ছিটা'ল কে!
কূলে কূলে বাজ্‌ল কাঁকণ—আধেক গাওয়া মনের কথা—
বাদল রাতের পুঞ্জকরা ব্যাকুল কূলের আকুলতা
বাজ্‌ল ছায়ার কমলমনে ভেজা-আলোর চরণতলে
বাতাসেরি কানের পাশে বাজ্‌ল জলের ছলক্ ছলে,
গুঞ্জরিল আকাশে গান আলোধারার মধ্যখানে
তরী আমার ছুটল ভরে অফুরণ ঐ গানে গানে!

উড়িয়ে দিল পথের বাঁকে নিশানখানি বকের পাখা
কবুতরের মনমাতান মোহনপুরের রৌদ্রমাখা,
ঘোড়ঘুঙুরে বৈঠা আমার হাঁসের ঝাঁকে পড়্‌ল মরি!
যত প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে সকল গানের সুর শিহরি!
মেঘে মেঘে বনকাননে ডঙ্কা আমার বাজায় রে কে—
পালাল যে আকাশ ছেয়ে 'বৌ কথা কও' লিখে রেখে!
বাজাল ঐ ডাহুক দূরে ছোট্ট তাহার ডুগডুগিটি
ওই পারে তার যে আছে আজ এই যে রে তার আস্‌ল চিঠি!

কি সে জানে কখন্ হল পড়া লিখন ভর-সভাতে
চখাচখীর চোক বুলিয়ে সকল মাঠের যতেক হাতে!
ঠেক্‌ল কখন হঠাৎ পায়ে ছেলের দলের, গণ্ডগোলে,
রটল যে তা যত মাতাল দাদুরিদের মত্ত রোলে!

থম্‌কে-থাকা নূতন বৌয়ের ঘাটের পথ আজ এমন দিনে
একি বাতাস উথাল-পাথাল বাজায় এসে বুকের বীণে ?
চোকের তারার সব সীমানায় বিছান আজ আগুনখানি
কর্‌ল যে আজ কর্‌ল তারে কর্‌ল রে আজ মনের রাণী !

আকাশপারে ঢেলে কালি খল্‌খলিয়ে হাস্‌ছে মুখে
আখরগুলি শেষ করে সব গালে গায়ে মেখে চুকে,'
দুষ্ট ছেলে কচি দাঁতে ফুটিয়ে চেয়ে হাসির রেখা
মুক্তামালার মত করে ছড়িয়ে দিল সকল লেখা !

শ্রাবণ।

দু'ধার থেকে তা নিয়ে যে শরবনে কি মাতামাতি
পাকাধানের ক্ষেতে ক্ষেতে লাগ্‌ল বিষম হাতাহাতি,
অগাধ হল ফিস্‌ফিসানি খস্‌খসানি বাঁশবনে আজ
ঘোমটা টেনে কলার বনে কিসের কথা ? ঐ অত কাজ ?
হাসির বাঁশী, নিশাসরাশি, জম্‌ল কি গো নয়ন পুটে
কুঁড়ের পথে আঁচলপাতা কার হল—কার পড়্‌ল লুটে ?
হারাদিনের অদূরকথা, বুকের কারো আশার ভরা,
তাই দিয়ে আজ খুল্‌লে কি গো প্রথম দিনের অঝোর ঝরা ?
ভাস্‌ল যে আজ সেই ধারাতে তালপাকান রুক্ষজটা
সকল-সহা মুক্তমাঠের যাদুর পাহাড় মানুষ কটা ;
কম্‌ল না দুরন্তপনা কম্‌ল কোথা কচুর বনে ?
কান্না হাসি সব ঠেলে যে নাচ্‌ছে ওরা ক্ষণে ক্ষণে ;

কোমর কেচে ধঞ্চেরা সব স্রোতের মুখে জুট্‌ল এসে
শিঙারি সুর লাগ্‌ল কানে কেয়াফুলের গন্ধে ভেসে,—
বুঝ্‌বে কি গো আর ওরা আজ ? আর কি ওরা থাক্‌তে পারে ?
দাঁড়াল সব জয়পতাকা চরণ ঘিরে সারে সারে !
মাছরাঙারি পাথায় পাথায় ফড়িংগুলির পায়ে পায়ে
সব কথা যে রঙিন্ হয়ে ছড়িয়ে গেল গাঁয়ে গাঁয়ে !
ছড়িয়ে গেল সকল রাতের রক্তরেখার উপর দিয়ে
হাজার দিনের হাসির পায়ের ধুলোরিদাগ ধুয়ে নিয়ে
ঢেউয়ের নাচে নাচাপরাণ চপলস্রোতের সাথে সাথে
চোকের আগের পথেরি ঐ কোলাকুলির আঙিনাতে !
বুকচেরা পথ মাঠের বুকে সিঁথির মত রইল আঁকা
বাউল ঢেউয়ের মাথায় মাথায় গানের ভুবন মেল্‌ল পাখা !
মেল্‌ল পাখা হাজার তরী চল্‌ল যে সব পাখীর মত !
সবুজ মেঘের কিনার দিয়ে বাঁশীর সুরে তন্দ্রাহত,
রেখে রেখে গেল নিশাস্ উধাও জলের বুকের ঢেউয়ে
খুল্‌বে ঢাকন কখন্ কি তার জান্‌বে কি তা জান্‌বে কেউ এ ?
বুকের মাণিক চল্‌ল যে আজ রৌদ্রঢালা অভিসারে
নয়তো সে কোন্ দূর অজানা ধারানিবিড় অন্ধকারে,
হয়তো আকুল ধরণীর এই আপনহারা পারাবারে
নয় তো আতুর মিথ্যা প্রাণের হাজার ঘাটের পারাপারে ;
নয় তো আপন বুকের ঠাকুর বুকে ঢেকে কর্ম্ম করা,
নয় তো হাওয়ার হাসির ভেলা, নয় আগুণের তূষ-পশরা !
—বাজিয়ে নিয়ে সকল বেদন জলধারার খঞ্জনীতে
ভাটিয়ালের প্রভাত সুরের পরাণভরা গহনগীতে !

ভাদ্র।

কথা শুধু জান্‌ত দুজন—পানকৌড়ি আর কল্‌মিলতা
ভিজে ভিজেও মিল্‌ল না তো আজো তাদের মনের কথা!
বিষম কালো উড়্‌ল যে কেউ নীল হয়ে কেউ ফুলায় যে গাল,
ঝিনুকগুলির বুকেই শুধু রইল গোপন একটুকু লাল
শাপ্‌লা মেয়ে চুপি চুপি বল্‌তে এসেই হল্‌দে হয়ে
এলিয়ে পড়ে ঝাউমাসীদের ডরে ভয়ে একটু কয়ে;
পাড়ায় পাড়ায় হল না গো ইশারার আর একটু দেরী
জলে স্থলে একেবারে অম্‌নি তাহার বাজ্‌ল ভেরি!
গগনরাণী হাওয়ার গায়ে ফুলের ডালা দিল ঢেলে
শুপারীগাছ নেয়ে উঠে হেসে হেসে পড়ল হেলে,
খোঁপায় কাঁটা কদমবধূ শুন্‌তে এসেই কথাটি সে—
আঁচলে টান পড়্‌ল যেমন—মুদল আঁখি শিউরে উঠে!
—গভীর স্বরে রেশটি তাহার কার দুয়ারে দিল হানা
সুদূরে যার বাজ্‌ল মাদল?—কোথায় রে তার কোন্ ঠিকানা?
ছুট্‌ল পাগল সব নিয়ে আজ আকাশপাতাল সব ভাসিয়ে
জটায় জটায় ছুল্‌ল আঁধার হাসিতে তার দিক কাঁপিয়ে
কোথায় ছিল গোপন মনে এত কথার আঁখির বারি?
বুকের কোলে খুল্‌ল যে আজ গভীর নিশার খুল্‌ল ঝারি!
বিবশ করে' নিশীথসুরের আলাপনে ভুবনখানি
বাজিয়ে দিল মনতারাতে উদাসরাতের অসীম বাণী

বাজিয়ে দিল ঝিল্লীরবের আঁধারফাটা তীব্র সুরে
প্রাণসাগরের কোন্ গোপনে ভুবন যে আজ চল্‌ল পুড়ে,
চল্‌ল অপার আজ্ অবারণ প্রাণের পূজা পুষ্প ফলে
লক্ষ হাজার ঝর্‌ল কমল উছল অতল স্রোতের জলে !

ঝর্‌ছে তাহার পাপ্‌ড়িগুলির পাখার কাঁপন প্রাণের পাতে
অজানা সুর বাজ্‌ছে তালে জীবনবনের মন্দিরাতে !

জ্বল্‌ছে যেথায় মাটির প্রদীপ কুঁড়ের কোণে মিটমিটিয়ে
নদীর ভাঙন ঘরের পিছে, দেখ্‌ছে উঠে গিয়ে গিয়ে,—
পড়্‌শীঘরের আস্‌ছে সারা চল্‌ছে সাড়া ডাকে ডাকে
কার চরণের শব্দটুকু পড়্‌ছে নিশির থাকে থাকে ?

দেয় নি ওরা আঁধারে আজ দেয় নি ওরা সুর নিভিয়ে
ঘাট যে ওরাই বিশ্ববীণার—গড়াগানের রক্ত দিয়ে,—

গড়া কোথায় স্বপ্নে ঢালা কোন সে বিশাল ইন্দ্রপুরী
ভুবনবাণীর জমাট ব্যথার কোথায় রে মঠ আঁধার জুড়ি ?

চম্‌কে উঠে কেকার ডাকে পেখমতলে লুটিয়ে পড়া
পিয়ে সুরা সুরসাগরের শঙ্খ কিসে ঘুমায় ওরা ?
জাগ্‌বে কখন জাগ্‌বে কখন জাগ্‌বে ওরা ? জাগ্‌বে কিরে ?
দশদিকে যে বাজ্‌ল মাদল নাম্‌ল বাদল সুরে ঘিরে !

তারায় তারায় বাজ্‌ল যে শাঁখ ছায়াপথের সাগরজলে
অস্তগিরির কোন্ সে চূড়ার কোন্ সে গুহার বাসার তলে ?
কাঁপছে যেথায় জলের গায়ে সন্ধ্যারতির রেশ-অবশেষ—
চল্‌ছে বেজে তাঁরেই ঘিরে—কোড়ার ডাকের নাই যে রে শেষ,

বাজল তৃণের শিরায় শিরায় কাঁপিয়ে জলের অধীর ধারা
বাজ্‌ছে যেন যুগ হতে যুগ—একি রে কোন্ ধ্রুবতারা !
বাজ্‌ছে রেণুর পুলকপুরে নীরব চির বধূর ভালে
বাজ্‌ছে ঘরের জাগা বুকে বাজ্‌ছে ঘুমের অন্তরালে,
ধর্‌ছে না তার সুরের ধারা—ছাপিয়ে যে তার উঠ্‌ছে কানা—
বাজ্‌ছে সুরে এপার ওপার দিগন্তের আজ সব মোহানা !
ফাঁক দিয়ে তার দীপের আলো পড়ল না আর ভুবন মাঝে
অথির আকাশ নদীর কানে শুধুই কেবল গানটি বাজে !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

কথিকা।

——ঃ*ঃ——

আমাদের এই শান-বাঁধানো গলি বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কি যেন খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিল। কিন্তু সে যেদিকেই যায় ঠেকে যায়। এদিকে বাড়ি, ওদিকে বাড়ি, সাম্‌নে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একটুখানি আকাশের রেখা দেখ্‌তে পায়—ঠিক তার নিজেরই মত সরু, তার নিজেরই মত বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বল ত, তুমি কোন্ নীল সহরের গলি?"

দুপরবেলায় কেবল একটুখনের জন্যে সে সূর্য্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, "কিচ্ছুই বোঝা গেল না!"

বর্ষামেঘের ছায়া দুই সার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েচে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে পড়ে' চম্‌কিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্‌খটে শুক্‌নো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত?"

ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়া গলির মধ্যে হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়; ধূলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়্‌তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্ পাগ্‌লা দেবতার মাৎলামি!"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জ্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারীর খোসা, মরা ইঁদুর—সে জানে এই সব হচ্চে বাস্তব। কোনোদিন ভুলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন?"

অথচ শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পূজোর নহবৎ ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শান-বাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!"

এদিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিনীর আঁচলটার মত বাড়ি-গুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি করে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে আর ধোঁয়ায় গলি ভরে' যায়; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, "এই শান-বাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর যাকে মনে ভাব্‌চি মস্ত একটা কিছু, সে মস্ত একটা স্বপ্ন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্ধু।

——:০:——

(১)

এক নতুন বন্ধু পেয়েছি। সে সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় অষ্টপ্রহরই আমার ঘরে এসে বসে থাকে।

সকালে বলে—"আহা কি সুন্দর সকাল, কি শান্ত সময়টা, পাখী ও ছেলেদের কলরবে শুধু মুখরিত দিক্—এ সময়টা আমি তোমার বন্ধু এসেছি তোমার কাছে, আমার সৎকার কর, কোথাও যেও না, ঘুরে বেড়িও না। বোসো দিকিন ভাই, খাতাটি নাও দেখি, আসন করে বসে মনের ভিতর ডোবোত এবার ?"

তাই যদি করি, তবে সকাল পেরোলে দেখি বন্ধু আমার স্নিগ্ধ হাস্তমুখ। নয়ত কোথা উধাও।

দুপুরে বলে—"আহা কেমন উদার ব্যাপক সময়টা। ঘুমুবে নাকি ? তবে আমি চল্লুম।"—হেসে হেসে আকাশবিহারী আকাশে মিলিয়ে যেতে চায়।

যদি বলি—"না, ঘুমোব না, বল কি করি, কি করলে তোমায় কাছে রাখতে পারব।"

সে পাশে এসে হাতে হাতখানি রেখে বলে—"তবে এসো, এই জানালার ধারটাতে এসে বোসো। দেখ দিকি কেমন মাঠ—ঐ

মাঠের শেষে দিগন্তের পরপারে কত কি সম্ভাবনা, কত কি আশা, কত কি গান, কত কি সৌভাগ্য ঝিক্ ঝিক্ করছে। ঐ মরীচিকাকে ধরে ফেলে বাঁধতে পার না? ছবিতে, লেখায়, গানে, ভাবে জড়াও না?

সন্ধ্যে বেলায় বলে—"একটুখানি চুপ করে বসে থাক শুধু। আর কিছুই কোরোনা।"

(২)

স্বায়ত্ত সকালও আছে, দুপুরও আছে। বন্ধু কিন্তু আর আসে না। মাঠ ছেড়ে সহরে এসেছি। কাঠকাঠরা, আলমারি টেবিল চৌকির রাশল, বিছানা পত্তর, খাটের মাথায় গোটান মশারি, ছড়ান কাপড়, হোল্ড, টিফিন বাস্কেট, ট্রাঙ্ক, হ্যাণ্ডব্যাগ ও সাজগোজের নানা উপাদানে ঘর ভরা, চিকফেলা জানলার গায়ের ভিতরে একটুখানি আকাশের পট। বন্ধুর চরণ আর তাতে পড়ে না।

কে সে বন্ধু? আগে ভেবেছিলুম তার নাম বুঝি "সময়"; এখানে দেখছি "সময়" সেই আছে, কিন্তু বন্ধু নেই। তবে কি সে শুধু অবসর নয়, অবকাশ? মনের আর ঘরের, কালের স্থানের আর দুয়েরই? যেমন শূন্য মনে ভিন্ন বন্ধুর সমাগম হয় না, তেমনি নিরবচ্ছিন্ন স্থূলের ঠেসাঠেসিতেও বন্ধু স্ফূর্ত্তি পায় না?

(৩)

অনেক দিন আর সেরকম করে আকাশ সাঁৎরে বন্ধুকে আমার দিকে আসতে দেখি নে। কিন্তু আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়লেই তাতে

যে তার আভাষ মাখান রয়েছে তার স্পর্শ পাই। যদি নীরবে বসে থাকি, যদি নিজের মাঝে ডুবি তবে বন্ধু আস্তে আস্তে অলক্ষ্যে এসে আবার জড়িয়ে ধরে। কে সে বন্ধু ? কে সে সুজন, জনতা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনলে যাকে পাওয়া যায় ? সে কি আমার ভিতরের সম্পূর্ণতা ?

(৪)

আমার কতক সময় আর আমার নেই। বাক্‌দত্ত করে ফেলেছি। পাছে তার কিছু ফেলাছড়া হয়, পরের জিনিষ হরণ করে ফেলি তাই ভয় হয়। তাই ভয়ে ভয়ে নাওয়া, ভয়ে খাওয়া। প্রতিশ্রুত সময়ে পদক্রান্তি না হয়। সময়ের বাক্যদান আত্মসাধনার জন্য কোন শরীরী বন্ধুকে। তা হতেই হঠাৎ চিন্‌লেম্ অশরীরী বন্ধু তোমার কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং ! তুমি আমার অন্তর্য্যামী !

(৫)

দহরাকাশে যে অন্তর্য্যামী, বহিরাকাশে সেই বিশ্বাত্মা। হৃদাকাশ যাঁর আসন, চিদাকাশ তাঁরই বসন। দিগম্বরের পরিধান সেই অম্বরের প্রতি, সেই শূন্য কহেন—আকাশের প্রতি, শূন্যের প্রতি মানবাত্মার তাই এত টান। মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী, মাং নমস্কুরু।

কিন্তু আত্মা বা বিশ্বাত্মাকে শূন্যভাবে সর্ব্বদা মনন করা যায় না, ধরা ছোঁয়া যায় না, ধরে রাখা যায় না। তাকে সূক্ষ্ম হতে যতই সূক্ষ্মতর হোক্ না কেন রূপের বা রেখার নির্দ্দিষ্টতার মধ্যে আনতে

পারলে মন যে আলম্বন পায় তাতে চরিতার্থতা দ্রুত পরিপাক লাভ করে। তাই গুরুর মাহাত্ম্য, অবতারের সার্থকতা।

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু

বন্ধুরাত্মাত্মনোস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।"

আত্মাই আত্মার বন্ধু। যে আত্মচেষ্টায় আত্মজয় করে তারই আত্মা তার বন্ধু।

সেই ধ্রুব নিত্য বন্ধু কখন কখন অন্তর ছেড়ে মর্ত্যবন্ধু হয়ে বাহিরে দেখা দেয়। হে অশরীরি! তোমার মর্ম্মবাণী চর্ম্মের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হলে বুঝি শ্রেয় কর্ম্মে প্রবৃত্তি সহজ হয়? তাই অরূপ তুমি রূপধারী হও? যাকে অর্জ্জুন বলেছিলেন—

"শিষ্যস্তেহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং।"

জগতে দুটি ধারা প্রবাহিত। এক শাসনের বা প্রহরীগিরির, অন্যটি গ্রহণের বা প্রীতির। কৃষ্ণাবতারে এই দ্বিধারার সঙ্গম হয়েছিল। অনুশাসিতা যে সে কবি হওয়া চাই, রসিক হওয়া চাই, বন্ধু হওয়া চাই—শুধু গুরু নহে। তার নিকট থেকে আবদার চাই—

"আমায় সব সমর্পণ কর।"

আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মচেষ্টাদ্বারাই আত্মজয় করতে হবে। কিন্তু আত্মা যে ঘটে ঘটে বিরাজিত, তাই ঘটান্তরেও তাকে বন্ধুমূর্ত্তিতে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ প্রবল। মানবাত্মা আপনাকে আপনার কাছে জমিয়ে রেখে তৃপ্ত নয়, সে আপনাকে দিতে চায়।

"আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে!"

মানবের মর্ম্মোত্থিত এ ক্রন্দনের নিবৃত্তির জন্য নেবার লোক চাই, দেবার পাত্র চাই যে কইতে পারে।

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।"
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং।

যাকে অর্পণ করবে, যার নিকট সব কিছু বাক্‌দত্ত হবে সে যদি সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় তবে তন্মনা হয়ে, তদ্ভক্ত হয়ে তাকেও নমস্কার।

শ্রীসরলা দেবী।

উড়ো চিঠি।

——:*:——

ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯১৯।

অমর!

তুমি আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিয়েছিলে। প্রায় সাড়ে চার মাস পর আজ সকাল দশ ঘটিকা এগার মিনিট বার সেকেণ্ডের সময় তোমার শ্রীহস্তের একখানি পত্র আমার এ দীনের কুটীরে এসে পৌঁচল—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"।

যাহোক তোমার চিঠি পড়ে এতদিনের নীরবতার কারণ বুঝলুম। চিঠিখানায় আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত একটা অভিমানের সুর ফুটে উঠেচে।

"ইউরোপ নিজের চেহারা দেখতে পেয়েচে বলে যে, সে রাত পোহালে গরদের জোড় পরে টিকি রেখে ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদম্ বলতে বসে যাবে তা নয়,"—আমার এ কথায় তুমি রাগ করেচ। আমাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে অমন ironical মনের ভাব তুমি আমার কাছে থেকে আশা কর নি; লিখেচ, এতে তোমার অন্তরে একটা আঘাত লেগেচে। কিন্তু ও-কথা আমি ironically লিখি নি—অমন একটা apt allusion আমি আর কোথাও খুঁজে পেলুম না, তাই ওটা লিখেচি। ওটার মধ্যে একটা

সত্যের চেহারা দেখতে পাই বলেই ওটা অমন জায়গায় অমনি করে লিখেছিলুম। এতে তোমার বা আর কারো অভিমান করবার কি আছে জানি নে।

তুমি আমায় ঘোর materialist বলেছ,—আমার materialism নাকি আমার পত্রে ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। আমার চিঠিতে যে microscope দিয়ে materialism-এর সূক্ষ্ম পরমাণু কোথা থেকে বের করলে, তা বোঝা আমার বুদ্ধির অতীত। তোমার বিশ্বাস, আর শুধু তোমারই বা বলি কেন, আজকাল এ দেশের প্রায় সবারই বিশ্বাস, যে-কেউ এই জগৎটাকে ফাঁকি বলে উড়িয়ে না দেবে সেই অদার্শনিক, অধার্ম্মিক, অনাধ্যাত্মিক, আসুরিক—সে দৃষ্টিহীন, জ্ঞান-হীন, বদ্ধ, রুদ্ধ, আসক্ত। এই যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েচে আজ যদি সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষা থাকত তবে এই অবস্থাটা দাঁড়াতে পারত না বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা তখন সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের একটা অতি সহজ সম্বন্ধ থাকত, তখন সংস্কৃত ভাষা আমাদের মুখে মুখে থাকত বলে আর তখন সেটাকে দেবভাষা আখ্যা দিতুম না; সুতরাং আমাদের আত্মার চাইতে পদে পদে তার একটা বড় মূল্য দিয়ে বসতুম না। যে-লোকটা লিখতে পড়তে জানে না বা অতি কম জানে তার কাছে যে ছাপার হরফের মূল্য কি, আর কতটা, তা ত সেই Scotch peasant-ই প্রমাণ করেছিল, যখন সে তার শেষ যুক্তি দাখিল করেএই বলে যে, I saw it in print. আমরা যখন সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করি, বিশেষত তার দর্শনের কোঠায়—তখন আমাদের মাথা ভয়ে ভক্তিতে অমনি নত হয়ে আসে, তারপর ঐ মাথা-নত অবস্থা এমনি অভ্যাস হয়ে যায়

যে যখন সে-মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি তখনও আর ঘাড় সোজা হতে চায় না। কেবল যে সোজা হতেই চায় না, তাই নয়—সোজা হওয়াটাই তখন একটা মস্ত অ-ভক্ত হৃদয়ের পরিচয় হয়ে উঠে। কেবল তাই আমরা লক্ষ করা নিরানব্বুই হাজার ন'শ নিরানব্বুই জনা সংস্কৃত জানিনা বলে, জানলেও তা পড়বার ইচ্ছে বা অবসর হয় না বলে, আর ইচ্ছে আর অবসর হলেও কঠোপনিষদের বদলে ঋতুসংহারই খুলে বসি বলে, সে-কালের দার্শনিক মতগুলো একালে আমাদের কাছে বাজারে-গুজবের আকার ধারণ করে দেখা দিয়েচে। এই যেমন ধর—মায়াবাদ, এই মায়াবাদ যে আসলে কি তা আমিও জানি নে, তুমিও জান না—শঙ্করভাষ্য আমিও পড়ি নি, তুমিও পড় নি—ও রাম শ্যাম যদু কেউ-ই পড়ে নি—শঙ্করের আসল মায়া কি ছিল, তা কেউ জানে না। অথচ সকলের মুখেই মায়াবাদ। এবং যে আজ জন্মালে সেও বলচে জগৎটা মায়া, ও যে কাল মরবে সেও বলচে জগৎটা মায়া। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী এসে বলচে জগৎটা মায়া, ভিক্ষে পাই গো। গৃহস্থ এসে বলচে—জগৎটা মায়া, চরণধূলি চাই গো। তিলককাটা বৈষ্ণব বলচে—জগৎটা মায়া, এস রাধাকৃষ্ণের নাম করি। রুদ্রাক্ষ-আঁটা তান্ত্রিক বলচে—জগৎটা মায়া, এস কারণ-বারি পান করি। এই যে বাজারে সস্তা মায়াবাদের বুলি, এই বুলি আওড়ানই যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, এবং এই বুলি খেতে শুতে যেতে না আওড়ানোটাই যদি জড়বাদের লক্ষণ হয় তবে আমি যে জড়বাদী তার কোনো ভুল নেই। তবে spiritualism আর materialism-এর সংজ্ঞা ঠিক ঐ কি না সে সম্বন্ধে এমন একটা সন্দেহ আছে যে সন্দেহটা এই জগৎটা আছে কি নেই—এ সন্দেহের চাইতে সন্দেহজনক।

(২)

কিন্তু সে যাহোক, আমি তোমায় হলফ করে বলতে পারি যে আমি জড়বাদী নই, কেননা জড়ও যে চৈতন্যেরই বিকাশ এই আমারও বিশ্বাস। আমাদের এই গোঁড়ামীর দেশে যে এক রকম আধ্যাত্মিকতার গোঁড়ামী আছে সেই গোঁড়া আধ্যাত্মিকবাদীও আমি নই। আমার ঘাড়ে যদি নিতান্তই কোন বাদ চাপাতে চাও তবে যে-বাদটায় তোমার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ বাধবে না সেটা হচ্চে লীলাবাদ। আমি ভগবানের লীলা মানি। আর এই লীলা মানি বলেই আমি জড়ও মানি চৈতন্যকেও মানি, অর্থাৎ—অন্নকেও মানি, আত্মাকেও মানি, ভোগকেও মানি, যোগকেও মানি—আলাদা আলাদা করে নয়, এক সঙ্গে। আমি যে Kipling নই, সে সম্বন্ধে তুমি স্থিরনিশ্চিত, সুতরাং—

"East is east and west is west
And never the twain shall meet."

এত বড় একটা কথা বলবার সাহস আমার নেই। আসলে অন্ন ও আত্মার মধ্যে বিরোধটাই আমার কাছে স্পষ্ট নয়, তার চাইতে ঢের বেশি স্পষ্ট তাদের মিলনের দিক এবং সেই দিকটাই হচ্চে মঙ্গলের দিক, কল্যাণের দিক। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে কি না জানি নে, কিন্তু আমার ওই কথা সমর্থন করবার জন্যে আমি তোমায় উপনিষদ থেকে শ্লোক তুলে দেখিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু যা বাঙলায় বল্লুম তা যদি না মান, তাহলে সংস্কৃত শ্লোক তুল্লেই যে অমনি বুঝে যাবে—এ কথা মনে করা আসলে তোমার বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করা

হয়; কিন্তু আর যাই হোক সে কটাক্ষ তোমার বুদ্ধির প্রতি আমি করতে পারি নে। কিন্তু উপনিষদ থেকে এই যে-শ্লোক তুল্লুম না, সেই শ্লোকই প্রমাণ যে সেকালে ঋষিদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কাঁধে পাখা লাগিয়ে দিবারাত্র আকাশে উড়ে বেড়াতেন না,—কেবল বায়ু সেবন করে'।

(৩)

আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমার একটা মস্ত বড় আপত্তি কি জান?—সেটা হচ্চে এই যে, তা এত ভীষণ লম্বা যে আমরা মেপে তার হিসেব করে উঠতে পারি নে।—আর যদি বা পারি তবু সে হিসেব মনে করে রাখতে পারি নে। ওর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিই চলে না— মাঝপথ পর্য্যন্ত এসে তারপর হয় দৃষ্টি থেমে যায়, নয় ত ঝাপসা হয়ে আসে। যেখান পর্য্যন্ত এসে আমাদের দৃষ্টি থেমে যায় ঐ সেইটেই হচ্চে "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগ"—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা চলে আমাদের মধ্যযুগ। এ যুগে ভারতীয় চিন্তা-জগতে একটা বিশেষ ভাব ফুটে উঠেছিল এবং এই ভাবকে আশ্রয় করে একটা নতুন দর্শন গড়ে উঠল। এর van guard হচ্চেন বুদ্ধ, আর rear guard হচ্চেন শঙ্কর। আমরা আমাদের জাতীয় অতীতের লম্বা রাস্তায় ঠিক ঐ খানটায় পর্য্যন্ত দেখতে পাই বলে আমাদের আজ সবারই মনে মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে, সে ধারণাটা হচ্চে এই যে, আবহমানকাল থেকে হিন্দুর ভারতে ছিল মাত্র দুটি জিনিষ—এক পর্ণকুটীর আর শীর্ণ ঋষি।

সে কালের ঋষিরা সবাই শীর্ণ ছিলেন কি না সে তর্ক না হয় না-ই তুল্লুম কিন্তু ঐ কারণেই আজ আমাদের চোখের সুমুখে নৈমিষারণ্যের বৃক্ষলতাগুল্ম এমনি নিবিড় হয়ে উঠেচে যে তা ভেদ করে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদের উঁচু চূড়া একটুও দেখা যাচ্চে না, সৌতি সনকাদি ঋষির মুখে চাপ্‌দাড়ি এমনি কাল হয়ে উঠেচে যে পরীক্ষিৎ জনমেজয়ের মাথার স্বর্ণ মুকুট একটুও চোখে পড়চে না। তাই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের একটি অক্ষরও আজ আমাদের মনে নেই, আর মনে থাকলেও তা অতি যত্ন করে মুখে আনি নে। কেন না মুখে আনলেই তার একটা যুক্তিপুর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে দিতে জান হয়রান হয়ে যাবে। তার বদলে আজ আমরা আওড়াচ্চি—"মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা" অথচ যখন প্রশ্ন ওঠে আমাদের জাতির দুর্দ্দশা হল কেমন করে? সোজা উত্তর—ধর্ম্মের অধঃপতন হয়েছে বলে। এখন জিজ্ঞেস কর—ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি?—তখন দেখবে পাঁচ জনের মধ্যে চার জনের সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই, আর বাকি একজন এমনি উত্তর দেবে যাতে হাসির চোটে পিলে ফাটে। সেদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—"আচ্ছা বলুন ত আমাদের ধর্ম্মের অধঃপতনের অর্থ কি?" তিনি উত্তর দিলেন—"বাপুহেঁ ধর্ম্মের অধঃপতনের আর বাকি কি, আজকাল ব্রাহ্মণরাও যখন রেলগাড়ী চাপচে।" ব্রাহ্মণ এমনি ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলেন যে, তাঁর ধর্ম্মের ব্যাখ্যাটা উপনিষদে স্থান পাবার যোগ্য। অথচ এটা কারো কাছেই শুনবে না যে, আমাদের যে ধর্ম্মের অধঃপতন হয়েচে এবং যার জন্যে এমন দুর্দ্দশা হয়েচে সেটা হচ্চে "মনুষ্যত্ব" ধর্ম্মের অভাব। আমাদের প্রথম

ধারণা যে মানুষ আসলে হচ্চে কচিখোকা, তাকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শাসনে রাখতে হবে। আর আমাদের দ্বিতীয় ধারণা এই যে, মানুষ নামক জীবটি আসলেই কু, ভাষায় যাকে বলে হাড়পাজী। তাকে এতটুকু স্বাধীনতা দিয়েচ কি সে গিয়ে নরকের পথে নেমেচে, অর্থাৎ— মানুষের আসল সদিচ্ছাটাই হচ্চে তার নিজের ধ্বংস সাধন করা— এই আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের ঘরে বাইরে বন্দোবস্ত। বাইরে অস্ত্র আর ঘরে শাস্ত্র। শুনতে শুনতে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে মানুষের আত্মঘাতী না হয়ে বেঁচে থাকবার একই উপায় আছে—সেটা হচ্চে পরবশ্যতা। এর পাল্লায় পড়েই মানুষের ধর্ম্মের বিকাশ হতে পারছে না, যে বিকাশ হচ্চে মানুষের আনন্দের ও স্বাধীনতার বিকাশ। অথচ আমাদের সবারই ধারণা যে আমাদের যা-কিছু দুঃখ, তা হচ্চে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন যে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ সেটা মানি নে বলে। কিন্তু সবার চাইতে মজার কথা হচ্চে এই যে, আজ আমাদের নজর পরপুরুষের অস্ত্রের উপরে পড়েচে, কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি মোটেও পড়ে নি—ভিতরের বাঁধনই যে বড় বাঁধন—একথা আমরা চোখ মেলেও মানি নে। তারপর বিশেষত আমরা যখন আজ সবাই পলিটিক্যাল, তখন আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা একেবারেই দেশদ্রোহীতার পরিচায়ক। আমরা জাতিটা কি না আধ্যাত্মিক তাই বাইরে থেকে যা আমাদের চর্ম্মের উপরে এসে পড়েছে তাই আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিন্তু ভিতর থেকে যা আমাদের মর্ম্মের উপরে পাথর চাপিয়ে রেখেচে তা আমাদের মোটেই চোখে পড়চে না। দিব্যদৃষ্টি আর কাকে বলে—বল?

(৪)

ধান ভানতে শিবের গীত এখানেই শেষ করা গেল। এখন শোন লীলাবাদ আমি মানি বলে মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি ?

তুমি হাজার সাত্ত্বিক হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমায় একটি কথা বলে রাখচি যে কেবল সাত্ত্বিকতাকে আশ্রয় করে একটা মানুষ বসে থাকতে পারে ; কিন্তু একটা সমাজ বা জাতিকে গড়িয়ে বেড়াতে হবে। ইউরোপে যে এত Balance of power-এর কথা শোন, একটা কোনো সমাজের মঙ্গল চিরকাল ধরে রাখতে চাইলে সেই সমাজের মানুষদের মধ্যেও তেমনি একটা Balance of সত্ত্ব, রজ, তম চাই। এই কলিযুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম— ত্রেতায় যখন ধর্ম্ম ছিল এখনকার চাইতে তিনগুণ, তখনও কিন্তু বিশ্বামিত্রকে আসতে হয়েছিল দশরথের কাছে, রামলক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে তাড়কাসুর বধ করবার জন্যে। ত্রেতাতেই যখন এই তখন কলিযুগের কথা অনুমান করেই নিতে পার। বায়ুপিত্ত কফের সামঞ্জস্যেই মানুষের দেহের স্বাস্থ্য—স্বত্ত্ব রজ তম—এই তিনের সামঞ্জস্যে সমাজদেহের মঙ্গল। খালি সাত্ত্বিকতায় দেহটা আত্মা হয়ে সমস্ত মানুষটা আকাশে মিলিয়ে যাবে, খালি তামসিকতায় আত্মাটা জড় হয়ে সমস্ত মানুষটা মাটিতে মিশিয়ে যাবে, এই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হলে, চাই এ দুয়ের মাঝে রজ। রজ দু'হাত দিয়ে দু' দিককার সত্ত্ব ও তমকে টেনে রাখবে। সত্ত্বকেও উড়তে দেবে না, তমকেও লুটতে দেবে না। তবেই মানুষ নামক জীবটির মঙ্গল— ভগবানের এই লীলার মাঝে। কিন্তু রজও যদি অতিরিক্ত প্রবল

হয়ে ওঠে তা হলেও ঘটবে আবার দুর্ঘটনা। রজটা হচ্চে আগুন—এই আগুন যদি টু-হানড্রেড ডিগ্রী ফারেন্‌হিটে উঠে যায় তবে তৎক্ষণাৎ একদিকে আত্মাটা বাষ্প হয়ে যাবে, আর একদিকে দেহটা ভস্ম হয়ে ধ্বসে পড়বে। তিন গুণের এই তিন অমঙ্গল থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে তার জীবনে এ তিনের একটা Balance (সামঞ্জস্য) স্থাপন করতে হবে। মানুষ তার ত্রি-গুণকে অতি সহজেই ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে সেই দিন, যেদিন সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে সে তার প্রকৃতির দাস নয়—সে তার ঈশ্বর।

(৫)

তুমি এইখানে একটা কথা বলতে পার যে সত্ত্ব ও রজকে না হয় মানলুম—কিন্তু তমর দরকারটা কি?—দরকার আছে। জান ত জাহাজের খোলে ballast পূরে দেয়—জাহাজের তলা ভারি রাখবার জন্যে। নইলে বাতাসের একটু জোরে আর ঢেউয়ের একটু তোড়ে জাহাজ এমনি হেলবে দুলবে যে, তাতে জাহাজের স্থৈর্য্য রক্ষা করা দায় হবে। তমটাও হচ্চে মানুষের প্রকৃতিতে ঐ ballast, এই তমের ভারেই মানুষ কোনো রকমে মাটীর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ তম-এ যদি মানুষের তলা ভারি না থাকত তবে সে কোন্ দিন প্রস্‌পেরোর এরিয়েল বা এঞ্জেল গেব্রিয়েলের মত পাখা মেলে আকাশে উধাও হয়ে যেত। এ তম আছে বলে সত্ত্ব তাকে উড়িয়ে নিতে পারছে না, রজও তাকে পুড়িয়ে দিতে পারছে না।

অবশ্য যাঁরা মায়াবাদী বা নির্ব্বাণবাদী তাঁদের কাছে আমার এ মত উপস্থিত করাই ধৃষ্টতা। কেন না তাঁদের পক্ষে সমস্ত দেহটা

আত্মা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলেই বা কি আর সমস্ত আত্মটা দেহ হয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেলেই বা কি—ও-দুয়ের একই ফল, অর্থাৎ—সমাধি। কিন্তু তুমি যদি লীলাবাদ মান তবে আমার কথাগুলো এক দৃষ্টিতেই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে না দিয়ে একটু বিচার করে দেখবে কি?

(৬)

তোমাকে নিশ্চয়ই আজ আমাদের এই নব জাগরণের যুগে, যখন আমরা সবাই সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে এমন কি বেকাজে পর্য্যন্ত গীতার শ্লোক আওড়াই তখন একথা নতুন করে জানিয়ে দিতে হবে না যে আমাদের দেহের চাইতে মন বড়, মনের চাইতে আত্মা বড়, অর্থাৎ—যা যত বেশি অদৃশ্য তা তত বেশি প্রধান। এ তিনের মধ্যে আত্মা জিনিষটা এত অদৃশ্য যে বিদ্যাপতির ভাষায় "লাখে না মিলিল এক", কে তার খোঁজ খবর পায়? সুতরাং ঐ আত্মার কথাটা ছেড়েই দেওয়া যাক। বাকি রইল দেহ ও মন, এ দুয়ের মধ্যে মন বড়। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই, অর্থাৎ—যাঁরাই হিন্দুসমাজে বসবাস করছেন, তাঁদের এই মন নামক জিনিষটি interned হয়ে আছে। শাস্ত্রীয় বালুর চরে এই internment-এর camp, চারদিক সঙ্গীন কাঁধে শ্লোক-পুলিশ পাহারা দিচ্চে। এই internment ভেঙেছ কি, একেবারে সমাজ থেকে নির্ব্বাসন। এখন মনকে যদি দেহের চাইতে বড় বলে মান তবে দেহের internment-এর চাইতে মনের internment অবস্থা যে সাংঘাতিক একথা তোমাকে লজিকের খাতিরে মানতেই হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে হাজারে ন'শ নিরানব্বুই

জনার ওটা খেয়ালেই আসে না। তার কারণ মনের internment অবস্থা দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এবং ঠিক সেই জন্যেই ওটা বেশি মারাত্মক। কিন্তু আর যারই যাহোক, আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে জ্ঞান হওয়া থেকে মনের interned অবস্থা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি।

উপরে আমি কেবল তোমার কাছে থিওরিই দাখিল করেছি সুতরাং তার ব্যাখ্যা দিতে আমি ন্যায়ত বাধ্য।

জন্ম থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন যে কেমন ভাবে চালিত হয় তার রঙ্গ-রসহীন ইতিহাস এখানে তোমায় না হয় নাই দিলুম। উপরে যে থিওরি দাখিল করেছি, কেবল আমার জীবনের দুটি ঘটনা দিয়ে তার একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করব। সেই যে দুটি ঘটনা তা সমাজের কাছে হয়ত অতি অকিঞ্চিৎকর, এমন কি নেহাৎ বাজে, কিন্তু আমার কাছে তার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। এ দুটি ঘটনা ঘটলে সমাজের কোনো ক্ষতি হত না অথচ আমার পরম লাভ হত। এ দুটি ঘটনার কথাই তোমার জানা আছে। প্রথম আমি বিলেত যেতে চেয়ে ছিলুম আর দ্বিতীয়টি হচ্চে এই যে আমি তোমার ভগ্নিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওর প্রথমটি ঘটল না, কারণ পূজ্যপাদ তোতারাম স্মৃতিশিরোমণি মহাশয়— যাঁকে আমার দাদামশাই ইষ্টদেবতার মত দেখতেন—তিনি স্পষ্ট করে আমার ঠাকুরদা'কে শুনিয়ে বলেছিলেন যে নোনাজলের গন্ধ যার নাকে ঢোকে তার এদিকে ওদিকে অর্থাৎ—ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম গোপা-গাঁথা একশ' তিরাসি পুরুষের বুড়ো বুড়ী ছেলে মেয়ে আণ্ডাবাচ্চা সবা-রই নরকবাস নিশ্চয়। আর ওর দ্বিতীয়টি ঘটল না তার কারণ আমার

নাম শ্রীমান্ অশান্তকুমার "ভট্টাচার্য্য" আর তোমার বোনের নাম শ্রীমতী শান্তিলতা "গুপ্তা"। এর মানে হচ্চে এই যে, আমার মধ্যে মন বলে যে একটি জিনিষ আছে সেই মনের দুটি বিশেষ চিন্তা, দুটি heroic ইচ্ছা যার জন্যে আমি নিজে দায়ী, সেই দুটি চিন্তা কর্ম্মে অনূদিত হল না বাইরের চাপে, সমাজের চাপে। মন বিরক্ত হয়ে বললে—এই ত তোমার সমাজ, এখানে কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দেওয়াই প্রশস্ত, এখানে চিন্তা করতে যাওয়াই ঝকমারি, এখানে মন যদি জাগে, মন যদি সংকীর্ণ জায়গা থেকে একটুকু ফুটে ওঠে অমনি চারদিক থেকে সমাজ তাকে চাপতে থাকে। এমন অবস্থায় মন বেচারী কি করে, সে ঘুমিয়ে পড়ল, মন যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন জীবন বললে—মন যখন ঘুমল তখন আমি আর জেগে থেকে কি করব। তখন সে চোখ বুঁজে দিব্যি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। চারদিকে বাইরে কত না হৈ চৈ কত না হাসিকান্না রাগ। চোখ-বোঁজা জীবনের কাছে সে সব স্বপ্নের মত এসে পৌঁচতে লাগল।

কিন্তু সে যাহোক এইখানে বাঙালীজাতি আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছে সে-অবস্থায় যে শ্রীমান্ ভট্ট ও শ্রীমতী চট্টোর বিয়ের, সঙ্গে শ্রীমান্ "ভট্ট" ও শ্রীমতী "গুপ্তা"র বিয়ের, কি মানসিক কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কি ব্যবহারিক কোনো দিক থেকে একটুকুও প্রভেদ নেই কিম্বা আমি বিলেত গেলেই যে সমস্ত ভারত মহাদেশটা ভারত মহাসাগরের নীচে তলিয়ে যেত না—এসম্বন্ধে আমি তোমাকে লম্বা বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে পারতুম, যে বক্তৃতাতে স্বপক্ষ বিপক্ষ দুয়েরই রক্ত গরম হয়ে উঠত ; কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র চিঠির পৃষ্ঠা ত তোমার গোলদীঘিও নয়, গড়ের মাঠও নয়। সুতরাং

অসাধারণ শৌর্য্যে সে-লোভ সম্বরণ করে ঐ যে দুটি ইচ্ছা আমার সম্পাদন হল না তার ভিতরের দিকটার একটা কথা তোমায় বলব।

এইখানে আমি তোমার কাছে স্পষ্ট করে কবুল চাচ্চি যে, আমি বিলেত গেলেই যে আমার সুমুখে শক্ত দুটো শিং বা পিছনে লম্বা একটা লেজ গজিয়ে যেত বা তোমার বোনকে বিয়ে করলেই যে হোমরুল ফলটা—যা আজ ভীষণভাবে ডানে বাঁয়ে দুলছে, তা টক্ করে বোঁটা ছিঁড়ে আমাদের একেবারে নাকের ডগার উপরে এসে পড়ত, তা নয়। কিন্তু ঐ যে দুটি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাজ দাঁড়ালে—এই ঘটনাটার পিছনে একটা principle আছে, যেটা সমাজের পক্ষে মারাত্মক। এই principle-টা হচ্চে এই যে, সমাজ তার প্রত্যেক সভ্যদের বলচে—দেখ তোমাদের ভাবতে হবে না, চিন্তা করতে হবে না, কোন বিষয়ে ইচ্ছা করতে হবে না। আমি আছি, আমার বাঁধা নিয়মের পাকা সড়ক দিয়ে চলে যাও, তাতেই তোমার মোক্ষ।

এই বন্দোবস্তে প্রথমত মানুষ নামক জীবটি ব্যর্থ হয়ে উঠছে, কেন না মানুষ ত কল নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা আছে, ইচ্ছা আছে, Will আছে—কিন্তু সমাজ মানুষের এই সকলের মুক্তগতি দিতে নারাজ। সমাজ বলচে—মানুষ তোমার মন চাই নে, বুদ্ধি চাই নে, কল্পনা চাই নে, ইচ্ছা চাই নে, Will চাই নে—চাই তোমার স্মরণশক্তি, চাই তোমার মুখস্ত করবার বিদ্যে। এই রকম করে সমাজ যখন তার সভ্যদের কেবল হুকুম তামিল করবার যন্ত্র করেই তুলচে—এর শেষ কুফলটা আবার গিয়ে সমাজের বুকেই বাজচে।

সমাজ নামক জিনিষটিকে যদি বিশ্লেষণ কর তবে দেখবে যে, সমাজ প্রাণবস্তু, সমাজ শক্তিমান। আসলে সমাজ আর যাই হোক বহুব্রীহি সমাস নয়। সমাজ প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকেই তার শক্তি সামর্থ্য জ্ঞান ইত্যাদি আহরণ করছে। সুতরাং যখন সমাজের সকল সভ্যই, কি মনের দিক থেকে কি চিন্তার দিক থেকে কি কল্পনার দিক থেকে কি শক্তির দিক থেকে, একেবারে শূন্য; তখন সমাজ তাদের কাছ থেকে কেবল শূন্যই লাভ করতে পারে। আসলে জড়জগতে ও মনোজগতে একটা প্রভেদ আছে। দশখানা কঞ্চি একত্র করলে তা বাঁশের মত মোটা ও শক্ত হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু দশজন বোকাকে একত্র করলে একজন স্যর অ্যাইজ্যাক নিউটন হ'য়ে উঠে না।

সুতরাং চাই ব্যক্তিগত মানুষের মুক্তি—তার চিন্তার মুক্তি, কর্ম্মের মুক্তি—এই মুক্তির ভিতরে যে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার আনন্দে প্রত্যেক মানুষটি তার সমাজকে আনন্দময় করে তুলবে, তার প্রাণের গতিতে মনের কল্পনায় বুদ্ধির দৃষ্টিতে সমাজকে পূর্ণ করে তুলবে—তখনই আমরা দেখতে পাব সমাজ-দেবতা একটা কাঠের পুতুল নয় বা East End Co-র দম দেওয়া ঘড়ি নয়—সে দৃষ্টিবান, জ্ঞানবান ও শক্তিমান। এই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সমাজ সত্যকে পাবে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে প্রেমকে পাবে ও শক্তির ভিতর দিয়ে সম্পদ ও গৌরবকে লাভ করবে।

লিখতে লিখতে চিঠি প্রকাণ্ড হ'য়ে গেল। সময়ও যায়। কাজেই এখানেই দাঁড়ি টানলুম। কেন না তোমাকে আমি একটা

example set করতে চাই। সে example-টা হচ্ছে এই যে, ভদ্র-লোকের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তার উত্তর সাড়ে চার মাস দেরী না করে' সেই দিনই দেওয়া। ইতি—

তোমার চিরকেলে

অশান্ত।

শিল্পী।

———:০:———
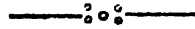
শিল্পী ছবি আঁকত।

রাজার সেগুলো পছন্দ হ'ত না; সভাসদগণের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠ্‌ত; নাগরিকেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

শিল্পীর তবুও ছবি আকার বিরাম ছিল না।

*   *   *   *   *

কিন্তু এমন একদিন এল যখন শিল্পীর অনশন-ক্লিষ্ট হাত হ'তে তুলিকা আপনিই খ'সে প'ড়ল।

গৃহলক্ষ্মী ব'ললেন—রাজার কাছে যাও; তাঁর কৃপাকটাক্ষে তোমার সকল অভাব দূর হ'য়ে যাবে।

মানস-প্রিয়ার আধ-আঁকা ছবিখানি তুলে রেখে শিল্পী রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বল'লেন—উদ্যানবাটিকার ভিত্তিগাত্রে আমার পূর্ব্বপুরুষ-গণের কীর্ত্তিকাহিনী তোমার তুলির মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

সভাসদেরা আশ্বাস দিলে—আশাতীত পুরস্কার পাবে।

নাগরিকদের আশা হ'ল—দেয়ালজোড়া ছবি দেখে চক্ষু সার্থক করবে।

রাজপ্রসাদতুষ্ট হাতে শিল্পী আবার তুলিকা তুলে নিলে।

*　*　*　*　*

শতেক রাজার মুখচ্ছবি ভিত্তিগাত্রে ফুটে উঠ্‌ল; অমাত্যদের ভাবহীন মুখের ছায়া অলিন্দের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল; নাগরিকদের প্রাণহীন মুখের রেখা শোভাযাত্রার মধ্যে ছড়িয়ে রইল।

শিল্পীর কাজ সাঙ্গ হবার পর—

রাজা তাকে শিরোপা দিলেন; সভাসদেরা দিলে—বাহবা; নাগরিকেরা দিলে—অভিনন্দন।

শিল্পীর মুখ গর্ব্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল।

*　*　*　*　*

শিল্পীর বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তার মানস-প্রিয়ার অর্দ্ধসমাপ্ত মুখখানি রেখায় সমাপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল না—শিল্পীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও।

রংএর সঙ্গে রং মিশ্‌ল, রংএর 'পরে রং পড়ল; কিন্তু মুখের সে মৃত্যু-বিবর্ণ ভাব কিছুতেই ঘুচল না।

শিল্পী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে, বিত্ত সম্পদ দূরে ফেললে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিলে; কিন্তু সে মুখে প্রাণের আভাষ ফুটে উঠ্‌ল না।

*　*　*　*　*

শিল্পী তখন কলাদেবীর দ্বারস্থ হ'ল।

দেবী বললেন—শিল্পীর বুকের রক্ত দিয়েই আমি তার মানস-প্রিয়ার মুখে জীবনের আভা ফুটিয়ে তুলি; শিল্পীর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তার মানস-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি।

শিল্পী বললে—আমার সেই শ্রেষ্ঠ বলি আজ গ্রহণ করুণ।

দেবী উত্তর করলেন—তা' তো পারি না। স্বর্ণমুদ্রার রঙে যে দিন তুলি রাঙিয়ে ছিলে, সে দিন হ'তে তুমি মৃত। তোমার আত্ম-বলিদানে অধিকার নাই, ফলও নাই।

শিল্পীর সংজ্ঞাহত হাত থেকে তুলিকা খসে পড়ল। আর মানস প্রিয়ার প্রাণহীন মুখ শূন্যে চেয়ে রইল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

ভারতের নারী।

—:*:—

শ্রীযুক্ত "সবুজ পত্র" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ভাদ্র-আশ্বিনের সবুজপত্রে "ভারতের নারী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সম্পর্কে আরও গুটীকতক কথা বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি সুলেখক হইবার যোগ্যতা রাখি না অথবা সেরূপ উচ্চাশাও মনে পোষণ করি না। সুতরাং আমার বক্তব্য আপনাদের পত্রে স্থান পাইবে কি না জানি না। তথাপি সত্য অপ্রিয় হইলেও প্রকাশনীয় ও মাননীয় এই বিশ্বাসে অগ্রসর হইলাম।

আজকাল খবরের কাগজ পড়িলে ও "দেশসেবী"দিগের বক্তৃতা শুনিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে পড়ে। এখনকার শঙ্খ ভেরী, তুরী, দামামা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দে কর্ণ বধির হয়; এবং ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির বর্ণিত বিক্রম আধুনিক বীরদিগের শৌর্য্য বীর্য্যের কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। "ভারতের নারী" প্রবন্ধে যে মহাবীরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎশ্রেণীভুক্ত সকলের চোখে যদি আগুন থাকিত, তবে বোধ হয়, ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্র সিংহ প্রভৃতিকেও ভস্ম হইতে হইত। অস্ত্র আইন আছে বলিয়া চোখের আগুনের কথা বলিলাম, ইহাতে বীরত্বের অবমাননা হইল, কিন্তু উপায় নাই। ভারতের নারী সম্বন্ধে এই

"দেশসেবি"গণের মত ও বক্তৃতা আকাশেরও ঊর্দ্ধে উঠে। মাতৃত্বের গৌরবস্থল, ত্যাগের আদর্শ, সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রভৃতি বহুবিধ মহান্ আখ্যা দ্বারা স্ত্রীজাতির গৌরববর্দ্ধন করিলেই যদি তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইত, তবে ভারতের নারী সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজনই থাকিত না। অনেক সময় গলাবাজী করিয়া মামলা জেতা যায়, কিন্তু তাহাতে সত্যকে বিচলিত করা যায় না। বার তের বছরের বালিকার মাতৃত্ব লইয়া বাগাড়ম্বর ও দেশের ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার এক ভারত ব্যতীত ও হিন্দুসমাজ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য বা অসভ্য সমাজে বা দেশে প্রচলিত আছে কি না সন্দেহ। পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির দক্ষতা ভগবান আমাদিগকে কি উদ্দেশ্যে দিয়াছেন জানি না, তবে এটা ঠিক কথা যে আমি চোখ বুজিলেই আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না, ইহা পাগলছাড়া অপর কেহ মনে করে না। নারীকে আমরা কত বড় গৌরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তাহা দু একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই বুঝা যায়। এই সে দিন কলিকাতা সহরে পুলিস এক পথভ্রষ্টা, অপহৃতা দশ বৎসরের বালিকাকে উদ্ধার করার পর, তাহার শ্বশুর ও স্বামী স্বীয় পবিত্রতা অটুট রাখিবার জন্য তাহাকে গ্রহণ করা উচিত মনে করিলেন না। হিন্দু আইন, ব্যবহার ও আচার, সকলই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অনেক নীচে রাখিয়াছে। দেশে গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতেই ইহার প্রমাণ আছে। বাগবাজীদ্বারা এতবড় স্পষ্ট সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। সতীদাহ নিবারণের সময় গোঁড়া হিন্দুসমাজ রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরাট সভা করিয়া যে বহু-স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদের দরখাস্ত বিলাতে পাঠাইয়া ছিলেন তাহা মনে করিলে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন

লজ্জিত হইতে হয়। ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে পল্লীগ্রামে এখনও এমন সংসার আছে যেখানে আহার ও রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে নারী পুরুষের সমান যত্নের পাত্র বিবেচিত হয় না। এই সব জানিয়াও ইংরাজদের চেয়ে আমরা যে কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া কেহ কেহ গলার জোরে রাত কে দিন করিতে চান। অনেকস্থলে দেখা যায় পবিত্র স্বামী একটু খুঁত পাইলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিব বলিয়া ভয় দেখায়। তিনি তাহা করিলেও অসহায় নিরপরাধিনী সমাজের দয়ার দাবী করিতে পারে না। কার্য্যত স্ত্রীজাতিকে যে এ সমাজের কোন্ স্থানে বসাইয়াছি, এই গেল তাহার এক প্রমাণ।

নারীর পাপের কথা বিশ্বাস করিতে আমরা যত প্রস্তুত ও উৎসুক এত আর কেহ নয়। ভারতের নারী বিলাতের নারীর অপেক্ষা বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা পায় একথা খুব জোর করিয়া যিনি বলিবেন তাঁর ধীরতার খুব অভাব আছে বলিতে হইবে। আমরা নারীর সত্য বা মিথ্যা, কোনরূপ দোষ পাইলেই তাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, এরূপ আর কোন দেশে আছে কি? পুরুষের সাত খুন মাপ; তৃতীয় চতুর্থ পক্ষও অনায়াসে চলিতে পারে, কিন্তু বালবিধবা নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের আগুনে পুড়িয়া মরিবে আর আমরা বড় গলায় ও হাততালি দিয়া বাহবা দিব, এ দৃশ্য ভারত ছাড়া কোথাও নাই। আজকাল স্বদেশকে ভালবাসি না একথা কেহ বলিতে চাহেন না। এ বেশ কথা, কিন্তু সমাজের অঙ্গে যে গলিতকুষ্ঠ দেখা যায়, তাহাকে সযত্নে ও সম্মানে ঢাকিয়া রাখিলে দেশের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হবে। স্বদেশপ্রেমের নামে

দেশের কঠিন রোগগুলিকেও যে কেহ কেহ ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা মরণেরই লক্ষণ। ইংরাজের উপর চোখ রাঙাইলে অথবা দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া বাহাদুরী নিলে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের চেয়ে আমরা কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া যদি নিজের দুর্ব্বলতাকে পরাক্রম, ব্যাধিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ, ও কুবুদ্ধিকে বিজ্ঞতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি, তবে ইংরাজের কোন লোকসানই নাই। তাহাতে আমাদের বিকারই প্রমাণিত হইবে।

এইত গেল নারীর কথা। ভারতের নরের কথাও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। লণ্ডনে সংস্কার আইন (Reform bill) গঠিত করিবার জন্য যে সমিতি (Joint committee) বসিয়াছে তাহাতে সাক্ষ্য দিবার সময় কে একজন বলিয়াছিলেন যে ভারতের বর্ত্তমান সমাজ উল্টান পিরামিডের (pyramid) মত মাথা-ভারী। কথাটা শুনিয়া আমাদের রাজনৈতিক পাণ্ডারা—বর্ষাকালে ভেককূলের মত তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কথাটা কি একেবারে মিথ্যা? প্রাচীনকালে ভারতবাসীর সত্যই ছিল চরিত্রের মূলভিত্তি। এখন কিন্তু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য মিথ্যার প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কার আইন এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে খবরের কাগজে প্রবন্ধ পড়িলে বোধহয় যে নিজের কোটকে বজায় রাখিবার জন্য সব পক্ষই মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া মামলা ফতে করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর্জ্জীদলিলে কোন খুঁত না থাকিলেই হইল, মোকদ্দমা যদি মিথ্যাও হয় তবু মিথ্যাসাক্ষী যোগাড় করিয়াও জিতিতে হইবে, এই চেষ্টাই সব রাজনৈতিক গণ্ডগোলের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। যেহেতু

আমরা সাহেবদের দেশের মত শাসনপ্রণালী চাই, অতএব আমরা জোর করিয়া বলিব যে দেশের চাষাভুষা পর্য্যন্ত সংস্কারের অপেক্ষায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে ; কারণ ইহা না বলিলে যদি না পাই। অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে রাজা সাজিবার সময় মুখমণ্ডলে নানা-রকম রং প্রলেপ দেয় এবং ভাড়া-করা রাজপোষাক পরে। সেইরূপ নেতা-নামধারী অনেকেই পাশ্চাত্য দর্শকের মন ভুলাইবার জন্য জীর্ণ, ক্ষতযুক্ত সমাজদেহকে বহু পুটিং দিয়া সাজাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ভেদবুদ্ধি ও অন্ধ-কুসংস্কার এখনও দেশে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে, কেহ কেহ স্বজাতি-প্রেমের ভাণ করিয়া এই সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেছেন। প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে ছোট ছোট এমন গণ্ডী আছে যাহার সীমা লঙ্ঘন করা অসমসাহসের কার্য্য ; কিন্তু এসকল দেশ-উদ্ধারকারীদের বিবেচনার মধ্যে আসে না। অল্পসংখ্যক লোক ইংরাজী শিখিয়া চীৎকারে গলা ফাটাইয়া বলিতেছে, "ইংরাজের সমাজে যেমন সাম্য আছে, আমাদেরও তেমনি আছে, আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দাও।" এদিকে বাংলার গ্রামে গিয়া দেখ, সমাজ যাহাদিগকে অতি নীচ ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কি দুঃখ দৈন্য কি নির্জীব জীবন। হিন্দুসমাজ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বহু কষ্ট ও চেষ্টাদ্বারা নিজের পায়ে পক্ষাঘাত আনিয়াছে। রোগ যত কঠিন হইতেছে বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাহার প্রলাপও তত বাড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লেপ্টেনেণ্ট উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের মুখে ধাবিত দেখিয়া দু'একটী অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতে গিয়া গোঁড়াদের এমন কি অনেক "দেশহিতৈষীর" তিরস্কার ও বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক প্রকার উন্মাদ

রোগের বর্ণনা আছে, কিন্তু এরূপ উৎকট রোগ চিকিৎসকদের জ্ঞানেও আসে নাই। হিন্দুসমাজ জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় জলে পড়িয়া মরিতে চায়, বারণ করিলে তাড়িয়া আসে। কয়েকজন লোক লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং ইংরাজের সঙ্গে তর্ক করিতে পারে আর সমাজের সকল শ্রেণীর লোক অশিক্ষিত, অসার, নির্জীব, এ সমাজের তুলনা উল্টান পিরামিডের সহিতই হয়। চক্ষু খুলিয়া দেখিলে সকলেই দেখিবেন হিন্দুসমাজে বাঙ্গালী শ্রমজীবির সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। নৌকার মাঝি, কলের মজুর, চাষা, কুলী প্রভৃতি বলিষ্ঠ শ্রমজীবী বাঙ্গালী লোপ পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুসমাজের মাথাটী মোটাই আছে, হাত পা নাই বলিলেও চলে। দেশের সমাজের যারা মেরুদণ্ড, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবি। তাহাদের শিক্ষার ও উন্নতির কোন চেষ্টাই নাই, তাহারা সমাজের লাঞ্ছনা ও অবমাননা এখনও সহ্য করিতেছে, আর জন কয়েক লোক তাহাদেরই প্রতিনিধি সাজিয়া হৈ চৈ করিতেছে। সমাজ নিজের প্রতি কর্ত্তব্যে উদাসীন নিজের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার বিষয়ে অন্ধ, অথচ মুষ্টিমেয় লোক নেতা সাজিয়া গোলমাল করাকেই কর্ত্তব্য মনে করিতেছে, যেন ইংরাজকে গাল দেওয়াই স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। যাহারা গলাবাজিতে পটু এবং বিলাত গিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত তাহারা কি বাংলার পল্লীস্বাস্থ্য ও এক শ্রেণীদ্বারা অপর শ্রেণীর উপর অত্যাচারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন? যাহারা নিজের দেশভাইকে সর্ব্ববিষয়ে নিজের সমান জ্ঞান করিতে শিখে নাই, পরের কাছে নিজেকে জাহির ও স্বীয় দোষ গোপন করাই যাহাদের কার্য্য—বিধাতা তাহাদের শাসন হইতে দেশকে রক্ষা করুন। নারীর অসহায় অবস্থার সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর

অশিক্ষিত লোকের অসহায় অবস্থার অনেক সাদৃশ্য আছে। দেশকে ভালবাসিতে হইলেই যে দোষকেও ভালবাসিতে হইবে একথা কোন শাস্ত্রে নাই। "আমি তোমার চেয়ে খাটো না" একথা বলিবার পূর্ব্বে নিজেকে একবার মাপিয়া দেখা উচিত। আমি বড় কি ছোট তাহা আমার চেয়ে পরেই ভাল বলিতে পারে। মানুষ নিজেই যদি নিজের সুবিচার করিতে পারিত তবে অপর বিচারকের দরকার হইত না।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নড়াল কলেজ

২৪ নভেম্বর ১৯১৯।

আলো ও ছায়া।

——:০:——

বীণাকে কথা দিয়েছিলাম বড়দিনের সময় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাব। তাঁর সাধ হয়েছিল পোষকালী দেখে পুণ্যসঞ্চয় করবেন—আমার সখ চেপেছিল কংগ্রেস দেখব।

যথাসময় বীণা আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। জবাব ঠিকই ছিল—আমি বললাম কথাটা আমারও মনে আছে, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার ভয়েই সেটি রাখতে পারছি নে।

—ও সব ছুতো শুনতে চাইনে আমি।

—এটা কি একটা ছুতো হল? খবরের কাগজখানা পড়ে দেখ দেখি একবার।

—ও সব বাজে পড়া রেখে এই চিঠিখানা আগে পড়—বলে' বীণা আমার হাতে একখান চিঠি দিলেন।

—এ কি? তোমার দাদার লেখা যে! ওঃ তুমি একেবারে ডাক্তারের সর্টিফিকেট হাজির করেছ সঙ্গে সঙ্গে।

—করব না? তুমি যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে নাকি?

—আচ্ছা দেখি সতীশ কি লিখেছে।

পড়ে' বুঝলাম চিঠিখানা বেনামীতে আমাকেই লেখা। সতীশ লিখেছে যে কলকাতায় অসুখ হচ্ছে বলে' যদি কারো ভয় হয়, সে

বাইরের লোকের—যাঁরা শুধু খবরের কাগজ পড়ছেন। সে আরও লিখেছে যদি কলকাতায় আসার মতলব থাকে, তবে অসুখের ভয়ে পিছিও না, কারণ বছরে এমন দিন এবং জগতে এমন স্থান পাওয়া যাবে না, যখন মানুষ মরবে না বা যেখানে তার অসুখ হবেনা।

অগত্যা আমাকে হার মানতে হল।

আমি কলকাতায় যাব শুনে বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, এমন কি ভূষণ এসে স্পষ্টই বল্‌লে—তুমি ক্ষেপেছ না কি ?

—কেন বল দেখি ?

—কলকাতায় যাচ্ছ এই সময়ে—তাও আবার যাচ্ছ সপরিবারে !

—হাঁ, তা যাচ্চি বটে, কিন্তু ক্ষেপি নি—

—তার বড় বাকীও নেই। যত লোক কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, আর তুমি যাচ্ছ সেখানে মজা দেখতে।

—পালাবে কোথা ভাই—পালিয়ে কি নিষ্কৃতি আছে ? এখানেও কি লোক মরছে না ? বরং খতিয়ে দেখলে বুঝবে লোক এখানেই বেশি মরছে।

—তা হয়ত সত্য, কিন্তু এ হ'ল দেশ, আর সে—

—কলকাতাও রাজধানী। বাঙলা দেশের সেরা জায়গা।

অতঃপর হতাশভাবে ভূষণ বল্‌ল—অর্থাৎ তুমি যাবে।

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম হাঁ।

—তবে বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু সাবধান ভাই, বেশি দিন থেকো না এবং সাবধানে থেকো।

—সাবধানে থাকতেই হবে কারণ প্রাণটা ঠিক পড়ে'-ত পাওয়া নয়। আর—

—কবে ফিরবে ?

—তার ঠিক নেই, তবে মিছামিছি দেরী করব না। যাচ্ছি বেড়াতে, সখ মিটে গেলেই ফিরব।

কলকাতায় গিয়ে দেখলাম সতীশের কথাই ঠিক। বোধ হয় না যে সহরে মারীভয় হয়েছে।

তিন চার দিন বেশ কাটল। ভয় ও ভাবনার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। শুধু সকালবেলা খবরের কাগজ পড়বার সময় একটু ভাবনা হ'ত। কিন্তু ভয়ের খবর তাতেও ছিল না। অসুখ দিন দিন কমে আসছিল।

হঠাৎ তারপর একদিন বিকেলের দিকে বীণার শরীরটা খারাপ বোধ হল, পরদিন দেখেশুনে সতীশ গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—তাইত—

আমি জিজ্ঞাস করলাম—কি দেখলে ?

—নিউমোনিয়া হয়েছে—সাবধানে থাকতে হবে।

খুব সাবধানেই থাকা হ'ল—ভাল ডাক্তার দেখ্‌ল, দামী ওষুধ পড়ল কিন্তু কোন ফল হল না।

বীণাকে ধরে রাখা গেল না।

ছেলে মেয়ে চুটিকে সেখানেই রেখে পরদিন সকালের গাড়ীতেই আমি কলকাতা ছাড়লাম।

গাড়ী ছাড়বার তখন একটু দেরী ছিল। কামরার ধারে সতীশ চুপকরে দাঁড়িয়েছিল। ভিতরে আমিও তেমনি বসেছিলাম।

সামনে একটী ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন—আঃ বাঁচা গেল, ইনফ্লুয়েঞ্জাটা তাহলে গেল এতদিনে।

চকিতের মত তাঁর দিকে চাইতে তিনি কাগজখানা আমার সামনে ধরে আবার বললেন—এই দেখুন মশাই, কাল মোটে একটা মরেছে। এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ধীরে ধীরে আমার হাতখানা নিয়ে সতীশ শুধু তার হাতের মধ্যে চেপে ধরল।

ঝাঁপ দিয়ে পরক্ষণেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

প্রবোধ ঘোষ।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

—:*:—

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে আমারি পরিচিত কোন স্থানে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হতে একটি ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়ে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে অনেক-গুলি নরনারী হত্যা করেছে, এই সংবাদ পেলাম। লোকজনে ভারী ভয় পেয়ে গেল, পাহাড়ে জঙ্গলে তাদের কাঠভাঙা, ফল কুড়িয়ে আনা, একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বল্লেই হয়। নিজে অলক্ষ্য থেকে শীকার ধরবার পক্ষে সেই ব্যাঘ্রটির বিশেষ সুবিধাজনক, অনেকগুলি জায়গা জুটেছিল। যে পথ বেয়ে গরুর গাড়ীর সারি ঘুরে ঘুরে আসে সেইখানে লুকিয়ে বসে তিনি অনেক বলি সংগ্রহ করেছেন শুনলাম। তিনি বাঘিনী হলেও শীকারী কম ছিলেন না, গাই বলদ ছাগল ভেড়া সবই উজাড় করছিলেন। স্থানীয় শীকারী তাকে মারবার বেশ একটি সুযোগ পেয়ে-ছিল, সন্ধ্যেবেলায় সে তখন মৃত গরুটি ভক্ষণের চেষ্টায় ফিরছিল, কিন্তু বেচারা শিকারীর কাছে যে কার্ত্তুস (cartridge) ছিল তাতে আওয়াজ হয় নি, বাঘিনী সেই যে চম্‌কে পলায়ন দিলে, আমরণ সে আর প্রলো-ভনে ভোলে নি বা ফাঁদে পা বাড়ায় নি। কাজের শিকলে আমরা যেমন বাঁধা, তাতে স্বাধীনভাবে আনন্দের সন্ধানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ

নয়, যদিও একথা বড় একটা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না জানি, কেননা আইন ব্যবসায়ের নাম স্বাধীন-ব্যবসা। সে যাই হোক ব্যবসায়জীবীর জীবন স্বাধীন নয়, কেননা তিনি মক্কেলের কাছে বাঁধা। যার পয়সা খান, তার কাজ না বাজিয়ে, তাঁর আর কোন দিকে মনোযোগ করবার সুযোগ হয় না। আমি মাঝে মাঝেই কাজের মধ্যেই খেলার সুযোগ করে নি, তাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়, গাঁটের কড়িও মন্দ খরচ হয় না (আর একথা আগে হতেই বলে রাখা ভাল, এ বস্তুর প্রাচুর্য্য আমার বড় একটা নেই)। থলির অর্থ আর দেহের সামর্থ্য যথেষ্ট ব্যয় করে মফঃস্বলে মামলা করতে গিয়ে সপ্তাহান্তে যে দুদিন কাছারী বন্ধ থাকে আমি সেই অবসরে দু' একবার শিকারের যোগাড় করেছি। মনিব্যাগ খালি হয়েছে বটে কিন্তু শীকারের ঝোলায় বাঘ ভরেছি। একবার একজন জজ মজা করে আমায় বলেছিলেন মফঃস্বলে আমার দুই শীকারই জোটে—এক মক্কেল, দ্বিতীয় বাঘ। তাঁর বোধ হয় মনে হয়েছিল, পুরাণ ব্যাধির মত এ দুটোই আমায় পেয়ে বসেছে। আমি যখন প্রথম ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আরম্ভ করি তখন আমার দু'একজন হিতৈষী মক্কেলদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন আইনের চেয়ে শীকারেই আমার বুদ্ধিটা খেলে ভাল। যে সব মানুষের শীকার-বাতিক আছে, ইংরাজ তাদের প্রতি একটু পক্ষপাতী। ছুটির সম্বন্ধে মফঃস্বলের কাছারীর চেয়ে হাইকোর্টে আমাদের ভাগ্য ভাল, সেখানকার মত চাঁদ দেখে এখানে মুসলমান পরবের ছুটি হয় না আর তা ছাড়া সৎ খৃষ্টানের মত তাঁরা একদিন ছেড়ে দুদিন কর্ত্তব্য বোধে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে থাকেন। সেবারে দোলের সময় এই সূত্রে আরো দিন কত বেশি ছুটি পাওয়া গিয়েছিল।

তবে এই সব অল্পদিনের ছুটির মুস্কিল এই যে, আপনাকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া চলে না, মনের মধ্যে কাজের ফাঁসটা টানাই থাকে, বেশ হাত পা ছড়িয়ে কিছু করা ঘটে না।

শীকারের লোভে K. G. B. পথের ধারে একটা ষ্টেশনে এসে, আমার সঙ্গ ধরলেন। রাতদুপুরে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম, আর যাদের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তাঁরা পোঁটলা পুঁটলি সমেত আমাদের থানায় নিয়ে তুললেন। এমন নিরাপদ স্থানে আমাদের প্রথম আর সবেমাত্র রাত্রিবাস। লোহার গরাদে-দেওয়া বারান্দাটি স্থান-মাহাত্ম্য প্রচার করছিল। আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবার পর, একজন হাসতে হাসতে কোথায় এসেছি, সে কথা আমাদের জানালেন। শুনে আমার বন্ধুর যে হাসির ফোয়ারা ছুটল তা আর বন্ধ হ'তেই চায় না। তাঁর যেন হাসির হিষ্টিরিয়া হয়ে পড়ল, আমি তাকে বোঝালাম —

Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage.

কারাগার হলেও নির্দোষী আমাদের কাছে সেটি শান্ত আশ্রমপদ বলেই মনে হয়েছিল।

ভোর হ'তে না হ'তে আমরা রাজকীয় সমারোহে যাত্রা করলাম। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর আধুনিক রথ, কিছুক্ষণ পরে ব্রিটিশরাজের একজন প্রহরী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করলে। আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে সে দশ ক্রোশ পথ এসেছিল। এঁর কিম্বা এঁরি মত লোকের হাত এড়িয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়।

তবু মনে করলাম আবার যদি এ পথে আসি, তবে যেন শীকারের সুবন্দোবস্তের জন্যে এম্নি কারো হস্তগত হ'বার সৌভাগ্য আমার ঘটে। অতঃপর হস্তিপৃষ্ঠে কয়েক মাইল যাবার পরই আমরা শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম। এর আগেই শীকার সন্ধানে লোক জড় করে চারিদিকে পাঠান হয়েছিল। শৈলমালাবেষ্টিত যে স্থানটিতে আমাদের শিবির সংস্থান হয়েছিল, সে যেন এক স্বপ্ন-রাজ্য। গোধূলির শ্যামচ্ছায়ায়, পাদপরাজি আচ্ছাদিত বনভূমি যখন স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত হয়ে এল, তখন চারিদিক হতে সাম্বর মৃগের ঘণ্টাধ্বনির মত আহ্বান রব, বারম্বার আমরা শুনতে পেলাম। সে যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরতির মঙ্গল বাদ্য।

বাঘিনী সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা জানলাম, সে হচ্ছে পাঁচ ছয় দিনের বাসি খবর, আমার বন্ধু সেটা সুবিধার কথা মনে করেন নি, আমার কিন্তু তার উল্টোটাই মনে এল। তবু উৎসাহের গায়ে এমন শীতল প্রলেপ বাঞ্ছনীয় নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। যাই হোক প্রভাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন, তাঁর হাসিমুখ দেখে আমাদের মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সংবাদ এল, সূর্য্যোদয়ের শুভলগ্নে খানিক দূরে বাঘিনী একটি স্ত্রীলোককে ভোগে লাগাবার উদ্যোগ করছিল, পারে নি, সে কোন রকমে একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হয়ে ব্যাঘ্রী একটি নালার মধ্য দিয়ে অন্য পথে যাত্রা করেছে। নালার পাশের ভিজে বালিতে তার পায়ের টাট্‌কা চিহ্ন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আর বনের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবার জন্যে যে পথে চলে গিয়েছে, সেখানেও তার পায়ে হতে ঝরে-পড়া বালি আর কাদার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নালার

পাড়ে লাফিয়ে উঠে যেখানে সে পাহাড়ে চড়েছে সেইখান হতেই তাকে অনুসরণ করে যাওয়া কঠিন হয়েছিল, কোথাও গড়িয়ে-পড়া একখণ্ড পাথর, কোথাও বা পায়ের চাপে মুচড়ে-পড়া সুকুমার লতা গুল্ম, কোথাও বা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ, এই দেখেই পথ আবিষ্কার করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সত্বর অগ্রসর হওয়া ঘটে ওঠে নি, কেননা স্থির নিশ্চয় না হয়ে, পা বাড়ান আমরা যুক্তি-সিদ্ধ মনে করি নি। দিনের আলোতে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রমটি ছেড়ে সে অধিক দূরে অগ্রসর হবে না জেনে নিঃশব্দ ধীর পদক্ষেপে আবার আমরা নালার কাছে ফিরে এলাম। নালার কাছে পলায়নের তিনটি ঘাট, তার দুটি ভিন্ন পথ ছিল। শেষের পথ দুটি নালা হতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল। ঘাট তিনটি একজন লোকেই পাহারা দিতে পারে।

আধ মাইল দূর হতে বাঘকে তাড়া দিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করা হল। আমি আট ফুট উঁচু একটি পাথরের উপর উঠে আমার বসবার মোড়াটি এমন জায়গায় রাখলাম, যেখান হতে তিনটি ঘাটই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার ডাইনে ও সম্মুখে আরো দুটি পাথরের ঢিবি, আর গুটিকত গাছও ছিল। ঘাটের পথ চেয়ে দু'চারিটি সরু গলি, এরি মাঝ দিয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পাথরের উপরে মোড়া পেতে বসেছিলাম। তার উপরে গুটিকত গাছ ছিল। গাছের ডালগুলি এম্নিভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম যাতে করে আমি আড়ালে থাকতে পারি, অথচ চারিদিক দেখবার কি বন্দুক চালাবার কোন অসুবিধা না ঘটে। কত সামান্য আড়াল হলেই যে লুকোবার সুবিধা হয়, শীকার তোমার পাশ দিয়ে অসন্দিগ্ধ ভাবে চলে যায়, তোমায় দেখতে পায় না, সে কথা সহজে বিশ্বাস হয় না; মানুষের গন্ধ হয়ত

বা পায় কিন্তু বেলা বাড়তে আরম্ভ করলে সে গন্ধও কম হয়ে আসে। আর তুমি যদি চুপচাপ বসে থাক, তাহলে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবার, ধরা পড়বার সম্ভাবনা বড় একটা থাকে না। প্রকাণ্ড একটা হিংস্র জন্তু পাশ দিয়ে যখন চলে যায় তখন স্থির হয়ে থাকা কঠিন কাজ কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার বলে, শীকারীর মজ্জাপেশী ক্রমে ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে ওঠে তখন কোথাও আর এতটুকু কাঁপে না কি নড়ে না। আমি যে জায়গাটি পছন্দ করে নিয়েছিলাম সেখান হতে চারিদিকে গাছপালা আর গলি ঘুঁজির জন্যে হাত বিশেক তফাতে গুলি করাটা তেমন নিরাপদ ছিল না। সেখানে আমার ডানে হতে পাহাড়টা গড়িয়ে নালার দিকে নেমে গিয়েছিল। K. G. B.-কে ছিলেন একখানি ছোট্ট খাটিয়া মাচান করে বেঁধে দেওয়া অন্য একটি পাহারার জায়গা, সেইখানকার একজন গোঁটিয়া তাঁর সঙ্গে ছিল—চট করে গাছে চড়ে পড়বার ক্ষমতা তার অদ্ভুত। আর তা ছাড়া স্থান যতই সঙ্কীর্ণ হোক না, সে তারি মধ্যে অবলীলাক্রমে আপন ঘুরবার ফিরবার সুবিধা করে নিত, কোন রকমে আড়ষ্ট হ'ত না। এই চতুর লোকটির তা ছাড়া বন্দুকের তাক্‌ও ছিল ভাল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রতীক্ষার পর, তবে বনের মধ্যে হতে যে সব শীকারীরা বাঘ তাড়া করে আনছিল, তাদের সোরগোল শোনা গেল, আরো কিছুক্ষণ সময় যাবার পর আদের মধ্যে জনকয়েককে পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেখলাম স্থূলাঙ্গী একটি ব্যাঘ্র ত্বরিত গমনে নালার মধ্য-ঘাট পার হয়ে আসছে, নিমেষের জন্যে সে প্রস্তরস্তূপের ব্যবধানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—পর মুহূর্ত্তেই তার মস্তক আর গ্রীবাদেশ দৃষ্টিগোচর হবা মাত্রই আমি তার স্কন্ধদেশ

লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লাম। সে আমার বাঁয়ে দশ গজ দূরে ছিল। আমার বন্দুক তুলতে সামান্য কি একটু শব্দ হয়েছিল, তাতেই সে ঘাড় ফিরলে, গুলি তার কাণের মধ্যে দিয়ে ঘাড়ে গিয়ে লাগল তৎক্ষণাৎ সে ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় গুলি মারবার জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম সে আর নড়চড় করল না, তখন বন্দুকের যে নল খালি হয়ে গিয়েছিল সেইটি আবার পুরে কি ঘটে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। শীকারীরা কয়জন পাহাড়ের মাথা হতে একটু নেমে আমার ডাইনের দিকে আর বাকী কয়জন সম্মুখে কিছু দূরে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ মৃগয়াভিনয়ের যবনিকা পতন না হয়, ততক্ষণ এ সাবধানতার বিশেষ আবশ্যক। জয়গর্বে উৎফুল্ল আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না, সঙ্কেত-সূচক বাঁশীটি বাজিয়ে দিলাম, তখনই চারিদিক হতে জয় জয় শব্দে মহাকোলাহলে সকলে সে সঙ্কেতের অভ্যর্থনা করল। K. G. B. আর গৌটিয়া দুজনেই আমার কাছাকাছি ছিলেন, সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে ব্যাঘ্র-রাজ-পত্নীর রাজ-যোগ্য অঙ্গচ্ছেদ আর বরাঙ্গের প্রশংসা করতে লাগলেন। পাহাড়ের মাথার উপর যে সব শীকারীরা ছিল তাদেরি মধ্যে জন কয়েক সময় মত এসে পৌঁছতে পারে নি, সেই সঙ্কট স্থান হতে নেমে আসবার জন্যে তারা ব্যাকুল অথচ ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। এই খানেই ২রা সেপ্টম্বরের ভল্লুক-বিভ্রাট ঘটেছিল, সে কথাতো তোমরা আগেই শুনেছ।

অবিলম্বে বাঘিনীকে এক পর্যাঙ্কে, ভল্লুকটিকে অপর একটিতে শয্যা রচনা করে দিয়ে বাহকেরা সমারোহে শোভাযাত্রা করল, আমি আর K. G. B. গজারোহণে আর সেই গৌটিয়া গজ-রাজের পুচ্ছ দেশে

লম্বমান হয়ে, তাদের অনুসরণ করলাম। পথে গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ নিলে, মহানন্দে তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে চল্‌ল। বাছের সঙ্গে নৃত্যও বাদ যায় নি, সংহাররূপিণী শার্দ্দূল-বধূর মৃত্যুতে তাদের আনন্দ আর ধরে না। কাছে দেখলাম বাঘিনীটি কৃশোদরী তার চামড়াখানি বড়ই সুন্দর। আমার এবারের হোলির উৎসব বনের মধ্যে, নরখাদক ব্যাঘ্রের তপ্ত রক্তের আবীর কুঙ্কুমে সুসম্পন্ন হল।

আমরা অবিলম্বে এ শুভসংবাদ দশ ক্রোশ দূরের তার আপিসের সাহায্যে বাড়ীতে, আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তাকে আর আর মহানুভাব বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সন্দেশ-বাহকই আবার সেগুলির উত্তরও নিয়ে এল, তবে বাড়ী আর আমার কৃতজ্ঞ নিমন্ত্রণ কর্ত্তার কাছ হতে যে আন্তরিক সহানুভূতি পূর্ণ অভিবাদন পেয়েছিলাম, এমন আর কেউ করে নি।

শীকার করে এমন সুন্দর বাঘছাল যদি লাভ হয়- তবে তাকে রক্ষা করবার জন্যে বিশেষ যত্ন নিতে হয়। আমরা প্রসিদ্ধ চর্ম্ম শোধনকারী Messrs Rowland Word-এর বরাবর এ চামড়া লণ্ডন সহরে পাঠিয়ে দিলাম। তখন জর্ম্মানদের অনুগ্রহে জাহাজ ডুবির অসম্ভব ছিল না। এর আগে, আর পরে, যে সব পার্শ্বেল পাঠিয়ে ছিলাম সবগুলিরই পৌঁছ সংবাদ যথাসময়ে আমার হস্তগত হ'ল, কিন্তু অনেকদিন কোন সংবাদ না পাবার পর হৃদয় বিদারক সংবাদ এল শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পার্শ্বেলটি হারিয়ে গিয়েছে। হায়, এমন বিজয় আনন্দের পরিণাম এই শোকাবহ ব্যাপার! এ ক্ষতিপূরণ হবার উপায় ছিল না—তূণ পাশবত্তাই এই ক্ষতির মূল কারণ।

ক্রমশ—

ডিমোক্রাসি।

—:০:—

আজকের দিনে লোকের সঙ্গে কথাই কও আর খবরের কাগজই পড়ো, কানে আসবে ও চোখে পড়বে শুধু একই কথা—ডিমোক্রাসি। এই কথাটা আমাদের মনকে এমনি পেয়ে বসেছে যে সেখানে অন্য কোনও ভাবনা চিন্তার আর স্থান নেই—অবশ্য এক পেটের ভাবনা ছাড়া। অথচ দেখতে পাই ও-কথাটার অর্থ প্রায় কেউ বোঝেন না। আমাদের নীরব জনসাধারণ ও আমাদের পলিটিকাল বাক্যবাগীশেরা এ বিষয়ে সমান অজ্ঞ। এ অবস্থায় কথাটা যে-দেশ থেকে এসেছে সে-দেশের দু'চারখানা বই একটু নাড়া চাড়া করা গেল—কথাটার যথার্থ মানে বোঝবার জন্যে। এই রাজনৈতিক সাহিত্যালোচনার ফল এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করছি। বলা বাহুল্য যা লিখছি তার ঠিক নাম হচ্ছে "নোট"।

(২)

প্রথমত মর্লি সাহেবের Compromise-খানা আবার পড়লুম। আমাদের দেশে একদল লোক আছেন যাঁরা সাংসারিক অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় কলম চালান। কর্ম্মের পথ সরল নয়, অতএব বুদ্ধি খুঁড়িয়ে চলুক—এই তাঁদের উপদেশ। সম্ভবনীয়তার রাশ মেনে চলতেই হবে, তা না হলে অতিবুদ্ধি গলায় এবং পায়ে দড়ি জড়িয়ে

খানায় পড়বে—খানায়-পড়া অবস্থা যখন সর্ব্ববাদী নিন্দনীয় তখন গোড়া থেকে বুদ্ধিকে ধীর কদমে চালানই শ্রেয়। কিন্তু তাড়ির মাদকতা ময়দার মতন নির্জ্জীব এবং নিরেট পদার্থের পক্ষে রুটীতে পরিণত হবার জন্য যেমন দরকারী, তেমনই ভাবরাজ্যে বুদ্ধির সাহসিকতা, উত্তেজনা এবং সূক্ষ্মতা নিরেট ঘটনাবলীকে সজীব করবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—অন্তত এই ত ইতিহাসের শিক্ষা। ভল্‌টেয়ার, রুশো, ডিডেরোকে বাদ দিয়ে ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস-চর্চ্চা যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করাও তাই। ভাব এবং কর্ম্মের ঘটকালীতে মর্লি সাহেবের বিধান নেওয়াই বিধেয়, কেননা তিনি নিজে একজন কর্ম্মবীর। তাঁর মত এই যে, বুদ্ধির বন্ধুর পথে সাহসে ভর করে চলাই উচিত, কর্ম্মক্ষেত্রের স্বাভাবিক জড়তার ফলে ভাবের দুর্দ্দমনীয়তা সহজেই মন্থরগতিতে দাঁড়াবে। ভাব যদি প্রথম থেকেই সম্ভবের কাছে মাথা নীচু করে তাহলে না-হয় বুদ্ধির বিকাশ, না-হয় ভাবের প্রকাশ।

এখন স্মার্ত্তের কথা যদি সত্য হয় তাহলে মানতে হবে যে, বর্ত্তমান ভারতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের কাঁধে একটা বিশেষ রকমের দায়ীত্ব এসেছে—বিশেষত বাঙালীর, সে হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিকে খাটানোর দায়। তবে বাঙালীর নামে আগে থেকেই বদনাম রয়েছে যে, তারা কুছ্‌-কাম্‌কা নেহি। আমি বলি এ নিন্দা অনর্থক, কেননা আমার বিশ্বাস যে পৃথিবীতে কাজের লোকের অভাব নেই, অভাব আছে শুধু মাথা ঘামাবার লোকেরই. আর সেই অভাব যখন বাঙলাদেশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই পূরণ করেছে তখন রাজনীতির ক্ষেত্রেও করবে। আমার দুঃখ এই যে আমরা পূর্ব্বে ঐ অভাব পূরণ করেছি কোন দায়ীত্ব বোধে নয়। কি সাহিত্যে,

কি ধর্ম্মে,, কি বিজ্ঞানে দায়ীত্ব-জ্ঞান নয়, প্রকৃতির তাড়নাই আমাদের ভাবের গতি নিরূপণ করে দিয়ে থাকে। এক রাজনীতির ক্ষেত্রেই আমরা মনের খেয়াল অপেক্ষা নিজেদের কর্ম্ম ক্ষমতা, চরিত্রবল একাগ্রতা প্রভৃতি গুণের উপর বেশি নির্ভর করি, কেননা কি সাহিত্য কি ধর্ম্ম স্বীয় চেষ্টায় তত গড়ে তোলা যায় না, যত যায় রাজ-নীতি ও সমাজ-নীতি। এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। কিন্তু সব বিষয়েই আমরা সৃষ্টি-ছাড়া, তা না হলে একই গলায় একই ক্ষেত্রে ডিমোক্রাসি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের জন্য আবেদন করতুম না। Mill এবং Comte সমাজ-সংস্কারে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির জড়তা দেখে ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন, সেই জন্য লোকের জড়-বুদ্ধির মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করলেন—নব্যন্যায় লিখে। আমাদের দেশে দেখছি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ মুক্ত রাখতে কেউ ব্যস্ত নন, তাই বীরবলের কথা হচ্ছে 'এখন ভিক্ষের ঝুলি টাঙ্গিয়ে রেখে বুদ্ধি চালনা করা যাক। আগে পথ-বিচার করা হোক, না-হলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাব'।

(৩)

ধরা যাক্ ডিমোক্রাসি কথাটা। আমাদের ধারণা ও-একটা ধর্ম্ম, ন্যূনকল্পে একটা মহৎ-আদর্শ। কল্পনার যাদুতে যাই ভাবা যাক্ না কেন, ওটা আসলে অনেক রকম শাসন-প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ প্রণালী মাত্র। আমাদের দেশ-নায়কেরা কিন্তু এ কথাটি না বুঝে ও-বস্তুকে ধর্ম্ম হিসেবে ধরে নিয়েছেন, তাই তাঁদের প্রত্যেক বক্তৃতায় ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আ-কাঁড়া, ঠিক করা হয় ঐ আদর্শের

চালুনী দিয়ে। আমরা যদি ডিমোক্রাসিকে শাসন-প্রণালী হিসেবেই ধরি তাহলে দুইটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে। প্রথমত ডিমোক্রাসি আমাদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না? দ্বিতীয়ত আমাদের ভিক্ষা-পত্রের দফাগুলির সঙ্গে ডিমোক্রাসির ষোল আনা মিল আছে কি না?

(৪)

স্বরাজের কোন জীবন্ত ধারা বর্ত্তমান না থাকলেও স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের দেশে নতুন নয়। তারপর এই যুদ্ধের কৃপায়, ইংরাজ-শাসন এবং শিক্ষার ফলে, পৃথিবীর রাজকীয় সমস্যার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি যে আমাদের চলতে গেলেই বিশ্বমানবের সাথে এক পথেই সমান পা-ফেলে হাঁটতে হবে, অতএব প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে "হাঁ, ডিমোক্রাসি আমাদের চাই"। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

সাধারণ-তন্ত্র যে জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছে, তার কারণ এই যে পূর্ব্বতন শাসন-প্রণালীর ভিত্তি অপেক্ষা এর ভিত্তি ঢের বেশি পাকা। পুরাকালে রাজ্যের ভিত্তি ছিল রাজার গুণ, এখনকার ভিত্তি লোকের সংখ্যা। রাজ্যতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, এক Federation ছাড়া Aristotle এ বিষয়ে যে তত্ত্ব নিরূপণ করে গেছেন তা সনাতন। তাঁর মতে প্রথমে থাকে একের রাজত্ব, সেই এক রাজা যখন স্বার্থ-সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে প্রজার হিত-সাধনে কুণ্ঠিত হন, তখন তাঁর সভাস্থ সম্ভ্রান্ত পাত্রমিত্রের দল নিজেদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করেন তখন হয় অনেকের প্রভুত্ব। সেই বহু আবার যখন এক

গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে গণ-হিত ভুলে গিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠেন তখন একজন শক্তিশালী পুরুষ জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে নিজে tyrant হয়ে বসেন। তাঁরও পরোপকার বৃত্তি যখন বংশ পরম্পরার কাছে হার মানে তখন জন-সাধারণ তাদের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন দেখা যায় যে সাধারণের বুদ্ধি কোন অ-সাধারণ সমস্যার সুচারু-রূপে সমাধান করতে পারে না, তখন একজন মূল-গায়েন এই গোলে-হরিবোল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ান বীরগর্ব্বে। আবার একের প্রভুত্ব সুরু হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বীরের আসর নেই, মূল-গায়েন আর বংশ-পরম্পরায় অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাই সভ্যজগৎ আজকাল বহুর উপর আস্থা স্থাপন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে রাজ্য-শাস-নের জন্য বিশেষ দরকার বলে কাজের ভার একদল বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত হয়েছে যারা সাধারণের কাছে নিজেদের কার্য্যাবলীর জন্য জবাব-দিহি করতে বাধ্য। এরি নাম গণ-তন্ত্র।

(৫)

অতঃপর দাঁড়াল এই যে ডিমোক্রাসি একটি শাসন প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ ব্যাপার সংখ্যামূলক। জন-সাধারণের ভিতর অবশ্য ভাল মন্দ সব প্রকৃতিরই লোক আছে, তবুও সাধারণ লোকের বুদ্ধির সমষ্টি জনকয়েকের অসাধারণ বুদ্ধির অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু যেকালে রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞের আবশ্যক আছে তখন তাদের

পরিচয় জন্মের দলিলের বদলে কর্ম্মের দলিল হতেই নেওয়া শ্রেয়। এদের কার্য্যকারিতার বিচারক হবে অবশ্য জন-সাধারণ।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য কি অন্য শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য হতে বিভিন্ন? সকলেরই উদ্দেশ্য ত প্রজার মঙ্গল। তবে মঙ্গল কথাটার মানে এক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র। আগে ছিল যাঁদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার তাঁরা যখন বেশি বোঝেন তখন তাঁদের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। এখন এর মানে হচ্ছে প্রজার নিজের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। য়ুরোপে যেদিন থেকে পোপ আর জার্ম্মাণ-সম্রাটের ঝগড়া বাধল সেই দিন থেকেই লোক-বাসুকী মাথা নাড়া দিয়ে নিজের সজীবতার পরিচয় দিলে—কুলীন-তন্ত্রের আসন টল্‌ল। Humanism-এর শিক্ষা যখন Erasmus, Colet, Abelard প্রভৃতি দেশময় ছড়িয়ে দিলেন, যখন renaissance-এর প্রসাদে মানুষের আত্মপূজার আরতি বেজে উঠল, যখন Martin Luther ধর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন, অবশেষে যখন বিজ্ঞানের শিক্ষা লোকায়ত্ব হল তখন মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে। এই শুভ মুহূর্ত্তে ফরাসী-বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হল—সেই বিপ্লবের তন্ত্রধারকেরা দেখিয়ে দিলেন যে এক গণ-তন্ত্রেই মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে নিজের আনন্দে নিজের প্রকৃতির সব কলিগুলো ফোটাতে পারে, যা পূর্ব্ব-শাসনতন্ত্রে একেবারে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু গোষ্ঠী-ধর্ম্ম পুরাতন বলেই যে বাতিল হয়ে গেল তা নয়। তাই নতুন অবস্থায় পড়ে গোষ্ঠী-ভাব জাতীয়-ভাবে পরিণত হল। Idea of Democracy রাজ্যতন্ত্রে রূপান্তর ঘটালে। কিন্তু রূপান্তরিত জাতীয়-ভাবের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য হল একটি

ভূতপূর্ব্ব উপায়ে। চিরকালই রাজা তাঁর সভাসদ আমীর-ওমরাওদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন—কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে শুধু বিপদ্‌কালেহ্যুপস্থিতে। সম্ভ্রান্তবৃন্দের পক্ষে রাজার প্রসাদ প্রজা-হিতের চেয়ে বেশি ফলদায়ী, তাই তাঁদের দ্বারা জাতির যা মঙ্গল-সাধন হত তা কেবল পেটের দায়ে। ইউরোপের কোন কোন রাজ্যে একটি ব্যবস্থাপক সভা ছিল যেখানে রাজার আত্মীয় স্বজন পার্শ্বচর অনুচরবর্গ ছাড়া একটি জমিদারের দল, একটি পুরোহিতের দল এবং রাজ-কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাচিত সাধারণ-দলের প্রতিনিধিরা আহূত হতেন রাজাকে সৎ পরামর্শ দেবার জন্য। ইংলণ্ডে প্রথম তিন দল একত্র হয়ে এক সভায় সেই দিন থেকে বসতে আরম্ভ করলেন যেদিন John-এর দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে Normandy-র যোগ-সূত্র ছিন্ন হল। আর সাধারণ দল বসলেন অন্যত্র কিন্তু দুই দলের মধ্যে একটা যোগাযোগ রইল। ইংলণ্ডে এইরূপে এক জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সামঞ্জস্য রক্ষা হল। ফরাসী দেশে তিন দল আলাদা represented হত। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই এবং পঞ্চদশ লুই এই সভার উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেরাই শাসন কার্য্য সমাধা করতেন। কিন্তু ষোড়শ লুইএর রাজকোষ শূন্য হলে তিনি আবার এই ব্যবস্থাপক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন প্রজার কাছ থেকে পয়সা আদায় করবার জন্য। প্রশ্ন উঠল এই যে, তিন দল আলাদা আলাদা না একত্রে ভোট্ দেবে। রাজার মৎলব আলাদা, প্রজার মৎলব একত্রে, ফলে ঘটল ফরাসী-বিপ্লব। সেই বিপ্লবে জমিদারের দল কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, কেউ বা বাণিজ্যে মন দিলেন। সেই থেকে Separate representation of class-interests-এর পরমায়ু শেষ হল। বর্ত্তমান কালে

ইটালীর রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারা ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের নকল বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

১৮৫০ সাল থেকে প্রুসিয়া, সেক্সনি এবং অন্যান্য জার্ম্মাণ Municipality-তে ভোটারগণ তাদের টেক্স দেবার ক্ষমতা অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হত। অষ্ট্রিয়াতে কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও লোক সমাজকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত—জমিদার, সহরবাসী ব্যবসায়ী, গ্রাম-সঙ্ঘ এবং জন-সাধারণ। হাঙ্গ্রি দেশে Table of magnates-এ শুধু বড় লোকেরাই বসতে পেতেন। কিন্তু গত যুদ্ধের ধাক্কায় এই রাজ্যগুলো ধূলিসাৎ হয়েছে, নতুন শাসন-প্রণালী যা অবলম্বিত হল তার বিশেষত্ব এই যে সমগ্র জাতিই হচ্ছে একটি সম্প্রদায়। বীরবলের মতে গত যুদ্ধে ব্যক্তি-তন্ত্রের অগ্নি পরীক্ষা হয়েছে এবং তিনি ১৯১৪ সালে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তা ফলেছে। ডিমোক্রাটিক জাতিরাই জয়যুক্ত হয়েছে, আর পরাজিত জাতিরা ডিমোক্রাসি অবলম্বন করেছে। তাঁর কথা যেকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তখন তাঁরই মতানুসারে যে সব জাতির জীবন ব্যক্তি-তন্ত্রের উপর গঠিত তাদের ইতিহাস হতে রাজনীতির মূলতত্ত্বের সন্ধান নেওয়া উচিত —বিশেষত যখন বাকী য়ুরোপের জীবন তাদেরই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। তাহলে দেখা গেল যে, কি ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কি ইটালী এমন কি জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়াতেও (রুশিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে) যেকালে এ রকম ঘরের ভিতর ঘর সৃষ্টি করা বোকামীর পরিচয় এবং জাতীয়তার সর্ব্বনাশ-সাধক বলে পরিগণিত হয়েছে তখন বর্ত্তমান-ভারতে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাতেই আমরা যে নির্ব্বিবাদে Communal representation-এর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি এই

প্রমাণ যে আমাদের মনে আজও দেশাত্মবোধের ঘোরতর অভাব রয়েছে। আমাদের দেশ-নায়কেরা দু'দলে একমত হয়ে আজ যে বিষবৃক্ষ রোপণ করলেন তাঁদের উত্তরাধিকারীদের তার মারাত্মক ফল ভোগ করতে অবশ্যই হবে।

(৬)

তাহলে আমাদের এখন কি কর্ত্তব্য? ভাগ্যক্রমে ভোটের ব্যবস্থা স্থির করে প্রাদেশিক লাট-সাহেবদের মত নিয়ে নতুন ধরণে সভা বসাতে এখনও এক বৎসর। ইতিমধ্যে দেশের দলপতিরা এই সত্য প্রচার করুন যে, মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে য়ুরোপ যখন Separate Communal representation জাতীয় ঐক্যের বিরোধী বলে ছেড়ে দিয়েছে তখন আমাদের দেশে য়ুরোপ এবং আমেরিকা যে-উপায়ে সাম্প্রদায়ীকতার বিরুদ্ধে স্বদেশীয়তা রক্ষা করেছে সেই উপায়ই অবলম্বন করা সঙ্গত। য়ুরোপের সত্য আমাদের দেশে খাটবে বিশেষত যখন দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশতই হোক য়ুরোপের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ইংলণ্ডের শিষ্য হয়েই আমরাও রাজনীতির শিক্ষানবিশী করছি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতির তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমত যারা ভোট দেবে তারা এক দল। দ্বিতীয়ত যারা ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য চালাবে তারা আর এক দল এবং যারা ভারী-দলের আনুকূল্যে সাধারণের মত লক্ষ্য করে রাজ্য-শাসন করবেন অর্থাৎ Executive, তাঁরা হচ্ছেন তৃতীয় দল। কে কি রকম ভাবে ভোট দেবে, কি রকম ভাবে ব্যবস্থাপক সভা গড়া হচ্ছে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যপস্থাপক

সভার সম্বন্ধ কি হবে এই তিন বিষয়ের তথ্যের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ programme নিয়মিত এবং নিরূপিত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথমেই ভোটের কথা ধরা যাক। ভোট দেবার অধিকার সম্পত্তি-মূলক কিম্বা মনুষ্যত্ব-মূলক, যে মূলকই হোক না ভোট দেবার রীতি সাধারণত দুই রকমের। প্রথমত প্রত্যেক জেলায় প্রতিনিধি স্থানীয় ভোটের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হবে—একেই বলে Scrutin d' arron dissement, ভাষান্তরে district system. দ্বিতীয়, প্রতিনিধি ঠিক করা হবে একটা সমগ্র প্রদেশের ভোট একত্র নিয়ে, এই প্রদেশের ভিতর অবশ্য অনেক জেলা আছে। যদি দশ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কথা হয়, তাহলে প্রত্যেক ভোটারের হাতে একটা লিষ্ট থাকবে সেই লিষ্টে অন্তত দশ জনের নাম থাকবে, ভোটার তখন বিচার করে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে গুণানুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে দেবে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যা ভোট পাবেন তিনিই প্রথমে নির্ব্বাচিত হবেন এই রকমে পর পর দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। একে বলে Scrutin de liste, ভাষান্তরে General ticket system. এই দু'পদ্ধতিরই দোষ-গুণ আছে এবং দুই পক্ষেই বড় বড় কৌন্সিলী দাঁড়িয়েছেন। ফরাসী দেশে Montesquieu, Mirabeau থেকে আরম্ভ করে Duguit পর্য্যন্ত; ইংলণ্ডে Lord Brougham থেকে Sidgwick, Balfour; জার্ম্মাণীতে Bluntschli—এঁরা সকলেই বলেন যে জাতীয়-জীবনের সমস্ত প্রবাহগুলির অবাধ গতির পক্ষে district system ভাল, আবার Robespierre থেকে M. Goblet পর্য্যন্ত সকলেই Scrutin de liste-এর পক্ষপাতী। দু'দলেই যখন মহা মহারথী রয়েছেন তখন

নিজেরাই আলোচনা করে দেখা যাক আমাদের পক্ষে কোন্‌টি ভাল। District method-এর বিপক্ষে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, প্রথমত নির্ব্বাচনের গণ্ডী ছোট হলে অনেক সময় অযোগ্য লোককে ভোট দিতে হয়। দেখা গেছে যে, যে-সব সহরে ward অনুসারে alderman বাছাই হয় সেখানে ঘুষের জোরে যোগ্যতা থই পায় না।

দ্বিতীয়ত এই সব অযোগ্য লোকেরা নিজেদের ছোট গণ্ডীর অতিরিক্ত কোন জাতীয় ভাবের ধারণা মনে পোষণ করতে অপারগ। ফ্রান্স এবং ইটালীর ইতিহাসে এই সত্যের ভুরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে—ইটালী বুঝে সুঝে district method ছেড়ে দিয়েছে। এই রীতিতে যে-সব Deputy পাঠান হয় তাঁরা নিজেদের কেবলমাত্র জেলার প্রতিনিধি হিসেবেই দেখেন, সমগ্র দেশেরও যে তাঁরা প্রতিনিধি এ কথা তাঁরা মনে ভাবতেই পারেন না—সেইজন্য তাঁরা নিজের ভোটারদের খুসী করতে এত ব্যস্ত থাকেন যে দেশের রাজকার্য্য চালাবার কথা তাঁদের মনে থাকে না। Daudet তাঁর Numa Roumestan বইয়ে এঁদের দুর্দ্দশার কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেছেন—কোথায় একটা বাজার বসাতে হবে, কোথায় কার ছেলের চাকরী করে দিতে হবে এই সব কাজ করতে করতে তিনি ভোটারদের বাজার-সরকারে পরিণত হন। District system-এ যে পরিমাণে তোষামুদী এবং ঘুষের প্রশ্রয় পায় তার তুলনা কুত্রাপি নেই।

তৃতীয়ত এই উপায়ে শাসকের দল ভোট অনুসারে যে স্থানের যত সংখ্যক প্রতিনিধি হওয়া উচিত তা অপেক্ষা নিজেদের মনোমত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি হস্তগত করবার জন্য জেলাকে খেয়াল অনুসারে বিভাগ করেন।

এসব গেল বিপক্ষের কথা। স্বপক্ষের কথা হচ্ছে district system-য়ে প্রথমত ভোট দেওয়া সহজ হয়, প্রতিনিধি ভোটারদের পরিচিতেরমধ্যে একজন এবং সেই পরিচয়ের জোরেই তিনি জেলার অভাব দূরীকরণে বেশি তৎপর থাকেন। দ্বিতীয়ত এ উপায়ে যাঁদের দল সংখ্যায় কম তাঁদের মতেরও যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়। সাধারণতন্ত্রের দোষই এই যে মতের গুরুত্ব অনুসারে দলের ভারীত্ব নির্দ্ধারিত হয় না। General ticket system অনুসারে যে-কোনও দল চালাকী করে সব প্রতিনিধিগুলিকেই হস্তগত করতে পারেন—সেইজন্য আমেরিকা ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই পদ্ধতি ত্যাগ করে district method গ্রহণ করেছেন। চতুর্থত Bradford সাহেবের মতে যে কালে অশিক্ষিত ভোটারের পক্ষে সূক্ষ্মভাবে ভোটপ্রার্থীদের গুণ বিচার করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা অসম্ভব, জনসাধারণকে সেকালে party-guide-এর হাতে পড়তেই হবে; অতএব স্বাবলম্বনই শ্রেয়।

মোটামুটি এইত গেল যুক্তির কথা, দৃষ্টান্তের কথা তারপর। ফ্রান্স ১৭৯১ সালে Scrutin d' liste আরম্ভ করেন, ফলে দেশের তিন দল একমত হয়ে রাজার অত্যাচারের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, তারপর নেপোলিয়নের যুগে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, কিন্তু তা সত্বেও তৃতীয় নেপোলিয়ন আবার এই ভোটের কৃপায় ফ্রান্সের সম্রাট হয়ে বসলেন কিন্তু তাঁর কার্য্যকলাপ দেখে ফ্রান্স মনস্থির করলে যে Dictator-এর যুগ চলে গেছে, তাই ১৮৭৬ সাল থেকে রাজবংশের পুনরাগমন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে Scrutin d' arrondissement পুনঃপ্রতিষ্ঠ হল। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভায় কি দেশাত্ম-

জ্ঞান, কি ধর্ম্ম-জ্ঞান সবই লোপ পাচ্ছে, তাই ছোট দলগুলিকে এক করে একটি স্থায়ী Republican দল গড়বার প্রয়াসে Scrutin d' liste-এর আশ্রয় পুনরায় গ্রহণ করা হল। কিন্তু Boulanger আবার যখন নূতন নেপোলিয়ন হতে চাইলেন তখন ১৮৮৯ সালে district method ফিরে এল। ফলে ফরাসা দেশের ব্যবস্থাপক সভার দুর্দ্দশার কথা সকলেই অবগত, বিস্তর ছোট দলের উপদ্রবে বড় দলের স্থায়ীত্ব নেই, মন্ত্রীদলের পরমায়ু গড়পরতা ৮॥০ মাস এবং কোন কার্য্যেই তাঁরা নিজেদের দলের উপর নির্ভর করতে পারেন না—ব্যবস্থাপক সভা সে দেশে হয়ে উঠেছে একটা Debating club. ফ্রান্স নিজের দুরবস্থার কথা বোঝে কিন্তু পাছে আবার কেউ ভোটারদের ঠকিয়ে নেপোলিয়ন হয়ে বসে এই ভয় তার এখনও ঘোচে নি—শুধু তাই নয় ফ্রান্স বহুকাল থেকেই সুস্পষ্টভাবে জেলায় জেলায় বিভক্ত এবং জেলার শাসন-প্রণালী রাজ্যে সাধারণ-তন্ত্র থাকা সত্ত্বেও অতিশয় centralised. তার উপর সে দেশে আছে—ল্যাটিন বুদ্ধির চিরন্তন symmetry-প্রিয়তা, এই সব কারণে এখনও ফ্রান্স district method-কে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য। বর্ত্তমান কালে এক ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ছাড়া ইটালী, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পর্টুগাল, স্পেন, কোবে, জাপান, অনেক Swiss Cantons, আইসল্যাণ্ড, টেস্মেনিয়া, কুইন্সল্যাণ্ড ব্যতীত সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া এই Scrutin d' liste মেনে নিয়েছে। সাধারণ-তন্ত্রের অনিবার্য্য দোষ এই যে যে-সম্প্রদায় সংখ্যায় কম সে-সম্প্রদায় নিজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করতে পারেন না। কিন্তু General ticket system অবলম্বন করার জন্য পূর্ব্বোক্ত সব দেশেই তাঁদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এখন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দুই-ই দেখান গেল। আমার কথা এই যে district system-এর যে দোষগুলি য়ূরোপে দেশাত্মবোধ অত সুগভীর থাকা সত্ত্বেও প্রকট হয়েছে—যথা ছোট ছোট দলের মধ্যে জাতীয়তার অভাব, গণ্ডীর বাইরে যাবার অক্ষমতা—এগুলি ত ভারতবর্ষের সনাতন দোষ—তার উপর য়ূরোপ আমেরিকা যা পরিত্যাগ করেছে অর্থাৎ—communal representation, তাই আমরা যেচে নিলুম। কাজেই আমার মতে আমাদের general ticket system অবলম্বন করলে খানিকটা বাঁচাও, নচেৎ আমাদের ব্যবস্থাপক সভা একটা দলাদলীর আড্ডা হবে।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচ্যে শক্তিবাদ।*

——:*:——

জীবনযাত্রার রীতির মত নৈতিক ধারণাও প্রাচ্যদেশে বহুবিধ; তথাপি সাধারণত পাশ্চাত্য জগৎ মনে ভাবে যে, নৈতিক হিসাবে প্রাচ্যের সকল ভাবের ধারা পাশ্চাত্যের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কর্ম্মের আদর্শ লইয়া যখন আলোচনা চলিতে থাকে তখন পরস্পরের পক্ষে পরস্পরকে বুঝিতে পারা কঠিন; কারণ প্রত্যেক জাতির মধ্যেই তাহার চিরাগত সামাজিক প্রথা বদ্ধমূল হইয়া জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং এক জাতি অন্য জাতির প্রথা একেবারে অন্যায় না হউক ঠিক ন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারে না। তাই যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ে পরস্পরের নৈতিক ও কর্ম্মের আদর্শ তুলনা করিয়া দেখে, তখন সহানুভূতিতে অন্তর্দৃষ্টির অভাব হইবারই কথা। তথাপি ভারতের সমাজ-নৈতিক চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিতে করিতে সরল, প্রাচীন আর্য্যজগতে গিয়া পৌঁছাইলেই দেখিতে পাই, পাশ্চাত্যে আজ যে সকল গুণের আদর, প্রাচীন ভারতীয়গণও সেই সকল গুণকেই শ্রদ্ধা করিতেন। পাশ্চাত্যে প্রাচ্যসম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা আছে তাহা ঠিক নহে, পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্যের নৈতিক সাহিত্যও সর্ব্বদা মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করে

---

* (Paul Rienski-র Political and Intellectual Currents in the Far East হইতে)।

যে, সত্যানুরাগই মানবের প্রধান ধর্ম্ম। ভারতের প্রাচীনশাস্ত্রে সাহস, শক্তি, ধৃতি প্রভৃতি বীরোচিত সদ্‌গুণও অবহেলা করা হয় নাই।

কিন্তু ক্রমাগত বিদেশীর নিকট পরাজিত হইয়া নানারূপ পরিবর্ত্তনে এবং জাতিভেদ প্রথার প্রচলনে ভারতীয় সভ্যতা ক্রমেই যত জটিল হইতে লাগিল, নীতিশাস্ত্রও ততই তাহার প্রাচীন সরলতা হারাইয়া ফেলিল। নীতিশাস্ত্রের নানারূপ বিভাগ হইল, নানারূপ অনাবশ্যক অংশ তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। অবশেষে ত্যাগধর্ম্ম (doctrine of renunciation) জাতির মনে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ভারতের পরবর্ত্তী যুগের চিন্তা—সংসারত্যাগ, কর্ম্মবিরতি, জীবনের দুঃখকষ্ট ধীরভাবে সহ্যকরা, এই সব প্রবৃত্তির অনুকূলে। তখন এই নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ শান্তভাবে সকল শক্তি নিরোধ করিয়া মানুষকে শুদ্ধ ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইতে উপদেশ দিল। বারবার বহিঃশত্রুর ভারতজয়, দুর্দ্দম্য জড় প্রকৃতির অত্যাচার, জাতীয়তার অনুভূতির অভাব, এই সকল মিলিয়া চিন্তা জগতের এই সব ভাবকে আরও দৃঢ় করিতে সাহায্য করিল। শুধু হিন্দুধর্ম্মে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ভারতীয় সকল ধর্ম্মেই এই জাতীয় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে এক মহা সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত দেখিতেছি। নব নব জাতীয় শক্তির উদ্বোধন দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন শাস্ত্রের নূতন ভাবে নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে, দেখান হইতেছে যে, নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ ও ভগবানের বিধান মাথায় তুলিয়া লওয়া (Submission) হিন্দুধর্ম্মের জটিল শাস্ত্রের একটি অংশমাত্র; দেখান হইতেছে যে পুরুষোচিত গুণ, যে-সব গুণে মানুষকে অধিক কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলে, সে-সব গুণেরও হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া

থাকে। এই সব বীরোচিত গুণ এখন প্রাচ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। জাপানে জাতীয়ভাবের ফল দেখা যাইতেছে, জাপান তাহার জাতীয়-জীবনে যে-শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা এশিয়ার অপরাপর দেশের আদর্শ স্বরূপ।

(২)

হিন্দুদের তুলনায় চীনাদের দার্শনিক আলোচনার প্রবৃত্তি অনেক কম। সহজ বুদ্ধিতে যাহা নীতি-অনুমোদিত মনে হয় তাহাই তাহারা পালন করে। চীনারা চিরকাল শান্তিপ্রবণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্ত-ভাবে দাঁড়ানই তাহাদের চরিত্রের প্রধান বল; বলের দ্বারা বলের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া তাহারা যেরূপ ভাবে নানা অমঙ্গলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহাতে তাহারা ঋষি টল্‌ষ্টয়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, "চীনাকে আদর্শ কর; দেখ এই বিপুল জনসঙ্ঘ কেমন শান্ত ও ধীরভাবে জীবনযাপন করে, বিদ্রোহাচরণ দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া শান্ত ও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া কেমন ভাবে তাহারা 'অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না' Resist not Evil—এই নীতি পালন করে"। চীনা দার্শনিক লাওট্‌জ্ (Lao-Tze) চীনাদের এই জাতীয়-আদর্শ অনেকটা পরিস্ফুট করিয়াছেন। লোকে ইঁহাকে চীনের এপিক্‌টিটাস্ বলে। তিনি reason-কে যেরূপ ভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন তাহাতে গ্রীকদার্শনিকের সঙ্গে তাঁহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহার মতে, reason যেমন ভাবে জগতে ও মানব মনে অভিব্যক্ত, তাহাতে মানবশক্তিকে আত্মপ্রত্যয়বিশিষ্ট

(Self conscious) করার কোনই প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত তিনি, যিনি সহজ ভাব অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহার নিজের reason-এর প্রয়োগ ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিশ্বের reason-কে স্বীয় প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া লইবেন। যুক্তি করে সবাই, কিন্তু সবাই আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় না। লাওট্‌জ্‌-এর এই আত্মপ্রতিষ্ঠা-বর্জ্জনের অর্থ অবশ্য অকর্ম্ম নয়, ইঁহার উপদেশ—সকল বস্তু স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠুক, কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে বাড়াইতে যাইও না। কিন্তু জন-সাধারণ তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে তাঁহার প্রচারিত নীতির অন্তরে যাহা ধর্ম্ম ও শক্তির সহায় ছিল তাহা দুর্ব্বলতায় পরিণত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমানে অনেক চীনার মতে জাতীয় প্রতিষ্ঠা-নের যে-সব অসম্পূর্ণতার জন্য চীন অসংখ্য অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়াছে তাহাদের জন্য এই লাওট্‌জ্‌-ই দায়ী।

আজ আমরা দেখিতেছি যে এই বিপুল জনসঙ্ঘ জাগিয়া উঠিয়া নিজের অন্তরে নূতন শক্তির পরিচয় লাভ করিতেছে, ইহাদের মন কর্ম্মযোগের প্রতি আরও অনুকূল হইয়া উঠিতেছে; চীনে—আত্ম-প্রতিষ্ঠাবর্জ্জনের দেশ চীনে—সামরিকতা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। শক্তি লাভই যে জাতীয়-আদর্শ তাহা সকল দেশের সাহিত্যে আজ পরিস্ফুট। যুদ্ধের আয়োজনের জন্য আজ অনেকে ক্ষতিস্বীকারে অগ্রসর, স্কুলের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশসুদ্ধ সকলে সামরিক বেশ পরিধান করিয়া সৈন্যদের মত শিক্ষা পাইতে আগ্রহান্বিত। এতদিন দেশে লোকে যুদ্ধবৃত্তি ঘৃণার চক্ষে দেখিত, আজ সে ঘৃণা নূতন নূতন শক্তির আবির্ভাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে। চীনা বীর ওয়াং-ইয়াং-মিং এই নূতন ভাবের বন্যা দেশের সাহিত্যে

আনিয়াছেন, তাঁহার রচনার মূল্য যে কত বেশি, তাহা জাপানীরা প্রথমে দেখাইয়া দেয়। আজিকার দিনে তিনি চীনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান লেখক। কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই—চিন্তা ও জ্ঞানের পরিণাম যদি কর্ম্ম না হয়, তবে সে চিন্তা ও জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তা এই হিসাবে পরীক্ষা করিতে হইবে যে তাহা কর্ম্মজীবনের পক্ষে সহায় কি না। নিজে তিনি সংসারী ছিলেন, এবং স্বীয় মত এমন ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিতে পারিতেন যে তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, বীরোচিত কর্ম্মে পাঠকের উৎসাহ জন্মে। কর্ম্মের জন্য এই উৎসাহ, বিপ্লববাদের ভাবে এবং পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষায় অভিব্যক্ত হইতেছে; বৃদ্ধ দার্শনিক বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত এসব পছন্দ করিতেন না। অন্যায় যে সহ্য করিতে হইবে, এ ভাব চীন দেশ হইতে অনেকটা চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে এই বিশ্বাস যে, শুধু বীরত্বের দ্বারাই জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সকলের সমাধান করিতে হইবে। ওয়াং-ইয়াং-মিং-এর কথাগুলি চীনের কর্ণে যেন তূর্য্যনিনাদ করিতেছে।

প্রাচ্যে কর্ম্মযজ্ঞের প্রকৃত পুরোহিত জাপান। শুধু তাহার বর্ত্তমান জীবন নয়, তাহার অতীতও এই কর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছে। প্রাচ্যে একমাত্র জাপানেই ইউরোপের মত সামরিক সামন্তশ্রেণী (Military feudalism) গড়িয়া উঠিয়াছে। যখন তাহার অন্তরে জাতীয়-সত্তার পূর্ণ অনুভূতি জন্মিল তখনও সামন্ত-প্রথার সামরিক দিকটা তাহার কর্ম্ম ও ভাবের কেন্দ্র হইয়া থাকিল। ভারতে ও চীনে পুরোহিত ও পণ্ডিত যেমন গৌরব লাভ করিয়া

আসিয়াছে, জাপানে কখনও তেমন হয় নাই। জাপান, বুদ্ধ ও কনফিউশিয়াস, এই উভয়ের ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার আপন চিন্তার ধারা দিয়া এই দুই ধর্ম্মকে জাতীয় ভাবের সহিত মিশাইয়া লইয়াছে। এই ভিন্ন ভিন্ন বাদে যে বিরোধ আছে তাহাতে ভয় না পাইয়া জাপান তাহার জাতীয় প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম্মনীতি এরূপভাবে গড়িয়া তুলিল যে তাহাতে মানবশক্তির উৎকর্ষ ও অভিব্যক্তি প্রধান স্থান অধিকার করে। সামরিক যুগ হইতে সে তাহার 'বুশিদো' বা ক্ষাত্র্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্লেটো ও হিন্দু দার্শনিকগণ সত্যানুরাগ, মহাপ্রাণতা, সাহস ও অন্যান্য যে-সব গুণ ক্ষত্রিয়োচিত বলিয়া বর্ণনা করেন, এই 'বুশিদো' ধর্ম্ম সেই সকল গুণকেই প্রশ্রয় দেয়। নব্য জাপান, জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই নীতি চালাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই; স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সামরিক যুগে যে-সব বিধি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে-সকল বর্ত্তমান শ্রমজীবি-সমাজের নৈতিক সমস্যা সকলের মীমাংসা করিতে অপারগ।

(৩)

সমসাময়িক প্রাচ্যচিন্তার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, যে এই সব প্রাচীন জাতি কর্ম্ম ও শক্তির তত্ত্ব কতদূর ভেদ করিতে পারিয়াছে। এই সকল বিষয়ে প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের প্রভেদ থাকিবেই, মৌলিক ভেদের জন্য বাহিরের উন্নতির পথও স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিতে যাহা বুঝায় আজও সে ভাব প্রাচ্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই

মানবের ব্যক্তিত্বের এই যে প্রাধান্য, স্বচ্ছন্দ বিকাশের এই যে অবসর, ইহার মূল খুঁজিতে গেলে গ্রীস রোমের ক্লাসিসিজ্‌মের (Classicism-এর) নিকট যাইতে হইবে। ক্লাসিক আদর্শ আত্মসংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত; যাহা শুধু কৌতূহল তৃপ্তি করে, ভয় উৎপাদন করে বা বুদ্ধিভ্রংশ জন্মায় সে-সব ছাড়িয়া এক নির্দ্দিষ্ট পথে ভাব ও ভাষাকে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা—ইহারই নাম ক্লাসিক ভাব। এইরূপে আত্মদমন হইতে স্বাধীনতা জন্মে। এই আত্মসঙ্কোচনের ফলে মানুষ পরস্পরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রভেদ বুঝিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্য্য মনে হয় যে এই স্বাতন্ত্র্যবাদী পাশ্চাত্য সকলের প্রতি সমান ভাবে নৈতিক বিধান প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে, নীতির সহিত সমাজতন্ত্র মিশাইয়াছে। কিন্তু 'ব্যক্তিত্ব আত্মসংযমের ফল' একথা মনে রাখিলে এ ব্যাপার তেমন অসম্ভব বোধ হইবে না।

এই সকল ব্যাপারে অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা মস্ত বড় ভেদ রহিয়া গিয়াছে। মানবজীবনে কর্ম্মশক্তি বিকাশের আকাঙ্ক্ষা জানিবা মাত্র প্রাচ্যদেশ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যেসব কর্ত্তব্য বিহিত আছে তাহাদের দোহাই দিতে চায়। প্রাচ্যের বর্ত্তমান যুগে প্রধান সমস্যা—শক্তির আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছাড়িয়া মানবসাধারণের জন্য বিহিত নীতিশাস্ত্র অনুসরণ করিলে কি তাহা লাভ করা যাইবে? সমাজধর্ম্মে সাধারণ-তন্ত্র চলিবে, না অভিজাত তন্ত্র?

এশিয়ার প্রধান দেশ তিনটির মধ্যে চীনই গণতন্ত্রের দেশ; যখন পৃথিবীতে অপর কোনও দেশ গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসনপ্রণালী বলিয়া স্বীকার করে নাই, তখন চীনের অবস্থা এরূপ ছিল যে সমগ্র

সমাজের পক্ষে Community সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে সর্ব্ব-সাধারণের সম্মতির আবশ্যক হইত। বর্ত্তমান জাতীয় পরিবর্ত্তনে এই প্রজাতন্ত্রের ভাব আরও পরিস্ফুট, রাষ্ট্র এখন সাধারণের মতানুযায়ী করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। জাপানে যে একটা নামমাত্র পার্লামেণ্ট প্রচলিত আছে তাহা ছাড়াইয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন শাসনপ্রণালী দেওয়া হইবে যাহাতে ইহার জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তবিকই লোকায়ত্ত হইতে পায়।

সমাজধর্ম্মে বহুর প্রাধান্য থাকিবে, না কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়কেই বরেণ্য করিয়া রাখা হইবে এই সমস্যার মীমাংসা দূর-প্রাচ্যে কিরূপ ভাবে সমাধান হয় তাহা দ্রষ্টব্য বটে। ভারতে ও জাপানে সমস্যা দাঁড়াইতেছে এই—জাতীয় জীবনে যে শক্তির প্রয়োজন, প্রাচীন পন্থা অবলম্বন না করিয়া অন্য কি উপায়ে সেই শক্তির বিকাশ সাধন করা যাইতে পারে? আর যদিই বা এই প্রাচীন ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে তবে এমন কোনও উপায় আছে কি যাহাতে ইহার প্রভুধর্ম্ম (master morality) সর্ব্বসাধারণের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিতে পারা যায়। আর চীনের সমস্যা—যে স্বল্পসংখ্যকের নেতৃত্ব জাপানে এতদূর বিকাশিত যাহা ভারতে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছে, সেই নেতৃত্বের বিকাশের অপেক্ষা না রাখিয়া জাতীয় জীবনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় কি না? ইহা যে অসম্ভব, একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে চীনের সমাজধর্ম্মে গণতন্ত্রের ভাব ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে পারে। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে সভ্যতার এই বিকাশ-রঙ্গভূমি এশিয়ায় প্রভুধর্ম্ম ও দাসধর্ম্মের মহা বিরোধের এত শীঘ্র সামঞ্জস্য হইতে চলিল?

এ কথা হয় ত সত্য যে, প্রাচ্যের ভাবুকগণ যখন ইউরোপের সহিত আমাদের সভ্যতা তুলনা করিয়া দেখেন তখন তাঁহারা যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ফলে ব্যক্তিগত শক্তি ফুটিয়া উঠে এদেশে সেই ব্যক্তিত্বের অভাবই বিশেষ করিয়া বোধ করেন। উচ্চ আশায় তাঁহাদের মন একেবারে ভরিয়া গিয়াছে, নবজাগরণের জাতীয় উদ্বোধনের ভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের ধারণা, মানবকে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ লাভ করিতে ও কর্ম্মে পরিণতি লাভ করিতে হইলে তাহার পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা আবশ্যক। তাই তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়ান যে অতীতের কোন্ বিধানের বলে সমস্ত জাতির মধ্যে নেতৃত্বের ভাব সঞ্চারিত করা যায় এবং আশা করেন যে এই সব বিধি-বিধান হইতে মানুষের ব্যক্তিত্ব এমন ভাবে ফুটাইতে পারিবেন যে তাহাতে জাতীয়-জীবন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

(৪)

বর্ত্তমান যুগে জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্যের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রকৃতির অত্যাচার সহ্য করিবার যে প্রবৃত্তি ছিল তাহা দূর হইয়া এখন প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার বাসনা এশিয়ার মনেও জাগিতেছে। সে দিন পর্য্যন্ত প্রাচ্য-জীবনে বিশ্বের রহস্যের দিকটাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। প্রাচ্য বুঝিতে তেমন চায় না, যেমন সে কল্পনা করিতে চায়, ব্যাখ্যা করিতে চায়, ডষ্টয়েভস্কি বলিয়াছিলেন, "রাশিয়াকে বুঝিতে পারা যায় না, রাশিয়াকে বিশ্বাস করিতে হইবে।" (Russia cannot be understood, she must be believed in.) এই ভাব লইয়া

প্রাচ্য চারিদিকে যাহা কিছু উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যময় তাহাতেই মুগ্ধ থাকিতে প্রস্তুত। তাহার মতে জীবনের প্রত্যেক ভাব কোন রহস্যময় আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশমাত্র! সর্ব্বত্রই ভূতযোনি আছে, দরিদ্রতম হিন্দু কৃষকের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল। চীনাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল ভূতযোনীতে পূর্ণ। গভীর বনে, উপত্যকার মধ্যে, জাপানীরা সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তাহাতে কখনও প্রবেশ করে না; কিন্তু সে-সব মন্দির বিদেহ বীর-আত্মার ও দেবতার আবাস। যখন স্তব্ধ সন্ধ্যার নীরবতায় প্রকৃতি শব্দহীন তখন অনেকে জালযুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া সম্ভ্রমের সহিত মন্দির মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস প্রাচ্যজাতির, বিশেষত ভারতীয় ও জাপানাদের বীরপূজায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাহারা মহাপুরুষকে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া গ্রহণ করে, তাঁহাদের পূজা তাহাদের নিকট অতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্য যেন চারিদিকে আধ্যাত্মশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং এই আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর ভিতরই তাহার জীবন বাড়িয়া উঠে।

কিন্তু প্রাচ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় ধারণা প্রচলিত নাই, ধারণাটি এই যে, রহস্যময়ী ও সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির সকল কর্ম্ম এক নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে চলিতেছে। প্রাচ্য জনসঙ্ঘের মনে এখনও যথেচ্ছাচারী ভূতযোনী রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, প্রাকৃতিক নিয়ম এখনও জনসাধারণের মনে ছাপ মারিয়া যায় নাই। জড়জগতের শৃঙ্খলারও এক বিশ্বজনীন নিয়মানুযায়ী সংহতভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভের ধারণা সুদূর অতীতে তাহাদের দর্শনশাস্ত্রে প্রচারিত

হইয়াছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্যে এ ভাব যেমন বহুজনবিদিত, প্রাচ্যে তেমন নয়।

প্রতি প্রাচ্য মনের এইভাব দুই কারণে জন্মিয়াছে; প্রথমত স্বভাবের শক্তি দেখিয়া মানব-মন ভীত ও সঙ্কুচিত হয়, এই সব শক্তির শাস্তা ও নিয়ন্তারূপে সে আর নিজকে ভাবিতে পারে না, দ্বিতীয়ত প্রাচ্যের দার্শনিক মন (philosophical mind) আত্মা লইয়াই এত ব্যস্ত যে সে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্ত্তবাদ লইয়া এক জটিল শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে বটে কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে (Experimental method) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকৃতির রহস্যভেদ করিতে শিখে নাই। কিন্তু আমরা যে শক্তিবাদের কথা আলোচনা করিতেছি তাহাতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রতি প্রাচ্যের মনোভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইবেই। পাশ্চাত্যে মানববুদ্ধি ও শক্তি যে-বিষয়ে এতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে সে-বিষয় প্রাচ্যের অভিজ্ঞতার বাহিরে থাকিবে না। ইহার মধ্যেই জাপানীরা জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে আর ভারতে মহা আন্দোলন চলিয়াছে —সঙ্কীর্ণভাবে প্রাচীনগ্রন্থ অধ্যয়নের প্রচলিত প্রথা বর্জ্জন করিয়া বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার এই যে সদ্য জাগ্রত প্রবল বাসনা, ইহার সহিত প্রাচ্যের গভীরতম ভাব মিশান আছে।

(৫)

কিন্তু প্রাচ্যে যদি এই শক্তিবাদ ও কর্ম্মবাদ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার অন্তরের আধ্যাত্মিক ভাবও সেই সঙ্গে

বর্জ্জন করিতে হইবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। জাপানীরা যে পাশ্চাত্য প্রণালীর সাহায্যে শক্তিলাভ করিয়াছে, তাহা শুধু আপন আদর্শ ও সভ্যতা আরও দক্ষতার সহিত রক্ষা করিবার জন্য। "শক্তি সঞ্চয় কর যেন নিজত্ব বজায় রাখিতে পার" (Make yourself strong so that you may retain the right to be yourself)—শুধু জাপানের নয়, চীন ও ভারতের মনোভাবও ইহাই বলিয়া মনে হয়, বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করা কর্ম্মজগতে শ্রেয় বটে, কিন্তু মানুষের আত্মা, তার মনোজগতের রহস্য, মানবাত্মার অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা, এই সব ভাব জড়জগতের যে-কোন ব্যাপার অপেক্ষা তাহাকে অধিক মুগ্ধ করিবে। এই উদার আধ্যাত্মভাব পৃথিবীকে দিবে, সংসারে ইহা চিরস্থায়ী করিবে, ইহাই প্রাচ্যের প্রধান কাজ—প্রাচ্যের নিকট ইহা অতি উৎসাহের ও উদ্দীপনার কথা। প্রাচ্য জানে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়—তাহার ব্যষ্টির উন্নতি, কর্ম্মজগতে শক্তিবিকাশ, সরল ও সুন্দর কার্য্যপ্রণালী, জটিল যন্ত্রতন্ত্র, এ সকলের মূল্য প্রাচ্য বোঝে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও ভাল করিয়া জানে যে, মানুষের আত্মা শুধু এইসব উন্নতি, এইসব বাহিরের সিদ্ধি দিয়া সর্ব্বদা অভীষ্ট লাভ করে না, জানে যে যন্ত্রতন্ত্র আত্মাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে, কলের চাপে মানুষের চিত্তবৃত্তি একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। যখন সে দেখে অতি গভীর চিন্তারাজ্যেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জড়বাদ ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না, তখন সে অনুভব করে যে প্রাচ্যেরও একটা কথা বলিবার আছে এবং সে কথা জগৎ শুনিবে। প্রাচ্য আশা করে, এই জড়বাদ হইতে সংসারকে সে মুক্তি দিবে। ঠিক কোন্ পথে কেমন করিয়া দিবে তাহা এখনও পরিষ্কার বুঝিতে

পারা যায় না; কিন্তু পাশ্চাত্য যেমন তাহার কর্ম্মজগতে প্রাধান্যে গৌরব বোধ করে, প্রাচ্যও তেমনই এই চিন্তা হইতে আশা ও সান্ত্বনা লাভ করে যে তাহার আধ্যাত্মিকতা জগৎকে মুক্তি দিবে। আধ্যাত্মিক জগতে যে-বস্তুর মূল্য আছে সেই বস্তু লাভের জন্য যদি প্রাচ্যে তাহার নবজাগ্রত শক্তি প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত।

সাহিত্য বনাম পলিটিক্স।

——ঃ০ঃ——

গত পয়লা জানুয়ারি তারিখে একটি বন্ধুর বাড়ীতে আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোকের সঙ্গে বহুকাল পরে আবার দেখা হয়, তিনি প্রথম কথা যা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে হচ্ছে এই—

"এখন তুমি কি করছ?"

আমি উত্তর করলুম—"বিশেষ কিছুই না।"

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন—

"হাঁ আমিও তাই মনে ভেবেছিলুম। কি কংগ্রেস কি কন্‌ফারেন্স, কোন দলেই তোমার নাম দেখতে পাই নে। পলিটিক্সে যোগ দেও না কেন?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একজন প্রবীন মডারেট বলে উঠলেন—

"ওদের কথা ছেড়ে দিন। ও সাহিত্য নিয়েই বসে আছে, যেমন ওর ভাই রয়েছে শিকার নিয়ে"।—এ কথার কোনও জবাব খুঁজে না পেয়ে একটু ভদ্রতার হাসি হাসলুম। কেন না আমার সাহিত্য-চর্চ্চার সঙ্গে আমার অগ্রজের মৃগয়াচর্চ্চার যোগাযোগটা কোথায় এবং কতখানি তা ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। মনে হল যে হয়ত লোকের শ্বাস যে আমার ভ্রাতা যেমন জঙ্গলের বাঘ ভালুকের উপর গুলি

চালান আমিও তেমনি মনোজগতের চতুষ্পদদের উপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করি। ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে ভদ্র-সমাজে বাক্য-সম্বরণ করা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই শ্রেয়।

এই ঘটনার দিন দুই তিন পরে আইন ব্যবসায়ীদের একটি আড্ডায় কার্য্যগতিকে উপস্থিত হবামাত্র জনকয়েক যুবক এসে, আমি কেন পলিটিক্সে যোগ দিই নে, সেই বিষয়ে যৌবনসুলভ মুরুব্বিয়ানা সহকারে আমার কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমি উত্তর করলুম—"শরীরে যে সব গুণ থাকলে মানুষে পলিটিসিয়ান হতে পারে আমার দেহে সে সব গুণ নেই বলে।"

এ জবাব তাঁদের কাছে অবশ্য গ্রাহ্য হল না। তাঁদের ধারণা যে রক্ত মাংসের শরীরমাত্রই পলিটিসিয়ান হবার পূরো ক্ষমতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। নইলে তাঁরা পলিটিসিয়ান হলেন কি করে? অতএব স্থির হল, পলিটিক্স থেকে আলগা হয়ে থাকায় আমি দেশের প্রতি আমার আসল কর্ত্তব্য অবহেলা করছি। এ অভিযোগের কি প্রতিবাদ করব মনে ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একটি নবীন Extremist বলে উঠলেন—

"কেন উনি ত বাঙলা সাহিত্য লিখছেন, সেও ত একটা মন্দ কাজ নয়। Artistic কাজ করবার জন্যও ত দেশে দুচার জন লোক চাই।"

বাঙলা লেখাটা একেবারে অকাজ নাও হতে পারে, এ সন্দেহ যে ইংরাজি বক্তাদেরও আছে এর পরিচয় পেয়ে আমি অবশ্য চমৎকৃত হলুম, বিশেষত যখন শুনলুম যে আমরা যা করি পলিটিসিয়ানদের মতে সেটি হচ্ছে আর্টিষ্টিক কাজ। বুঝলুম যে রাজনীতির বিশ্বকর্ম্মাদের বিশ্বাস, তাঁরা যে মাতৃমূর্ত্তি গড়ে তুলছেন তার সাজের জন্য আমরা আগে

থাকতেই পাঁচ রকম সোনা রুপোর নয়, রাঙতার অলঙ্কার বানিয়ে রাখছি। এ অবস্থায় চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলুম। কিছু বলতে হলে বলতে হত এই কথা যে, তোমরা যদি সত্যসত্যই মায়ের প্রতিমা গড়ে তুলতে কৃতকার্য্য হও তাহলেও তার প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে আসতে হবে, আর এ যুগে যারা মনের কারবার করে তারাই হচ্ছে যথার্থ ব্রাহ্মণ, বাদবাকী সকলে অন্তত এদেশে, হয় বৈশ্য, নয় শূদ্র। বলা বাহুল্য এ জবাব artistic হত না, অর্থাৎ—শ্রোতাদের কাছে তাদৃশ শ্রুতিমধুর হত না।

(২)

উপরোক্ত দুটি ঘটনাই সম্পূর্ণ সত্য, তিলমাত্র কাল্পনিক নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজকের দিনে দেশের পলিটিক্স সম্বন্ধে কারো পক্ষে উদাসীন হওয়াটা কেউ সঙ্গত মনে করেন না। শুধু তাই নয় অধিকাংশ ইংরাজি শিক্ষিত লোকের মতে রাজনৈতিক আন্দোলন করাটা বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে এখন অদ্বিতীয় কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে, এবং যিনি রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে দূরে থাকেন সমাজের কাছে তাঁর একটা জবাবদিহি আছেই আছে, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি হন একজন সাহিত্যসেবী। কেননা যে একমাত্র বস্তু নিয়ে আমাদের পলিটিক্সের কারবার, অর্থাৎ—বাক্য, সে বস্তু সাহিত্যিকদেরও হাতে আছে এবং পলিটিসিয়ানদের অপেক্ষা বেশি পরিমাণেই আছে। কেননা পলিটিক্সের কাজ গুটিকয়েক মুখস্থ বুলির সাহায্যেই চলে যায় কিন্তু সাহিত্যের কাজের জন্য চাই অনেক মনের কথা। পলিটিক্সের কথার নোট বদলাই করে যে অনেক ক্ষেত্রে সিকি পয়সাও মেলে না, তা ভুক্ত-

ভোগী জাতমাত্রেই জানে, অপর পক্ষে সাহিত্যের কথার পিছনে যে অক্ষয় অর্থ আছে এ সত্যও সভ্য জগতের কাছে অবিদিত নেই।

(৩)

দেশের পলিটিক্যাল অবস্থার সঙ্গে সকলের স্বার্থ যে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে জড়িত সে জ্ঞানটা অবশ্য আমাদেরও আছে, কেন না এ জ্ঞানলাভের জন্য দিব্যদৃষ্টির দরকার নেই, কিন্তু তাই বলে পলিটিক্সে হাত লাগাবার সবারই যে সমান অধিকার আছে একথা চট্‌করে মানা কঠিন। সে কথা মানতে হলে এ কথাও মানতে হয় যে ও-বিষয়ে বিশেষকরে কারও অধিকার নেই, অর্থাৎ—ও হচ্ছে সমাজের একটা বেওয়ারিস মাল। আসলে কিন্তু ও হচ্ছে সংসারের আর পাঁচ রকম ব্যবসার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যবসা, এবং এ ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ীর ভিতর বিস্তর প্রভেদ আছে। তবে যে পলিটিসিয়ানরা যাকে পান তাকেই দলে টানতে চেষ্টা করেন, সে শুধু দল পুরু করবার জন্য। এবং যে যত বেশি অনধিকারী তাকে ধরে যে এঁরা তত বেশি টানাটানি করেন তার কারণ, নেতারা জানেন যে ঐ শ্রেণীর লোক তাঁদের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হবে। আর সেই সঙ্গে এও তাঁদের জানা আছে যে এক পক্ষের মেষেরাই অপর পক্ষের উপর বাঘ হয়ে বসে। এ সত্বেও সাহিত্যিকদের এক্ষেত্রে টেনে আনা বৃথা। এ জাতীয় জীবরা পলিটিক্সের সিংহব্যাঘ্র হতে যেমন অক্ষম, গড্ডলিকা হতে তার চাইতেও বেশি অক্ষম। এরা সব একবর্গা লোক।

সে যাই হোক। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, পলিটিক্সে মেতে যাওয়াটা সাহিত্যিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। ইউরোপের ইতি-

হাসে এর প্রমাণ পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে পরধর্ম্ম গ্রহণ করা যে ভয়াবহ, এ কথা ত আমরা সবাই ভক্তিভরে যখন-তখনই আওড়াই। এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে সাহিত্যের ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লোকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। যার মন নামক পদার্থ নেই, তারও যে মত থাকতে পারে তার পরিচয় ত নিত্যই পাওয়া যায়। বরং সত্য কথা বলতে হলে, যে ক্ষেত্রে প্রথমটির যত অভাব সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির তত প্রভাব।

আর এক কথা, এ জাতের লোকের হাতে পড়াটা পলিটিক্সের পক্ষেও ক্ষতিকর। পলিটিক্স কবির হাতে পড়লে হয়ে ওঠে ভাবমদমত্ত, দার্শনিকের হাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ঔপন্যাসিকের হাতে অদ্ভুত ও ঐতিহাসিকের হাতে ভূতগ্রস্থ। একথা যে সত্য তার প্রমাণের সন্ধানে কি আর বিদেশে যেতে হবে? কিন্তু পলিটিক্সের মোটা কারবার হচ্ছে তেল-মুন-লকড়ি নিয়ে, অতএব এ কারবারে সাহিত্যিক অংশীদার হলে সে কারবার ফেল মারবারই বেশি সম্ভাবনা। এ কারবারে সাহিত্যিক থাকতে পারেন শুধু, ইংরাজিতে যাকে বলে sleeping partner, সেই হিসেবে। এ হিসেবে এ ব্যাপারে তিনি চিরকালই আছেন কেননা ভাবের মুলধন একা তিনিই যোগান, কাজ চালায় শুধু যত শূন্য বক্রোদারে। পরের ভাবের ধনে পোদ্দারী করবার চাতুরী যিনি জানেন তিনিই না শ্রেষ্ঠ পলিটিসিয়ান!

উপরে যা সব বললুম সে নিজে সাফাই হবার জন্য নয়, কেননা আমি কবিও নই, দার্শনিকও নই, ঔপন্যাসিকও নই, ঐতিহাসিকও

নই, এক কথায় আমি সাহিত্যিকই নই। আমি লেখক বটে কিন্তু সে হচ্ছে টীকা টিপ্পনির, অর্থাৎ—আমার কলম সর্ব্বঘটেই আছে, সে কলম পলিটিক্সের কালিও বার বার মুখে মেখেছে। জন্মের ভিতর কর্ম্ম আমি একবার মাত্র একটি গল্প লিখেছিলুম, কিন্তু সেটি গল্প নয়, "রাম শ্যামের" জীবনচরিত। অনুগ্রহ করে যিনি সেটি পড়বেন তিনিই দেখতে পাবেন যে তার ভিতর কাব্যরস বিন্দুমাত্রও নেই, আছে শুধু ছাঁকা পলিটিক্স এবং সে পলিটিক্সের ভিতর দার্শনিক তত্ত্বের নাম গন্ধও নেই, আছে শুধু নিরেট সত্য।

অতএব আমি যে কেন পলিটিক্সে যোগদান করি নে তার জন্য সমাজের কাছে আমার জবাবদিহি নিশ্চয়ই আছে। আমার কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে, আমি যোগ দিই নে কেননা দিতে পারি নে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক।—

আজকের দিনে পলিটিক্সে যোগ দেবার অর্থ, হয় মডারেটের, নয় extremist-দের ক্ষুরে মাথা মোড়ানো। আমি যে এ দু দল থেকেই তফাৎ থাকি, তার কারণ এ দু'দলের মতামতের ও কার্য্যকলাপের মধ্যে আমি বিশেষ কোনও প্রভেদ দেখতে পাই নে। এ অবস্থায় কাকে ছেড়ে কাকে ধরব? দু'দলেই যা করছেন, পলিটিক্সের পরিভাষায় তার নাম constitutional agitation, তবে প্রথম দল ঝোঁক দেন এর প্রথম পদ, অর্থাৎ—বিশেষণের উপর, আর দ্বিতীয় দল ঝোঁক দেন এর দ্বিতীয় পদ, অর্থাৎ—বিশেষ্যের উপর, এই যা তফাৎ। এ ছাড়া আর যা প্রভেদ আছে সে হচ্ছে আসলে প্রকাশের ভাষায় ও ভঙ্গীতে, অর্থাৎ—এ দু'দলের আসল পার্থক্য হচ্ছে রীতিগত, ইংরাজীতে যাকে বলে style, তাই নিয়ে এঁদের যত দলাদলী। যাঁরা নিজেদের মডারেট বলেন তাঁদের

বাক্য প্রধানত করুণ রসাত্মক, আর যাঁরা নিজেদের extremist বলেন তাঁদের বাক্য প্রধানত বীররসাত্মক। এ ত হবারই কথা, কেননা মডারেটরা দেশ উদ্ধারের উপায় বা'র করেছেন বুরোক্রাসির সঙ্গে গলাগলি করা, আর extremist-রা উপায় স্থির করেছেন বুরোক্রাসিকে গালাগালি করা। পলিটিক্সে এ উভয় রীতির যে কোনই সার্থকতা নেই, এমন কথা আমি বলি নে, তবে অস্থানে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করলে এই গলাগলিটে আমার কাছে যেমন দৃষ্টিকটু, এই গালাগালিটেও আমার কাছে তেমনি শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে। এই দু'পক্ষের কৃতকার্য্যতার দুটি টাট্‌কা উদাহরণ নেওয়া যাক। মডারেটরা সেদিন টাউনহলে এক সভা করে যে সব বক্তৃতা করেছিলেন তার সুর এমন মিনমিনে যে তা শুনে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা চুরি করে আমার বলতে ইচ্ছে যায় "সালসা খাও, সালসা খাও"! তারপর extremist দল সেদিন গোলদিঘিতে লর্ড সিংহের পিছনে যে রকম ফেউ লেগেছিলেন তা শুনে আবার দ্বিজেন্দ্রলালেরই কথা চুরি করে দেশের লোককে বলতে ইচ্ছে যায় "ঘটিবাটি সামলা"! আমার মতে আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দেওয়ায় যেমন আত্মসংযমের পরিচয় দেওয়া হয় না, তেমনি আত্মসংযমে জলাঞ্জলি দেওয়ায় আত্মমর্য্যাদার পরিচয় দেওয়া হয় না। তার উপর নাকিকরুণ ও খেঁকি-বীর—এ দু'ই আমার কানে সমান বেসুরো লাগে। রস মাত্রেই ব্যভিচারী হলে বিভৎস হয়ে পড়ে, তা সে ছিঁড়েই যাক আর গেঁজেই উঠুক। জানি যে এ কথায় আমার সঙ্গে শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোক সহানুভূতি করবেন না। কিন্তু কি করা যাবে—শাস্ত্রেই বলে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। এ কথা শুনে রাজনৈতিকের দল যদি চটে বলেন যে রাজনীতিতে সুরুচির কোনও স্থান নেই, তাহলে অবশ্য

আমাকে নিরুত্তর থাকতে হবে। রাজনীতিতে সুনীতির যে কোনও স্থান নেই তার প্রমান ত আজকের দিনে মহা মহা দেশের মহা মহা পলিটিসিয়ানরা সকাল-বিকেল দিচ্ছেন, অতএব সুরুচি কোন্ দলিলে সেখানে প্রবেশ লাভ করবে?

মরুক গে সুনীতি আর সুরুচি। রাজনীতির রাজ্য হতে ও-দুটিকে নির্ব্বাসিত করে দিলেও সেই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিকেও যে গলাধাক্কা দিতে হবে এমন কথা বর্ত্তমান ইউরোপীয় পলিটিক্সের আদিগুরু স্বয়ং Machiavelli-ও বলেন না এবং একটু ভেবে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, ও দু'দলের কোন দলে যোগ দেওয়াটা আজ সুবুদ্ধির কার্য্য হবে না। কারণ কালে এ দু'দলের কোন দলই টিকে থাকবে না, সত্য কথা বলতে গেলে, এর একটি দল ত ইতিমধ্যে গত হয়েছে। মডারেট দল ত সেদিন আত্মহত্যা করেছে, সম্ভবত অচিরাৎ সরকারী স্বর্গ লাভ করবার আশায়। আমাদের পরস্পরের ভিতর নানা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগ সম্বন্ধে ত কোনরূপ মতভেদের অবসর নেই। যার শরীরে মানুষের চামড়া আছে তার গায়েই ত পণ্টনি চাবুক কেটে বসেছে। সুতরাং অমৃতসহরের দিকে যাঁরা পিঠ ফিরিয়েছেন পলিটিক্যাল হিসেবে তাঁরা যে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, সে কথা বলাই বেশি।

তারপর রিফরম্ বিল আমাদের পলিটিক্সের বনেদ নতুন করে পত্তন করেছে। এতদিন আমাদের পলিটিক্স দুই চোখ আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে ছিল ইংরাজী বইয়ের উপর, ভবিষ্যতে তার এক পা নামাতে হবে বাঙলার মাটীতে; সেই সঙ্গে আমাদের পলিটিক্সের এক চোখ রাখতে হবে প্রভুদের উপর, আর এক নজর দিতে হবে দাসেদের উপর। এ ভঙ্গীটি সুদৃশ্যও নয়, সহজসাধ্যও নয়। উপরন্তু অবস্থাটা

হবে টলমলায়মান। কিন্তু উপায় কি? ডু-ইয়ারকি সামলানো ইয়ারকির কথা নয়। কথার রাজ্যথেকে একধাপ নেমে আমাদের কাজের রাজ্যে আসতেই হবে। এ কাজের জন্য নূতন দলের দরকার।

(৪)

অতঃপর ধরে নেওয়া যাক্, যে এদেশে ডিমোক্রাসির গোড়াপত্তন হয়েছে। আর ডিমোক্রাসির অর্থ যে, Sovereignty of the people, এ তথ্য কংগ্রেস সেদিন মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসাধারণের কাছে ইংরাজি ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এখন দেখা যাক্ people শব্দের অর্থ কি। কোনো দেশের সকল লোক মিলে কখনো একটা people হতে পারে না, এক ভাষায় ছাড়া; কেননা শিক্ষা দীক্ষা অর্থ সামর্থ্যের প্রভেদ অনুসারে একটা জাতি নানা জাতিতে বিভক্ত। এবং এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থও এক নয়, সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির পথও এক নয়, বরং অনেক স্থলে এদের ভিতর একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী। এই কারণে ডিমোক্রাসির দৌলতে যে রাজশক্তি people-এর হাতে আসে তাও বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর কালক্রমে এই বিভিন্ন অংশের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশেও আজ না হোক্ কাল তা হবে, যেহেতু তা হতে বাধ্য। সুতরাং এই হস্তান্তরিত রাজশক্তি কোন্ শ্রেণীর ভাগে কতটা পড়ল সেইটি জানতে পারলেই জানতে পারা যায় যে, এই Sovereignty কোথায় গিয়ে মজুত হল।

সকলেই জানেন, এ তন্ত্রে ভোটশক্তিই রাজশক্তি। এই রিফরমের প্রসাদে আমাদের demos, অর্থাৎ—চাষাভুষো রাতারাতি কম করেও তের চৌদ্দ লাখ ভোটের মালিক হয়ে উঠেছে আর বাদবাকী আমাদের

সবার কপালে লাখ কতকের বেশি জোটে নি, তাও আবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে।

ফলে দাঁড়াল এই যে, বাঙলার প্রজা অতঃপর হল বাঙলার রাজা।

এর উত্তরে অনেকে বলবেন, দানের রিফরমে জনগণ ত একদম পুরো রাজত্ব পেলে না, পেলে শুধু স্বরাজের শিক্ষানবিশী করবার অধিকার। তথাস্তু। তাহলে প্রজাবাহাদুর যে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন একথা অস্বীকার করবার আর যো নেই। অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ-পলিটিক্সের কাজ হবে এই যুবরাজের মোসাহেবি করা। যাঁরা মনে করছেন যে তাঁরা এ ক্ষেত্রে উক্ত রাজা হবুচন্দ্রের মোসাহেবি না করে তাঁর উপর সাহেবি করবেন তাঁদের ভুল দু দিনেই ভাঙবে। আমরা যা করব সে হচ্ছে এই—আমরা সবাই আমাদের হবুরাজকে বলব, lend me your ears. কেউ বা সে কান চেপে ধরবার জন্যে, কেউ বা তাতে মন্ত্র দেবার জন্যে। দু'জনেরই উদ্দেশ্য হবে এক। কান টানলে মাথা আসে, সুতরাং প্রজার কর্ণধার হয়ে তার মাথাকে ভোট আফিসে টেনে নিয়ে যাওয়াই উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়। প্রভেদ যা, তা উপায়ে। কেউ বা স্বকার্য্য উদ্ধার করতে চাইবেন অর্থ বলে, কেউ বা বাক্য বলে। এ অবস্থাতেও আমাদের পলিটিক্সে আবার দু-দল হবে। তবে মোটামুটি ধরতে গেলে একদল প্রজারাজকে গালাগালী করবার জন্যে প্রস্তুত হবেন আর একদল প্রজারাজের সঙ্গে গলাগলি করবার জন্যে প্রস্তুত হবেন। কিন্তু এ দু'দলেরও পরমায়ু এক ইলেকসান পেরুবে কি না সন্দেহ। এই দু-দলের টানাটানিতে ও চেঁচাচেঁচিতে হবুরাজ যখন চোখ রগড়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবেন তখন এ দু-দল ভেঙ্গে আবার দুটি নতুন দলের সৃষ্টি হবে।

যখন জনগণের তাড়নায় পলিটিক্সের তাস আবার নতুন করে ভাঁজা হবে তখন কালো লাল সব সাহেবগুলো এক দিকে জড় হবে আর কালো গোলাম আর এক দিকে, বলা বাহুল্য লাল গোলাম এদেশে নেই, সব সাহেব আর টেক্কা ?—যে মারতে পারে সেই হবে। বিবির কথা উল্লেখ করলুম না এই জন্যে যে, আমাদের পলিটিক্সের নতুন জুয়োখেলায় লাল কালো নির্ব্বিচারে বিবি বাদ দেওয়া হয়েছে। গত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু এর জন্য মনের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর সহাশ্রুপাতী। এঁদের Communal representation না দেবার কোনোরূপ ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। যে সব কারণে নানা সম্প্রদায়কে বিভিন্ন representation দেওয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সে সকল কারণ একাধারে বর্ত্তমান। প্রথমত স্ত্রীজাতি যে পুরুষ হতে স্বতন্ত্র জাতি, সে জ্ঞান পশুপক্ষী গাছপালাদেরও আছে। এ জাতিভেদ স্বয়ং ভগবানের হাতে তৈরি। এরা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র চিরস্থায়ী separate community, এবং অন্তত ভারতবর্ষে খাঁটি community. এদেশে পুরুষ যথার্থ পুরুষ না হলেও মেয়ে যে যথার্থ মেয়ে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত এরা অশিক্ষিত। তৃতীয়ত যদিচ এরা দ্বিজমাত্রকেই জন্ম দেয় তবু নিজেরা দ্বিজ হতে পারে না, এরা সব শূদ্র। চতুর্থত এরা অস্পৃশ্য না হলেও Depressed class. পঞ্চমত এরা লাটসভার গৃহসজ্জারূপে যে যে পরিমাণ সে সভার শোভাবৃদ্ধি করতে পারত অপর কোনও জরিজরাবতপরা পগ্‌গধারী সম্প্রদায় তার সিকির সিকিও পারবে না। তারপর এদের সঙ্গে আমাদের entente cordiale বহুকালথেকে রয়েছে এবং

কস্মিনকালেও যাবে না। আর এককথা, এঁরা লাট সভায় বসলে গভর্ণমেণ্টকে minister নির্ব্বাচনের জন্য আর ভাবতে হত না। স্ত্রী-মন্ত্রীকে কেউ ঘাঁটাতো না। ও শাসনে আমরা অভ্যস্ত Home Member হবার জন্য ত এঁদের প্রত্যেকেই সবিশেষ উপযোগী। কিন্তু যেহেতু উক্ত মন্ত্রীপদ গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রেখেছেন তখন হস্তান্তরিত বিষয়কটির মধ্যে একটির minister ত ভারতরমণীকে অনায়াসে করা যায়, অর্থাৎ—Educational Member! সুতরাং এত গুণ সত্ত্বেও এরা যে সাম্প্রদায়িক ভোট পেলে না, এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নেই। তবে কংগ্রেসের দল ভরসা দিয়েছেন যে আমাদের যে-সব দাবী এ ফেরা গ্রাহ্য হয় নি, অতঃপর সে সবের জন্য তাঁরা তুমুল আন্দোলন করবেন। আন্দোলনটা প্রধানত অবশ্য এই স্ত্রী-ভোটের জন্যই করা হবে তাহলে তাঁরাও এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারবেন। তখন আমাদের রাজনৈতিক দোল হয়ে উঠবে ঝুলন। এর চাইতে উল্লাসের কথা আর কি আছে?

সে যাই হোক বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতঃপর একটি বৈশ্যের দল আর একটি শূদ্রের দলের সৃষ্টি হবে। এবং এই দুটি দলের মধ্যস্থতা করবার জন্য প্রয়োজন হবে আর একটি ব্রাহ্মণ দলের, যারা এই পরস্পর বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য করে প্রজাশক্তিকে যথার্থই রাজশক্তি করে তুলতে চেষ্টা করবে।

(৫)

রাষ্ট্রের মূল শক্তিই যে প্রজাশক্তি, একথা বলাই বাহুল্য। কেননা যে রাজ্যে অধিকাংশ লোক দেহে মনে ও চরিত্রে দুর্ব্বল, সে দেশে

স্বদেশী রাজশক্তি বলে কোন পদার্থ থাকতেই পারে না, সে দেশে সে শক্তি বিদেশী হতে বাধ্য এবং এযুগে সেই বিদেশের যে বিদেশে প্রজাশক্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত, পুঞ্জীভূত ও প্রবল।

এখন দেখা যাক আমাদের হবুরাজের বর্ত্তমান অবস্থাটা কি।—

প্রথম দফা—আজকের দিনে হবুরাজের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই। তিনি নিরন্ন বলে আমাদের চাইতে যে তাঁর ক্ষিধে কম, মোটেই তা নয়। মেয়েরা বলে ছোট ছেলেরা বড়দের তুলনায় হাতে ছোটবড় হলেও পেটে এক। কথাটা ঠিক কি না জানি নে, কিন্তু এটি ধ্রুব সত্য যে ছোটলোকেরা বড়লোকদের তুলনায় পদে ছোটবড় হলেও পেটে এক। সুতরাং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলে সব প্রথমে সে খেতে চাইবে এবং তার জন্য যথেষ্ট অন্নের ব্যবস্থা করতেই হবে, কেননা মুখের কথায় কারও পেট ভরে না, হোক না সে কথা যেমন বিশাল তেমনি রসাল, যেমন প্রচুর তেমনি মধুর। সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও এদের রসদের সুব্যবস্থা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, কেননা অন্নই হচ্ছে প্রাণ।

দ্বিতীয় দফা—হবুরাজের জন্য বস্ত্রেরও ব্যবস্থা করতে হবে। পলিটিসিয়ানদের মতে আমাদের এই গরমের দেশে বেশি কাপড়ের দরকার নেই, কথাটা ঠিক; কিন্তু বেশি না হোক কিছু কাপড় চাই ত, নেংটি কখনো রাজবেশ হতে পারে না! যাতে লজ্জা নিবারণ হয় না তার সাহায্যে রাজার মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় কি করে? তা ছাড়া মন্ত্রী গবুচন্দ্র যখন জামাজোড়া পরে বরবেশ ধারণ করবেন তখন রাজা হবুচন্দ্র ডোরকৌপীন ধারণ করতে আদপেই রাজী হবেন না।

আত্মসম্মান জ্ঞানও হচ্ছে মানবের একটি সামাজিক শক্তি—এবং উক্ত জ্ঞান প্রধানত বস্ত্রজ।

তৃতীয় দফা—হবুরাজের পেটে ভাত না থাকলেও পিলে আছে। এবং সেপিলে অতি প্রবৃদ্ধ, মাপে প্রায় পেট্রিয়টদের হৃদয়ের তুল্যমূল্য। কিন্তু পিলেতে পেট মোটা হলে হাত পা সব সরু হয়ে আসে। তারপর পিলের আর এক দোষ এই যে, যে কেউ যখনতখন তাকে চমকে দিতে পারে। সুতরাং হবুরাজকে যদি মানুষ করে তুলতে হয় তাহলে তার উদরস্থ অতিস্ফীত প্লিহাকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য চাই, পরিষ্কার জল, খোলা হাওয়া, ডাক্তার এবং ওষুধ। যে-দেহে স্বাস্থ্য নেই, সে-দেহে ও সে-মনে যে শক্তি নেই, এর প্রমাণ ত আমরা হাড়ে হাড়ে পাই।

চতুর্থ দফা—হবুরাজ এখন একদম নিরক্ষর। পলিটিসিয়ানরা বলবেন যে রাজা বাহাদুরের পেটে বিদ্যে না থাক্ মাথায় বুদ্ধি আছে। এ কথার প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক। বিদ্যাবুদ্ধি অবশ্য এক বস্তু নয়। বুদ্ধির পরিচয় না দিয়ে বিদ্যের পরিচয় যে লোকে দিতে পারে, তার পরিচয় ত এদেশের আইন-আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যে ও সংবাদ পত্রে নিত্যনিয়মিত পাওয়া যায়। কিন্তু জাতির এ অবস্থা ত আর চিরদিন থাকবে না। একদিকে যেমন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা করতে হবে, আর একদিকে তেমনি আমাদের জনগণকে কিঞ্চিৎ বিদ্যাচর্চ্চাও করতে হবে। বিদ্যাবুদ্ধি এক বস্তু না হলেও ও-দুয়ের যোগাযোগ না হলে দু-ই ব্যর্থ হয়। জ্ঞানও হচ্ছে একটি শক্তি এবং সমগ্র জাতির অন্তরে সে শক্তির সৃষ্টি করতে হবে। অপর কোনও কারণে না হোক্, স্বজাতির আত্মরক্ষার জন্যও হবুরাজকে

কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখানো দরকার। রাজা মূর্খ হলে এত খামখেয়ালি হন যে রাজ্যের দিনে দুবার ওলটপালট হয়।

অতএব অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, এই নালায়েক হবুরাজের আজকে আমরা উচি হয়েছি, তাঁর শিক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার বৃটিশরাজ আমাদের হস্তে সমর্পণ করেছেন। কিন্তু সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাঁর ভরণপোষণ অশনবসনের ব্যবস্থা করা। তেল-নুন-লকড়ির সংস্থান সবারই চাই এবং অধিকাংশ লোকের ও-ছাড়া আর কিছুই চাই নে। মানুষ যদি বেঁচে না থাকে ত বড় হবে কি করে? আর ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যা সত্য, জাতিবিশেষের পক্ষেও তাই সত্য। একটা জাতি কতকগুলো ব্যক্তির সমষ্টি বই ত আর কিছুই নয়। এখন ভেবে দেখুন ত এই রিফরম আমাদের ঘাড়ে কি বিরাট কর্ত্তব্যের ভার চাপিয়েছে।

সত্য কথা বলতে গেলে এ কর্ত্তব্য সম্যকরূপে পালন করবার শক্তি আমাদের একরকম নেই বল্লেই হয়। প্রথমত বাক্‌পটুতা ও কর্ম্মকৌশল এক বিদ্যে নয়। যার ধড়ে এর প্রথম গুণ আছে তার ধড়ে দ্বিতীয়টি না থাকতেও পারে এবং না থাকবারই বেশি সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত দেশের লোকের মনের ও দেহের খোরাক জোগানের পক্ষে দেশের অবস্থা প্রতিকূল। কেন কি বৃত্তান্ত তা বোঝাতে হলে রাজনীতি ছেড়ে আমাকে অর্থনীতির বিচার সুরু করতে হবে। সে আলোচনা আমার অধিকার বহির্ভূত। তবে পলিটিসিয়ানরা সে আলোচনা নিশ্চয়ই তুলবেন, কেন না সকল বিষয়েই তাঁদের সমান নৈসর্গিক অধিকার আছে! আমি আন্দাজ করছি যে আমাদের পলিটিসিয়ানরা যখন এ বিষয়ে মুখ খুলবেন তখন দেখা যাবে যে তাঁদের

মুখ দিয়ে উদ্গীর্ণ হচ্ছে ছেরেফ্ ধূম। এত হবারই কথা, তাঁদের অন্তর যে বহ্নিমান সে কথা তাঁরাই বলেন। পলিটিক্সের সে ধূম পান করে দেশের লোকের মাথা ঘুরে যাবে। ও ধূমপানে বেচারারা ত আমাদের মত অভ্যস্ত নয়। কাজেই তারা নেশার খেয়ালে হাতি ঘোড়া কিনবে কিন্তু "যো হাতি মোলেগা ওত তুরন্ত চলা যায়েগা।" তার পর? এস্থলে আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখছি যে বাঙালী পলিটিসিয়ানদের ইকনমিক্সের মূলসূত্র হবে ইকনমি, অর্থাৎ—ন্যাকামি।

স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন করবার জ্ঞান ও শক্তি আমাদের দেহে আজ না থাকলেও কাল তা সঞ্চয় করা কঠিন হবে না। কিন্তু তার জন্য চাই উক্ত কর্ত্তব্য পালন করবার আন্তরিক প্রবৃত্তি, যা ভদ্র সমাজের অধিকাংশ লোকের ভিতরে আজ যথেষ্ট পরিমাণে নেই। আমাদের সমাজ আমাদের ইতিহাস উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দেহে যে মন গড়ে তুলেছে সে মন সমাজকে গণতান্ত্রিক করে তোলবার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে মনের এ বিষয়ে প্রতিকূলতা অনেকটা কমে এসেছে বটে কিন্তু তাই বলে তাকে আজও নীচুকে উঁচু করবার অনুকূল করে নি। একথা যে সত্য তার পরিচয় ইংরাজি আইডিয়ার আবরণ ভেদ করে নিজের নিজের মনের দিকে তাকালে ইংরাজি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান মাত্রই অবিলম্বে পাবেন।

সুতরাং আমরা যদি সত্য সত্যই স্বজাতিকে স্বরাট করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের কর্ত্তব্য হবে নিজের নিজের মন বদলানো, চরিত্র বদলানো এবং তার জন্য চাই বহু পূর্ব্ব-সংস্কার, বহু অভ্যস্ত মত, বহু সঙ্কীর্ণ ধারণা বর্জ্জন করা। কিন্তু এ পরামর্শ দেওয়া যত

সহজ, নেওয়া তত সহজ নয়। যে সকল ভাব যুগযুগের দাসত্বের আওতায় আমাদের মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত শিকড় নামিয়াছে এক দিনে সেই আগাছাগুলিকে সমূলে উপ্‌ড়ে ফেলবার জন্য যে পরিমাণ মনের সাহস ও শক্তি চাই তা আমাদের নেই। অথচ আমরা যদি জাতকে জাত মানুষের মত মানুষ হতে চাই তাহলে এ অসাধ্য সাধন আমাদের করতেই হবে। আর এই মন বদলাবার ভার পড়বে বিশেষ করে সাহিত্যের হাতে, সুতরাং সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিক্সের মোক্তার হয়ে ওঠেন, সাহিত্য যদি পলিটিক্সে লীন হয় তাহলে দেশ আজ যে তিমিরে আছে কালও সেই তিমিরেই থাকবে। অতএব নবীন সাহিত্যিকদের কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁরা মনোজগতের চতুষ্পাদদের উপর তীর চালান, হোক না তাঁদের পদগৌরব যত বেশি, আর যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা ধ্যানবলে মায়ের সর্ব্বললামভূতা যৌবনাঢ্যা অপাপবিদ্ধা অনবদ্যাঙ্গী মানসীমূর্ত্তি গড়ে তুলুন যে আদর্শমনশ্চক্ষুর সুমুখে দেশের কর্ম্মীর দল ভারত-সভ্যতার সেই জাগ্রতপ্রতিমা গড়ে তুলবে—বিশ্বমানব যা পূজা করতে প্রস্তুত হবে।

আমি কিন্তু এখন চললুম সাহিত্য ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ দিতে, তবে যদি কোন পলিটিক্সের স্কুলে, বয়েস বেশি হয়ে গিয়েছে বলে আমাকে ভর্ত্তি না করে, তাহলে যেখানে ছিলুম সেখানেই আবার ফিরে আসব, অর্থাৎ—সাহিত্য ও পলিটিক্সের মাঝামাঝি একটা জায়গায়।

বীরবল।

টীকা ও টিপ্পনী।

——::——
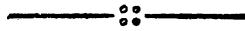
দ্বিজেন্দ্রলাল একবার বড় দুঃখে বলেছিলেন "বলিত হাসব না" ইত্যাদি।

কিন্তু তাঁর সে দুঃখের কথা শুনে দেশসুদ্ধ লোক হেসেছিলেন। কিন্তু যে-কেউ কখনো হাস্যবর্জ্জন করবার জন্য স্থিরসংকল্প হয়েছেন তিনিই জানেন যে দ্বিজেন্দ্রলালের দুঃখ কতদূর মর্ম্মান্তিক। দেশের লোক আমাদের কিছুতেই ঠোঁটের উপর ঠোঁট দিয়ে থাকতে দেবে না। তারা থেকে থেকেই এমন কথা বলবে, এমনি অঙ্গভঙ্গী করবে যাতে করে আমরা দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হব।

দেশের এই ছোটবড় লাট দরবারগুলোতে থেকে থেকেই যে সব প্রহসনের অভিনয় হয় তা দেখে যিনি হাস্যসম্বরণ করতে পারেন তিনি হয় মুক্তপুরুষ, নয় জড় পদার্থ।

এই দেখনা সেদিন সেখানে কি কাণ্ড ঘটল। বড়লাটের রাজপাট কোথায় বসানো হবে তাই নিয়ে সেদিন সেখানে তুমুল আলোচনা, জোর ও ঘোর তর্ক হয়ে গেছে।

প্রস্তাব ছিল দুটি।—

প্রথম—লাটপাট যেখানে হোক এক জায়গায় গাড়া উচিত। ডেরাডাণ্ডা নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানটা বে-সরকারী মেম্বরদের মতে যেমন অর্থহীন তেমনি অর্থসাপেক্ষ। রাজার পক্ষে সন্ন্যাসীর

আচরণ এদেশে শোভা পায় না—কেননা এর একজন হচ্ছেন সমাজের কেন্দ্রস্থল আর একজন তার বাইরে।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহাবক্তৃতা করেছিলেন কিন্তু সরকারী জবাব হ'ল—যখন রাজাসন বাঙলার মাটী থেকে তোলা হয়েছে তখন permanent settlement-এ সরকার আর রাজি নন।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল যে, যাঁরা এ প্রস্তাবের পক্ষে মহা ওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিপক্ষে ভোট দিলেন।

এ ব্যাপার দেখে যাঁর চোখে জল আসে তাঁর আসুক আমার কিন্তু বেজায় হাসি পায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—রাজধানী যেখানে ছিল সেখানেই ফিরিয়ে আনা হোক, অর্থাৎ—কলিকাতায়। দিল্লির আব-হাওয়া নাকি শুধু শরীরের পক্ষে নয়, মনের পক্ষেও মারাত্মক। অপর পক্ষে কলিকাতা সহরে ম্যালেরিয়া নেই আর যদিও থাকে ত বস্তিতেই আছে—বড়লোকের ঘরে তা বড় একটা ঢুকতে পারে না আর সাহেবলোকের ঘরে মোটেই পারে না। তারপর মনের আব-হাওয়া এ সহরে যতটা চাঙ্গাকর, ইংরেজীতে যাকে বলে bracing, ভারতবর্ষের অপর কোথাও তত্তুল্য নয়। বোম্বাই সহরে হাওয়ার ভিতর কলের ধোঁয়া ঢুকেছে, দিল্লিতে কবরের ধূলো আর মান্দ্রাজের মনোবায়ুর মধ্যে অক্সিজেন নেই।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহা মহা বক্তৃতা করলেন। এর উত্তরে সরকারী জবাব হল, "তোমরা যা বলেছ সে সবই ঠিক, বিশেষত ঐ মানসিক জলবায়ুর কথা। কলিকাতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর থেকে দূরে থাকায় সরকার কি বিরহ বেদনা সহ্য করছেন তা সরকারই

জানেন, তবে কি না গতস্য শোচনা নাস্তি। বড় লাট যখন কলিকাতাকে একবার তালাক দিয়েছেন তখন তাকে আবার নিকে করা অসম্ভব, বিশেষত যখন তার খরচা বেজায়।”

এ জবাবের নির্গলিতার্থ পুনর্মূষিক হতে কোন সিংহই রাজি হয় না, উপব্রিটিশ সিংহও নয়।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল, যাঁরা এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে মহাওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। লাটসভায় আমরা মুখ খুলি এক দিকে আর একদিকে হাত তুলি। এ ব্যবহার দেখে যাঁর কাঁদতে ইচ্ছে যায় তিনি কাঁদুন, আমি কিন্তু না হেসে থাকতে পারি নে।

(২)

লাটসভা দিল্লিতেই বসুক আর ফতেপুর শিকরীতেই বসুক তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, কেননা সে সভায় আমি কখনো বসব না। এ ত আর আকবর বাদশার দরবার নয় যে বীরবল সেখানে উচ্চাসন পাবে? কিন্তু লাটপাট কলিকাতায় কায়েম হলে একটি কারণে খুসি হতুম।—

লাটদরবারে দেশী মেম্বরেরা নানারূপ সেজেগুজে যে নানা ছাঁদে অভিনয় করেন তাতে আমার কোনই দুঃখ নেই কিন্তু দুঃখ এই যে বাঙলার যত এরণ্ড দিল্লির মরুভূমিতে সব দ্রুমায়তে।

আজ দুদিন হয় নি, পাটেল বিলের বিচারস্থলে কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও হাটখোলার শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, বাঙলা দেশে nobody who is any body

পাটেলবিলের স্বপক্ষে। আমি হলপ করে বলতে পারি যে লাট-দরবার কলিকাতায় বসলে উক্ত দরবারীযুগল এ হেন উচ্চভাষ কখনই করতে পারতেন না, কেন না এ সত্য তাঁদের কাছে কিছুতেই অবিদিত থাকতে পারে না যে, বাঙলার সুবুদ্ধি তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতো।

তবে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নন্দী-রায় কোম্পানি লাটসভায় যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর দেওয়া সুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব। আমরা কেউ বলতে পারি নে আজকের দিনে বাঙলায় somebody কে? কেননা somebody-ত্ব যে কিসের উপর নির্ভর করে, শিক্ষা-দীক্ষার উপর না বংশাবলীর উপর, জাতির উপর না গুণের উপর, বাক্‌পটুতার উপর না কর্ম্মশঠতার উপর, টাকা ধার দেওয়া না নেওয়ার সামর্থ্যের উপর, টিকির উপর না টেড়ির উপর? এ সব প্রশ্নের জবাব আমরা কেউ করতে পারি নে। অতএব আমরা মানতে বাধ্য যে বাঙলায় অদ্য তারিখে nobody is anybody.

অপর পক্ষে আমরা দেখতে পাই রাম শ্যাম যদু হরি প্রত্যেকেই somebody হয়ে উঠেছেন। যাঁর বিদ্যে নেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের দলভুক্ত হচ্ছেন, যিনি কোন ভাষাই জানেন না তিনি সকল ভাষাতেই বক্তৃতা করছেন, যাঁর রোকড়খতিয়ান ব্যতীত অপর কোনও বইয়ের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই তিনি সাহিত্যের সমালোচনা করছেন, শূদ্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছে, নবশাখ ব্রাহ্মণ সমাজের গোষ্ঠিপতি হয়ে উঠছে। অতএব একথাও আমরা মানতে বাধ্য যে বাঙলায় অদ্যতারিখে everybody is somebody.

এই প্রমাণ যে ইংরাজি শিখেও ইংরাজি শাসনের ফলে হিন্দুসমাজ একদম ভেস্তে গেছে, শাস্ত্রসঙ্গত ও আচারগত উচ্চনীচের অধিকার ভেদ কার্য্যত কেউ মানে না ও কেউ কাউকে মানাতে পারে না। যে জাতিভেদ প্রথা সমাজে ঢিলে হয়ে গেছে সেই প্রথা আইনে কশে রাখবার বিরুদ্ধে পাটেলবিল হচ্ছে একটি প্রতিবাদ মাত্র। অতএব উক্ত বিলের বিপক্ষতাচরণ করা সমাজে প্রোমোশন প্রাপ্ত somebody-দের পক্ষে শোভা পায় না। তবে সংসারের নিয়মই এই যে, যার পক্ষে যা শোভা পায় না তাই করতে সে চির উদ্যত। এ ব্যাপারের একটি বিলেতি নজির দেখাচ্ছি। বেশি দিনের কথা নয় ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকে গির্জ্জেয় গিয়ে ভগবানের কাছে যে এই প্রার্থনা করত—

"God bless the squire and his relations
And keep us in our proper stations"—

এ কথা ইংলণ্ডের লোক আজ বিশ্বাসই করতে পারে না। সুতরাং আশা করা যায় যে Squire-এর জায়গায় ব্রাহ্মণ বসিয়ে আজ অব্রাহ্মণেরা ইংরাজরাজের কাছে যে ঐ স্তবই পাঠ করছেন, ভবিষ্যতে বাঙালী সে কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না, অবশ্য ভবিষ্যৎ বলে এ দেশের যদি কিছু থাকে। ইতিমধ্যে আমরা একটু হেসে নিই।

(৩)

আমাদের শিক্ষিত সমাজে হরেক রকমের অদ্ভুত জীব আছে কিন্তু এদের মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত হচ্ছে টিকিওয়ালা ডিমোক্রাট। লোক হাসাতে এঁরা অদ্বিতীয়। একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ নেওয়া যাক। সেদিনকের লাটদরবারে সবাইকে অবাক্ করেছেন M. R.

Ry. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। উক্ত ইংরেজি অক্ষর ক'টি সাটে কি বলতে চায় জানি নে। আমার একটি সঙ্কেতজ্ঞ বন্ধু বলেন, "ওর অর্থ Madras Rohilkhund Railway." এ ব্যাখ্যা আমি গ্রাহ্য করি। ভৌগোলিক হিসেবে উক্ত দুই প্রদেশের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনও যোগাযোগ না থাকলেও ঐতিহাসিক হিসেবে আছে। রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকেই কিস্কিন্ধাতে গিয়েছিলেন এবং সেইসূত্রে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের যে মিলন হয় সেই মিলনের ফল হচ্ছে দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ—তাই দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ মাত্রেরই মাথায় M. R. Ry. ছাপ মারা থাকে।

উপরোক্ত রঙ্গস্বামী একজন দুর্দ্ধর্ষ extremist. রাজনীতির ক্ষেত্রে লিবাড়াটি ইকোয়াড়িটি ও ফেড়াটাড়নীটি এই কথা ক'টি ইনি এবং এঁর দলবল এমনি তারস্বরে ঘোষণা করেন যে তা শুনলে ভুলে যেতে হয় যে এ দেশটা ভারতবর্ষ আর এ কালটা বিংশ শতাব্দী। মনে হয় আমরা সশরীরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের প্যারি নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অথচ এঁরা পাটেল বিলের যখন নাম শোনেন তখন "গেল ধর্ম্ম" "গেল সমাজ" বলে সমান তারস্বরে ত্রাহি পবননন্দন বলে চীৎকার করতে সুরু করেন। তখন এঁদের উচ্চবাচ্য শুনে মনে হয় যে আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রহ্মাবর্ত্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ দুঃখ করে বলেছেন যে এই পরস্পর বিরোধী মতামত কি করে এক অন্তরে বাস করতে পারে তা তাঁর বুদ্ধির অগম্য। দ্রাবিড়লজিকের খেঁই সিংহ মহাশয় যে ধরতে পারেন না এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হই নি, কেননা তিনি উত্তরাপথের লোক। দক্ষিণাপথ যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করে তখন সে

দেখে আমাদের চমকে ওঠবারই কথা। তবে দ্রাবিড়ব্রাহ্মণেরা কেন যে উল্টোপাল্টা কথা বলেন, সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে ইংরেজি বচন কেন যে মেলাতে পারেন না তার কারণ ও-দুই হচ্ছে তাঁদের মুখস্থ বুলি, ওর একটিও তাঁদের নিজস্ব ভাষা নয়। তা ছাড়া তাঁদের ভাষার সঙ্গে, কি আমাদের কি ইংরাজের ভাষার কোনই সম্পর্ক নেই, কেননা এ দুটিই হচ্ছে আর্য্য ভাষা এবং তামিল অনার্য্য। তাই ইংরেজি তাঁদের মনে ঢোকে না, ঠোঁটের উপরই থেকে যায়, আর সংস্কৃতও তাঁদের মনে ঢোকে না, কর্ণারূঢ় হয়ে তাঁদেরকে যন্ত্রবৎ চালায়। এঁদের কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যখন এঁরা তামিল বলেন। আজকের দিনে দ্রাবিড়শূদ্ররা কি বলছে সে কথা কি কারো বুঝতে বাকী আছে? দ্রাবিড়ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে দ্রাবিড়শূদ্রের এই বিদ্রোহের কারণ, দক্ষিণা-পথের শূদ্রেরা জানে যে তারা শূদ্র, সে দেশের ব্রাহ্মণেরা সে দেশের অব্রাহ্মণদের এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে দেয় নি। সুধু তাই নয়, দ্রাবিড়ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে আস্কারা পেয়ে আমরা তাঁদের অনুরূপ শূদ্রপীড়ন করিনে বলে আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণদেরও তামিল শূদ্রের সামিল করেছেন। এস্থলে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছি নে।

আজ বছর দেড়েক আগে বড়লাটের দরবারের জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মেম্বর একদিন বাঙলার জনকয়েক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে 'ল-ড়য়োর ভেদাত্মক' ইংরাজি ভাষায় ঘোর আক্রমণ করেছিলেন। তিনি এক-জন দুরন্ত ডিমোক্রাট, তাই বেচারা বাঙালীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এই যে তাদের অন্তরে ডিমোক্রাটিক মনোভাব মোটেই জন্মায় নি। মানুষে মানুষে যে কোনই প্রভেদ নেই, সবাই যে সমান

স্বাধীন, সবাই যে সমান প্রধান, এই সত্য সকলের মনে বসিয়ে দেবার জন্য তিনি "ভাড়াটেয়াড়" কি বলেছেন "ড়বরসোপিয়েড়" কি বলেছেন সেই সব কথা অনর্গল আউড়ে যাচ্ছিলেন। বকতে বকতে তাঁর জল-পিপাসা পেল, জল এল কিন্তু তা পান করবার সময় তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে নববধূর মত অবগুণ্ঠনবতী হলেন। কেন জানেন?—পাছে বাঙালী ব্রাহ্মণের অনার্য্য দৃষ্টিপাতে তাঁর পানীয় জল অপেয় হয়ে ওঠে! তিনি তাঁর পিপাসা নিবারণ করে ঠাণ্ডা হবার পর আমি তাঁকে বলতে বাধ্য হলুম, "মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে"। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি প্রমাণ"? আমি উত্তর করলুম, "প্রমাণ ত সুমুখেই রয়েছে। আপনাতে আমাতে প্রভেদ বিস্তর। ও ঘোমটা আমি কখনই দিতে পারতুম না, কেননা ওরূপ ঘোমটা দেওয়ায় ভদ্রসমাজে আভিজাত্যের নয় নির্লজ্জতার পরিচয় দেওয়া হয়।" বলাবাহুল্য এর পর আমাদের আলোচনা আর এগুলো না, রুশো দাঁতোঁর মতামতের মাদ্রাজিভাষ্য শোনবার সুযোগে আমরা বঞ্চিত হলুম।

(৪)

এস্থলে আমার একটি নিবেদন আছে। একথা যদি সত্য হয় যে ভবিষ্যৎ অতীতের জের টেনে চলে, তাহলে ভারতবর্ষের নব-সভ্যতা উত্তরাপথের লোকদেরই গড়ে তুলতে হবে, এ দায় আমাদের পৈতৃক, ধর্ম্ম বলো, নীতি বলো, জ্ঞান বলো, বিজ্ঞান বলো, কাব্য বলো, দর্শন বলো. রাষ্ট্র বলো, সমাজ বলো সেকালে সবই বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তর ভূভাগেই জন্মলাভ করেছে অতএব ভবিষ্যতেও করবে। ইংরাজির সঙ্গে সংস্কৃত আমরাই মেলাতে পারব, কেননা

ও-দুই হচ্ছে আর্য্যভাষা, অর্থাৎ—ও-দুই হচ্ছে আর্য্যমনের শব্দদেহ। আমরা যদি ভারতবর্ষের নব সভ্যতা গড়ে তুলতে পারি তাহলে দক্ষিণাপথ সে সভ্যতার দেদার টীকাভাষ্য লিখবে। এই হচ্ছে ভগবানের বিধি।

কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দ্রাবিড় জাতির উপর কোনরূপ কটাক্ষপাত করছি। দ্রাবিড় সভ্যতা আমার কাছে অজ্ঞাত এবং সম্ভবত অজ্ঞেয়, সুতরাং তার দোষগুণ বিচার করতে আমি অপারগ। কিন্তু আমার কাছে যা অজ্ঞেয় নয় অবজ্ঞেয়, সে হচ্ছে মাদ্রাজি আর্য্যামি। মাদ্রাজি শূদ্রদের আমি যেমন ভক্তি করি তেমনি ভয়ও করি। দেখতে পাচ্ছি তারা যেখানে আছে সেখানে আর থাকতে রাজি নয়, তারা উঠতে চায় একলম্ফে একেবারে লাট-দরবারে। অতএব আশা করা যায় যে, রিফরম দরবারে মাদ্রাজের মনের খাঁটি কথা পাওয়া যাবে। আর খাঁটি কথাকে আমি চিরকালই ভক্তি করি।

তবে ভয়ের কথা এই যে উচ্চপদস্থ হলে মানুষের মেজাজ উঁচু হয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আবিষ্কার করেছেন যে আর্য্যত্ব মানুষের রক্তে নেই—আছে তার পদে ও মস্তিষ্কে। দ্রাবিড় শূদ্র ও depressed class যখন লাটসভায় ঢুকবে তখন তারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে যাবে। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণের ছোঁয়াচ লেগে তারা খুব সম্ভবত ভীষণ আর্য্যামিগ্রস্থ হয়ে উঠবে। তারপর পাটেল বিলের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করবে! তাদের ভবিষ্যৎ বক্তৃতার কথা সব আজ আমার কানে আসছে। আমি দিব্যকর্ণে শুনতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের যত অস্পৃশ্য জাতির প্রতিনিধিরা সমবেত সমস্বরে ও তারস্বরে বলছেন—

"আমাদের আর্য্য পিতামহরা যে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেছেন, যে বর্ণাশ্রম-প্রথার তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, তার উপর হস্তক্ষেপ করলে সমাজ যাবে, ধর্ম্ম যাবে, হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, তারপর পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, আর আমাদের এই আধ্যাত্মিক সভ্যতা আধিভৌতিক হয়ে পড়বে।"

এহেন বক্তৃতা শুনে যিনি হাসি চাপতে পারেন—তিনি নিশ্চয়ই একজন somebody—আমি পারি নে কেননা আমি হচ্ছি nobody.

বীরবল।

আমার কথা।

——ঃ০ঃ——

আমার জান্‌লার সাম্‌নে রাঙামাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে, সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে-ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেচে। শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা, ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে' ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীর-তলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনি ছুটি পেল তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যতদিন ছিলুম ততদিন পথের ধারের ঐ বট গাছটার দিকে তাকাবার সময় পাইনি; আজ পথ ছেড়ে জান্‌লায় এসেচি আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা সুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারচ না ?"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "বুঝেচি, সব বুঝেচি : তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছুক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ; আবার সেই থর্‌থর্, ঝর্‌ঝর্, ঝল্‌মল্।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে ; আমি তোমারই খেলার সাথী, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডুষে গণ্ডুষে তোমারি মত সূর্য্যালোক পান করেচি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি, ও বল্‌তে থাকে হাঁ, হাঁ, হাঁ।

যে-ভাষা রক্তের মর্ম্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্ত্তন-ধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্ম্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারী ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্চে, "আছি, আছি : আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুসির কথা। সেই খুসিতে বিশ্বের অণুপরমাণু থর্‌থর্ করে কাঁপ্‌চে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক-ভাষায় সেই এক-খুসির কথা চল্‌চে।

ও আমাকে বল্‌চে, "আছ হে বটে ?"

আমি সাড়া দিয়ে বল্‌চি, "আছি হে মিতা !"

এমনি করে "আছি"তে "আছি"তে একতালে করতালি বাজ্‌চে।

(২)

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ সুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল ; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তারপরে আষাঢ়ের বর্ষা নাম্‌ল ; ওরও পাতার রং মেঘের মত গম্ভীর হয়ে এসেচে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীনের পাকা বুদ্ধির মত নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরীবের মেয়েটির মত ; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী ; যেন পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝলমলিয়ে আমাকে বল্‌লে, "মাথার উপর অমনতর ইঁটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন ? আমার মত একেবারে ভরপূর বাইরে এস না !"

আমি বল্‌লেম, "মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়।"

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠ্‌ল, "বুঝতে পার্‌লেম না।"

আমি বল্‌লেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ ! ভিতরেরটা আছে কোথায় ?"

—"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

—"সেখানে কর কি ?"

—"সৃষ্টি করি।"

—"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বললেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে' হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা পড়েই ত সৃষ্টি। একই জিনিষ ঘেরের মধ্যে আট্‌কা পড়ে কোথাও হীরের টুক্‌রো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার ঘেরটা কি রকম শুনি!"

আমি বল্‌লেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়চে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠ্‌চে।"

গাছ বল্‌লে, "তোমার সেই বেড়া-ঘেড়া সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্র-সূর্য্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়?

আমি বল্‌লেম, "চন্দ্রসূর্য্যকে দিয়ে তাকে ত মাপা যায় না, চন্দ্র-সূর্য্য যে বাইরের জিনিষ।"

—"তাহলে মাপবে কি দিয়ে?

—"সুখ দিয়ে—বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বল্‌লে, "এই পুবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রানে তার সাড়া জাগে। কিন্তু তুমি যে কিসের কথা বল্‌লে আমি কিছুই বুঝলেম না।"

আমি বল্‌লেম, "বোঝাই কি করে? তোমার ঐ পুবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে বীণার তারে যেম্‌নি বেঁধে ফেলেচি অম্‌নি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আরেক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়! এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায় তা আমিও ঠিক জানি নে।

মনে হয় যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।”

—“আর ওর কাল?”

—“ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।”

—“দুই আকাশ দুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত। তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝলেম না।”

—“নাই বা বুঝ্‌লে।”

—“আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ?”

—“তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল ত সে বোঝা, যদি গান বল ত গান, কল্পনা বল ত কল্পনা।”

(৩)

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বল্‌লে, “একটু থামো। তুমি বড় বেশি ভাবো, আর বড় বেশি বকো।”

শুনে আমার মনে হল, “একথা সত্যি।” আমি বল্‌লেম, “চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাস দোষে চুপ করে করেও বকি ; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।”

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মত আলোকবীণায় দ্রুততালে ঘা দিতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠ্‌ল, "এই তুমি যা দেখ্‌চ আর এই আমি যা ভাব্‌চি এর মাঝখানের যোগটা কোথায় ?

আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেম, "আবার তোমার প্রশ্ন? চুপ কর।"

চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌লেম। বেলা কেটে গেল।

গাছ বল্‌লে, "কেমন, সব বুঝেচ ?"

আমি বল্‌লেম, "বুঝেচি।"

(৪)

সেদিন ত চুপ করেই কাট্‌ল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠ্‌লে 'বুঝেচি', কি বুঝেচ বল ত ?"

আমি বল্‌লেম, "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেচে। তাই প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে ঐ গাছের দিকে।

—"কি রকম দেখ্‌লে ?"

—"দেখ্‌লেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কি আনন্দ! নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেচে, কত রঙই লাগিয়েচে, কত গন্ধ, কত রস! তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বল্‌ছিলেম, "ওগো বনস্পতি, জন্ম-মাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে-আনন্দধ্বনি করে' উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল, তুমি তাকে

ডাক দিয়ে বলেচ, "ওরে আয়নারে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারি মত নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা!"

মন আমার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বল্‌লে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করে থাক, আমি যেসব উপকরণ জড় করচি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলনা কেন?"

—"তার কথা আর কইব কি! সে নিজেই নিজের টঙ্কারে ঝঙ্কারে হুঙ্কারে ক্রেঙ্কারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেচে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। ভেবে পাই নে এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠ্‌বে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে? এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

—"বটে? কি জবাব, শুনি।"

—"সে বল্‌চে, প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবামাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপ্‌নি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দরকেই দেখ এই বনবিহারী। তারি বাঁশি ত বাজচে বটের ছায়ায়।"

(৫)

তখন কবেকার কোন্ ভোর রাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনো তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই ; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেচে ধূলো, না দেখা দিয়েচে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখ্‌লেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বট গাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বল্‌লে, "নমস্কার!"

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চল্‌চে কেমন বল ত?"

সে বল্‌লে, "বেশ চল্‌চে, একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখ না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পূবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের শার ; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এম্‌নি জটলা করেচে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বল্‌লেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি! তুমি কোমল তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীন তেমনি কঠোর ; তুমি ছোট, তোমার তূণ ছোট, তোমার তীর ছোট, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু ত দেখি দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল ; দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেচ, পাথর মান্‌চে হার, ধূলো দাসখৎ লিখে দিচ্ছে।"

বট বল্‌লে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখ্‌লে?"

আমি বল্‌লেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্ম্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্ত্তিতে। সেই জন্যেই ত তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেচে ঐ সহজ যুদ্ধ-

জয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্যে। প্রাণ যে কেমন করে' কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারি পাঠশালা খুলেচ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।”

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেনাঁর কয়েক পৃষ্ঠা।*

অতীতের প্রতি M. de Sacy-র টান স্পষ্ট, ফলে তিনি যে বর্ত্তমানের উপর কঠোর হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। M. de Sacy-র স্বভাব মন্দের ভাগটাই বেশি করিয়া দেখা, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে কোনই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এমন সময়ও আসিয়া থাকে যখন কেবল ভাল দেখাই যার স্বভাব, তাঁর যে মনের একটা সঙ্কীর্ণতা, অন্তঃকরণের একটা নীচতা আছে—এ সন্দেহ আমাদের আপনা-হতেই হয়। প্রাচীন জগৎকে শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছিল এত যে সৎগুণ, সে সব হারাইয়া আধুনিক সমাজ বিশেষ সঙ্কটের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—M. de Sacy-র এ কথার সহিত আমি একমত। কিন্তু আমাদের যুগে যে জ্ঞানচর্চ্চা চলিয়াছে তাহার মূল্য যে কি ভাবে নির্দ্ধারণ করিব, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতের একটু পার্থক্য আছে। আমাদের এ যুগ, জগতের ও মানবজাতির সঠিক তত্ত্বটি যতদূর তলাইয়া দেখিয়াছে আর কোন যুগ তাহা করে নাই; আমার মনে হয়, আমাদের সমসাময়িক হাজার কয়েক ব্যক্তির মধ্যে যে পরিমাণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সূক্ষ্মঅনুভূতি, সত্য তত্ত্বজ্ঞান, এমন কি মার্জ্জিত অন্তঃপ্রকৃতি দেখিতে পাই, সমস্ত যুগগুলি একত্র করিলেও সেখানে তাহা পাই না। কিন্তু এই যে বিপুল জ্ঞানসম্পদ, যদিও আমি বলিতেছি

---

* মূল ফরাসী হইতে—।

ইহার তুলনা কোন যুগে নেই, তবুও এটি আমাদের যুগের বাহিরেই পড়িয়া আছে, ইহার প্রভাব আমাদের যুগের উপর খুব অল্পই। একটা স্থূল জড়বাদ ক্রমে ক্রমে মানুষকে যেন চালাইয়া লইতে চাহিতেছে, সাক্ষাৎ কাজের হিসাবেই সব জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্যবোধকে বা শুধু কৌতূহলকে চরিতার্থ করা ছাড়া যে জিনিষের অন্য কোন সার্থকতা নাই, তাহাকেই একপাশে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। ঘর-গৃহস্থালীর ভাবনা চিন্তা লইয়া প্রাচীন জনসঙ্ঘ খুব কমই ব্যাপৃত থাকিত, বর্ত্তমানে তাহাই কিন্তু হইয়া পাড়িয়াছে মহৎ অনুষ্ঠান। আমাদের পিতৃপুরুষদের পুরুষোচিত প্রয়াস সমুহের স্থান অধিকার করিয়াছে যত তুচ্ছ ক্লেশ। যে ধর্ম্মের বা যে তত্ত্ববাদেরই ভাষায় বলি না কেন, মানুষ ইহজগতে আছে ভোগের লাভেরও উপরে একটা অতীন্দ্রিয় আদর্শোচিত লক্ষ্যের জন্য। ঐ লক্ষ্যটির কাছে পৌঁছাইয়া দিতে আধিভৌতিক উন্নতি আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছে কি? আগের তুলনায় মানুষ মোটের উপর বেশি বুদ্ধিমান, বেশি চরিত্রবান, স্বাধীনতার জন্য বেশি লালায়িত, সুন্দর জিনিষের উপর বেশি আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কি? ইহাই জিজ্ঞাস্য। উন্নতি হইতেছে, বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কতকগুলি সুখসুবিধা হইবে এই আশায় অন্তঃকরণকে ছোট হইতে দেখিয়াও যে লজ্জা পায় না, উন্নতির প্রতি তাহার মত দারুণ অতিবিশ্বাস না থাকিলেও চলে। মানবজীবন স্পৃহনীয়, কেননা মানবজীবনের আছে একটা অর্থ, একটা মূল্য যাহাকে হারাইয়া ঐ সুখসুবিধা লাভ করাকে প্রকৃত উন্নতিকামী মানুষ কখন যথেষ্ট মনে করিবেন না।

সত্য বটে, আধিভৌতিক উন্নতি হেয় নয়; দুইটি সমাজ যদি

বুদ্ধিতে ও চরিত্রে সমান হয় কিন্তু একটিতে যদি থাকে বাহ্যিক উন্নতির বহুল বিকাশ, আর একটিতে যদি তাহা না থাকে, তবে নিঃসন্দেহচিত্তে প্রথমটিকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তবে যে কথাটা মানিয়া লওয়া উচিত নয় তাহা এই যে, ভৌতিক উন্নতি নৈতিক অবনতির ক্ষতিটা পুরণ করিয়া দিতে পারে। সমাজ যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তার চিহ্ন আমরা একেবারে নিঃসন্দেহে পাই তখন, যখন দেখি বড় উদ্দেশ্য লইয়া দ্বন্দ্ব আর নাই, ফলে যখন ব্যবসাবাণিজ্য ও দণ্ডবিধানের সমস্যার তুলনায় মহা রাজনৈতিক সমস্যা সব গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই জীবন-ইতিহাসে এমন একটা প্রলোভনের সময় উপস্থিত হয়, সয়তান যখন তাহাকে জগতের সম্পদ দেখাইয়া দিয়া বলে, "এ সবই তোমাকে দিব, আমাকে যদি পূজা কর।"

তাই বলিয়া নৈতিকবল যে সকল প্রাচীন যুগেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল, এ অত্যুক্তিও যেন আমরা না করিয়া বসি। কারণ, চিরকালও জিনিষ ছিল অল্প কয়েকজনেরই অলঙ্কার। স্বল্প সংখ্যক এক অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যেই ন্যস্ত রহিয়াছে মানুষের মহত্ত্ব; এই অভিজাত শ্রেণী বাঁচিয়া থাকিবার, আপনাকে ছড়াইয়া দিবার আবহাওয়া পাইতেছে কি না, সেই অনুসারেই স্থির করিতে হইবে মানবজাতির ধর্ম্মবল বাড়িতেছে না কমিতেছে। ফলত এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মহা বিস্তার ব্যবসাদার নয় যাহারা, অর্থাৎ—পুরাকালে যাহা-দিগকে বলা হইত সম্ভ্রান্ত (noble) তাহাদের উপর একটা বিপুল দাবি খাড়া করিয়া জগৎকে যেন নিজের ছাঁচে ঢালাই করিয়া ফেলিতেছে। আধুনিক সমাজের একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মের তাড়ণায় প্রত্যেক ব্যক্তি যে প্রতিভা বা যে মূলধনের অধিকারী হইয়াছে সেটিকে খাটাইয়া লইতে ক্রমেই

বাধ্য হইয়া পড়িতেছে, টাকার হিসাবে যে ব্যক্তি কিছুই উৎপাদন করিতেছে না তাহার জীবন যাত্রা অসম্ভবই হইয়া উঠিতেছে। নব্যতন্ত্রের দলভুক্ত কেহ কেহ এই পরিণামটি স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে যতদিন তাঁহাদের মত সব শ্রেণীই বৈশ্য না হইয়া উঠে ততদিন বৈশ্যবৃত্তি কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষে অনিষ্টকর হইবেই। এ রকম অবস্থা যদি চরমে যাইয়া পৌঁছে (অবশ্য আমি মানি তাহা কখনো ঘটিবে না), তবে তাহার ফল হইবে এই যে, যাঁহাদের কর্ম্মটি হইতেছে আর্থিক সুবিধার কাছে অন্তরের স্বাধীনতাকে কখনো বলি না-দেওয়া, তাঁহাদের পক্ষে এ পৃথিবী আর বাসের যোগ্য থাকিবে না—এ কথা কে না বুঝিবে? শিল্পীকে তুমি ব্যবসাদার করিয়া তুলিবে, সে কি ক্রেতার হুকুম অনুসারে, মূর্ত্তি গড়িবে, না ছবি আঁকিবে? ইহার অর্থ কি এই নয় যে উঁচুদরের শিল্পকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা? এ শিল্প ত, যে-শিল্প তুচ্ছভাব ও ইতর রুচির সঙ্গে মিশ খাইয়া চলে, তাহার ন্যায় লাভের নয়। জ্ঞানীকে তুমি ব্যবসাদার করিয়া তুলিবে, তিনি কি সাধারণের জন্য গ্রন্থ রচনা করিতে থাকিবেন? কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে রচনা যত মূল্যবান হয় তাহার পাঠকও তত কম হইতে বাধ্য। আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, তিনি আবার সেই সঙ্গে ছিলেন গুণীপুরুষ, নাম তাঁর 'আবেল' (Abel), তিনি ত দারিদ্র্যেরই মধ্যে প্রাণ হারাইলেন। সুতরাং মানুষের কয়েকটি শ্রেষ্ঠসৃষ্টি সম্বন্ধে, এ কথা স্পষ্টই দেখা যায় যে কাজের মূল্য আর তার পরিশ্রমের মূল্য, এই দুইএর মধ্যে আছে একটা বিপুল অসামঞ্জস্য, অথবা আরও ঠিক বলিতে গেলে, কাজের মূল্য আর পরিশ্রমের মূল্য, এ দুটি চলে বিপরীত

অনুপাতে। ফলে দাঁড়াইল এই যে, যে-সমাজে স্বাধীন জীবন কঠিন হইয়া পড়িতেছে, যেখানে সাধারণের প্রয়োজন অনুসারে যে উৎপাদন করে সে, যে কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে পদদলিত করিয়াই চলিয়াছে, সে-সমাজে পরিশেষে সকল উচ্চবৃত্তিই লোপ পাইয়া বসে, অর্থাৎ—সে-সমাজের উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়া পড়ে। মধ্যযুগ এই সত্যে এতদূর অনুপ্রাণিত হইয়া গিয়াছিল যে তখন এমন উদ্ভট ব্যবস্থাও দেওয়া হয় যে দারিদ্র্যও একটা সংগুণ, আধ্যাত্মিক কর্ম্মে ব্রতী যিনি, তিনি ভিক্ষা দ্বারাই জীবনযাপন করিবেন। এ মতে স্বীকার করা হইয়াছিল যে জগতে দাম দিয়া কেনা যায় না এমন জিনিষও আছে; বাহিরের কোন মূল্য দিয়াই ভিতরের বস্তুকে নিরূপণ করা যায় না, আর অন্তরাত্মার জন্য যে সেবা, তাহার এমন কোন পারিশ্রমিকই নাই যাহাকে বেতন নাম দেওয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় চার্চ্চ যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া এই নীতিটিই ধরিয়া রখিয়াছে; অর্থ দিয়া তাহার দাবি যে চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, একথা সে কখনও স্বীকার করিবে না, সে বলে সে চিরদিনই গরীব। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হইলেও সে বলিতে থাকিবে, জড়বস্তু বিষয়ে, সে কিছুই চাহে না, চাহে শুধু সেণ্টপল যাহা চাহিয়াছেন—গ্রাসাচ্ছাদন।

জড়বস্তুর উপর মানুষের আধিপত্য যে বাড়িয়া উঠিয়াছে ইহা একটি স্পষ্ট লাভ, এদিক দিয়া আমাদের যুগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাকে প্রশংসা করিতেই হইবে। কিন্তু এ রকম উন্নতি যদি প্রকৃতির বাধাসমূহের উপরে জয়ী করিয়া মানুষকে আপন আদর্শ সাধনের সহায়তা করিতে পারে তবেই শুধু তাহার পূর্ণ সার্থকতা। প্রয়োজনের ভোগের জিনিষকে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে

লইয়া আসা অপেক্ষা একটি সুন্দর চিন্তা, একটি মহৎভাব, একটি সৎকার্য্যের স্রষ্টা বলিয়াই মানুষকে প্রকৃতপা ্ক সৃষ্টির রাজা বলা চলে। এই রাজত্ব হইতেছে আমাদের অন্তরাত্মা কা। যে জড়বাদী জীবনের দিব্য অর্থটি না বুঝিয়া ভূমণ্ডলের উপরে [illegible]রই ওলট-পালট খাই-তেছে, সে নয়, কিন্তু থৈরাইদ মরুভূমির তপস্বী, হিমালয়শৃঙ্গের ধ্যানী নানাহিসাবে প্রকৃতির দাস হইলেও তাঁহারাই হইতেছেন উহার অধীশ্বর, তাঁহারাই অন্তরাত্মার দিক দিয়া উহার ব্যাখ্যা দিতেছেন। আমাদের তুচ্ছ আনন্দ অপেক্ষা তাঁহাদের দুঃখবাদও সৌন্দর্য্যে ভরপুর অতএব অনেক শ্রেয়। তাঁহাদের উন্মত্ততাই মানবপ্রকৃতিকে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে—আর যে সব মানুষের জীবন স্থিরবুদ্ধি-পরিচালিত বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু শুধু লাভলোকসানের হিসাব গত স্বার্থাভিমানের তুচ্ছ কলহে পরিপূর্ণ।

সুতরাং M. de Sacy-র এ অনুযোগ ন্যায়সঙ্গত যে আমাদের সমা[illegible] কত শত ভাল জিনিষের আর স্থান নাই, তাহারা আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এসব জিনিষ আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে আসে না, ইহাদের অভাবও তাই চক্ষে ধরা পড়ে না; কিন্তু একদিন দেখা যাইবে ইহারা চলিয়া গিয়া জগতের মধ্যে কি বিপুল ফাঁকাই রাখিয়া গিয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যুগের ভুল এই যে আমরা বুঝিতেই চাই না, যে বিশেষ বিশেষ বিদ্যা—যে বিদ্যা ব্যবহারে আসে, তাহার উপরে আছে একটা সাধারণ জ্ঞানমাহাত্ম্য। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমরা সেই একই ভুল করিতেছি। প্রয়োজনের খাপে খাপে যাহা মিলিয়া যায় না তাহাকেই আমাদের মনে হয় আড়ম্বর-অলঙ্কার। সত্য বটে, ভদ্রলোক লোপ পাইলেও ক্ষুদ্র

হইবার কিছু নাই ; কারণ এ নামটি দেয় জন্মের পরিচয়, আর আজকাল সকল শ্রেণী হইতে প্রায় সমান পরিমাণেই কৃতী লোকের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু ক্ষুণ্ন হ[illegible]ত হয় সৎলোক হারাইয়া—এ কথাটি আমি ব্যবহার করিতেছি ১৭শ [illegible] ইহার যে অর্থ ছিল সেই অর্থে, অর্থাৎ—সেই লোক যিনি বিশেষ কোন পেশার দিক দিয়া কোন জিনিষকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখেন না, যাঁহার মনে বা চলনে বিশেষ কোন শ্রেণীর ভঙ্গিমা নাই। বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম প্রায়ই বিশেষ বিশেষ অভ্যাসের সৃষ্টি করে, এমন কি সে কর্ম্মে ভাল রকম সফল হইতে হইলে, প্রত্যেকের, যাহাকে বলা হয় বৃত্তিগত মন, সেটি থাকা চাই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব (nobility) জিনিষটি ত ঠিক এইখানেই, যে তাহার এরকম কোনই বন্ধন নাই ; কোন বিশেষ ব্যবসা নাই যাহাদের, তাহাদের দিয়াই ত বিশেষ ব্যবসা আছে যাহাদের, তাহাদের পার্থক্যটি দেখান সম্ভবপর। এসব লোকের ধনী হওয়া উচিত নয়, কারণ টাকার হিসাবে ইহারা সমাজকে কিছুই দেয় না। কিন্তু ইহাদেরই হওয়া উচিত আভিজাত্য—আভিজাত্য কথাটি এখন হইতে এই নিতান্ত বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে ; তবেই মানুষ যে-সব জিনিষ লইয়া চলে তাহাদের মোট ধরণটির মর্য্যাদা বজায় থাকিবে, তবেই নানা বিভিন্ন-দিক হইতে জীবনকে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইবার লোক মিলিবে। যে-সব লোক বিশেষ কাজে ব্রতী, বিশেষ দিক দিয়াই দেখিতে অভ্যস্ত যাহারা, তাহারা ত হৃদয়ঙ্গম করে না জীবনের নানা বিভিন্ন দিকের কি প্রয়োজন।

যে-সব জিনিষ সূক্ষ্ম, যাহা সুদূরের দিকে চাহিয়া আছে, আধুনিক সমাজসংস্কারকগণ সে সকলকে দিয়াছেন একটা অতি সঙ্কীর্ণ ভিত্তি ;

আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে এই জন্য উঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। যাহা মহৎ, তাহা যে হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। সুপরিপক্ক পূর্ণাঙ্গ হইতে, জিনিষের দরকার দুই বা তিন শত বৎসর আয়ু, আমরা দেখি যে আমাদের জীবনকালের মধ্যে বিধাতা ও তাঁর বিধান দশবার বদলাইয়া যাইতেছে। মানুষের মধ্যে কাব্যকলার আসন্নমৃত্যুও ঐ জন্যই। কবিতা জিনিষটি সমস্তই অন্তরাত্মার ভিতরে, ভাবুকতার মধ্যে। কিন্তু আমাদের যুগের প্রবৃত্তিই হইতেছে সব জায়গায় ভিতরের যন্ত্রের পরিবর্ত্তে বাহিরের যন্ত্র দিয়া কাজ করা। খুব তুচ্ছ একটা জিনিষ, এই সামান্য একখণ্ড বস্ত্রও প্রায় ভিতরের জিনিষ হইয়া, মানুষভাব ধরিয়াই উঠে যখন দেখি তাহার প্রত্যেক বুননটির সাথে সাথে মিশিয়া আছে শতাধিক সজীব সত্ত্বার নিশ্বাসপ্রশ্বাস, তাহাদের হৃদয়ানুভূতি, হয়ত বা তাহাদের দুঃখ কষ্ট, যখন দেখি তাঁতিনী ঝাঁপটি উঠাইতে নামাইতে তাঁতী মাকুটি স্বল্পাধিক দ্রুততালে ঠেলিতে ঠেলিতে কাজের সাথে তাহাদের চিন্তা, তাহাদের কাহিনী, তাহাদের গান জড়াইয়া সে বস্ত্রখানি তৈয়ার করিয়াছে। আজ কিন্তু সে সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে প্রাণহীন সৌন্দর্য্যহীন একটা যন্ত্র। প্রাচীনকালের যন্ত্রটি মানুষের সাথে অদ্ভুত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাই ক্রমে তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল জীবাধারেরই মত জীবন্ত ঐক্য, একটা নিখুঁত সামঞ্জস্য। আধুনিককালের যন্ত্রটি হইতেছে কিন্তু কদর্য্য, তাহার না আছে শ্রী, না আছে সৌষ্ঠব; সে কখনো মানুষের অঙ্গ হইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহার সেবা যে করে সে আপনাকেই ক্ষুদ্র পশুস্বভাব করিয়া ফেলে, প্রাচীন যন্ত্রটির মত সে আর তাহাকে বন্ধু ও সহায়রূপে পায় না।

মানুষের দেবভাব শুধু তাহার অন্তরাত্মারই দিক দিয়াই; বুদ্ধিকে ও স্বভাবকে সে যদি কতক পরিমাণে নির্দ্দোষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, তবেই সে তাহার জীবনের লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছিল। এই সুমহৎ উদ্দেশ্যের যাহা সহায় হইতে পারে, তাহা কিছুই অদরকারী নয়; কিন্তু স্থূলজগতের যে-সব উন্নতি, সাথে সাথে তাহারা মনকে ও স্বভাবকে উন্নত করিতে পারে না, অতএব তাহাদের নিজস্ব যে কিছু মূল্য আছে, এ বিশ্বাস একটি মস্ত ভুল। বাহিরের বস্তুর ততখানিই মূল্য, যতখানি মানুষের ভিতরের ভাবের সহিত তাহার মিল আছে। আজকাল অতি সামান্য একটি বাগানে যে-সব ফুল পাওয়া যায়, এককালে তাহা থাকিত শুধু রাজার উদ্যানে। কিন্তু ভগবানের গড়া ক্ষেতের ফুলই যে মানুষের প্রাণে গিয়া কথা কহিত, মানুষের প্রাণে যে জাগাইয়া তুলিত প্রকৃতির প্রতি একটা সুমধুর ভাব, তাহাতে কি আসে যায়? আজকাল সকল রমণীই যে রকমে সাজসজ্জা করিতে পারে, আগে কেবল রাজরাণীরাই তাহা পারিতেন; কিন্তু সেজন্য আজকালের রমণী যদি বেশি সুন্দর বেশি চিত্তাকর্ষক না হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? ভোগের পন্থা সহস্রভঙ্গীতে সূক্ষ্ম করিয়া অসংখ্যগুণে বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে; তবে ইহা সব ক্লান্তির বিরক্তির বিষে জর্জ্জরিত, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের দারিদ্র্যের মধ্যেই ছিল বেশি আনন্দ, বেশি তৃপ্তি; কিন্তু কি আসে যায় তাতে? ব্যবসা-বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছে সেই অনুপাতে বুদ্ধিবৃত্তিরও উন্নতি হইয়াছে কি? আমাদের পূর্ব্বেই যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন সমাজের একটা জলন্ত জীবন্ত গতিধারা, আজ পর্য্যন্ত তাহাই ধরিয়া বাঁচিয়া আছি—তাঁহাদের মত সুন্দর জিনিষ

ধারণা করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে কি? শিক্ষাকে কি আরও উদার করিয়া তোলা হইয়াছে? মানুষের প্রকৃতি কি শক্তিতে, মহত্ত্বে বাড়িয়া উঠিয়াছে? নূতন যুগের মানুষের মনে উচ্চভাব, অন্তঃকরণের মহত্ত্ব, জ্ঞানের চর্চ্চা, আপন মতের উপর নিষ্ঠা, ধন ও ক্ষমতার প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তেজ বেশি পরিমাণে কি পাওয়া যায়? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করিব না। আমি শুধু বলিব, এ সব জিনিষ ছাড়া উন্নতি আর কিছুতে নাই। যতদিন এ রকম উন্নতি না হইতেছে, ততদিন অতীতের সৎগুণরাশী হারাইয়া পাইলাম আরামে থাকার সুব্যবস্থা কিন্তু সুখের মাত্রা তাহাতে বেশি হইল না, পাইলাম নিষ্কণ্টক শান্তিভোগ, কিন্তু হইল না স্বভাবের উৎকর্ষ; এই বিনিময়ে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে যাহারা তাহারা কোনই সান্ত্বনা পাইবে না।

পত্র।

—————:::—————

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

তুমি আমার গত পত্রের উত্তরে জিজ্ঞাসা করেছ যে—

"না হয় মনস্থির করলুম যে—অতঃপর সাহিত্যেরই চাষ করব। কিন্তু লিখি কি? লেখবার বিষয় নিয়েই ত যত গোল।"—

এ প্রশ্ন আমার মনকে যে ব্যতিব্যস্ত করে নি, তা নয়। অনেক দিন এর কোনো জবাব খুঁজে পাই নি। তারপর একদিন এর একটা সদুত্তর আপনা হতে আমার মনে এসে গেল, আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে সাহিত্যের কোনো বিষয় নেই। এই নব আবিষ্কৃত মত পাছে আবার হারিয়ে ফেলি, এই ভয়ে তখন মনের মধ্যে যে সব কথা উদয় হয়ে ছিল—সে সব আর কাল বিলম্ব না করে লিপিবদ্ধ করে ফেললুম। সে লেখা অবশ্য প্রকাশ করবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কেন যে তা প্রকাশ করি নি, তার কারণ শুনবে?—পাছে লোক আমাকে dilettente বলে, এই ভয়ে লেখাটা চেপে রেখেছিলুম। জানই ত আমি সেই সব ইংরেজি কথাকে বড় ডরাই যার ঠিক মানে আমরা কেউ জানি নে অথচ সবাই যখন-তখন আওড়াই। যে লেখা প্রবন্ধ হিসাবে চলবে না, সেটা পত্র হিসাবে চলতে পারে, এই বিশ্বাসে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সাহিত্যের বিষয়।

আজ আমার একটি পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যখন সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয় তখন আমার জনৈক আকৈশোর বন্ধু আমাকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে অনুরোধ করেন। কি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করব জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন যে, কোন বিষয়েই নয়। এ প্রস্তাবে আমি নিজেকে মহা সম্মানিত মনে করি, কেননা এ অনুরোধ হচ্ছে আকাশ-কুসুম রচনা করবার অনুরোধ, অতএব আমি ধরে নিলুম যে বন্ধুবরের মতে সাহিত্য-জগতে আমি একটি অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তি এবং আমার লেখনী হচ্ছে অঘটন-ঘটন পটিয়সী।

আমি অবশ্য তাঁর অনুরোধ রক্ষা করি নি। কিন্তু তারপর ভেবে দেখলুম তাঁর প্রস্তাবটি একেবারে অসঙ্গত নয়। মানুষে যা করেছে মানুষে তা করতে পারে। এই ভূতাকাশে মানুষ যে ফুল ফুটিয়াছে সে কথা আর কারো কাছে অবিদিত নেই। আমরা যাকে আতসবাজি বলি তার উদ্দেশ্য আকাশে ফুল ফোটানো ছাড়া আর কি? সকলেই প্রত্যক্ষ করেছে যে প্রকৃতির হাতে-গড়া ফুলের চাইতে মানুষের হাতে গড়া এই সব আকাশকুসুমের বর্ণ ঢের বেশি উজ্জ্বল, আর ঢের বেশি বিচিত্র, এমন কি তুবড়ির ফুলের পাশে আকাশের তারাও হীনপ্রভা হয়ে পড়ে। এই অমূলক ফুলের উপরে গাছের ফুল শুধু এক বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে, সে হচ্ছে তার স্থায়ীত্বে। প্রকৃত ফুলের জীবনের মেয়াদ একসন্ধ্যে, আর কৃত্রিম ফুলের এক মুহূর্ত্ত। কিন্তু এ প্রভেদ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কার আত্মা এক মুহূর্ত্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ

করে, আর কার আত্মা এক প্রহরে, অনন্তকালের হিসেবে তা গণনার মধ্যেই আসে না। এ জগতে সবই অনিত্য, সম্ভবত হয় পরমাত্মা নয় পরমাণু ছাড়া, সুতরাং কালের হিসেবে সব পদার্থেরই মূল্য সমান, কিন্তু আমাদের হিসেবে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর মূল্যের তারতম্য অগাধ এবং সে তারতম্য নির্ভর করে, হয় বস্তুর রূপের নয় তার গুণের উপর। পৃথিবীতে যার কোনো মূল নেই এমন ফুল যদি কেউ আকাশে ফোটাতে পারে তাহলে এক রূপের গুণেই তা আমাদের কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাকবে।

ভূতাকাশের আঁধার ঘরে আলোর ফুল ফোটানো, মানুষের পক্ষে ছেলেখেলা হতে পারে, কিন্তু চিদাকাশে ঐ ফুল ফোটানোই হচ্ছে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতীত্ব। আমরা যাকে কাব্য বলি,—তার প্রতিটিই এক একটি আকাশ কুসুম, কেননা সে সব ফুলের মূল বস্তুজগতে নেই, আছে শুধু মনোজগতে। মেঘদূতের অলকা আর শকুন্তলার তপোবন, দুটি অপূর্ব্ব সুন্দর আকাশ কমল বই আর কি? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ শুধু বর্ণে; একটির রঙ লাল আর একটির শাদা। অলকা কবির হৃদয়ের তাজা রক্তে রঞ্জিত আর মালিনীর তীরস্থ তপোবন কবির আত্মার শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত। এ উভয়ই আকাশ দেশের বস্তু, অর্থাৎ—এ উভয়ই চিরদিন মানুষের হাতের বাইরেই আছে এবং থেকে যাবে। এবং এ উভয়ই অজর এবং অমর, কেননা মর্ত্ত্যভূমির সঙ্গে উভয়ই সম্পর্কশূন্য। সুতরাং সাহিত্য-জগতে আকাশকুসুম রচনা করা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, ঐ হচ্ছে কবিপ্রতিভার চরম সৃষ্টি। এই কারণেই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কবির ভারতীকে "নিয়তিকৃত নিয়ম রহিতাহ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা" বলা হয়েছে। তবে যে আমি

আমার বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করি নি, তার কারণ এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, আমি কবি নই, আর এক শ্রেণীর জীব।

আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি ছাড়া অপর কেউ যদি আমাকে এ অনুরোধ করতেন, তাহলে আমি মনে ভাবতুম যে উক্ত প্রস্তাবের অন্তরে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আছে। উক্ত বন্ধুবর সম্বন্ধে সে সন্দেহ মনে উদয় হয় না, কেননা তিনি হচ্ছেন একজন পরম থিয়োজফিষ্ট। আমরা সম্ভব অসম্ভবের ভিতর যে লজিকের সীমারেখা বসিয়ে দিই, তাঁর কাছে সে রেখার আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। সুতরাং তাঁদের ভাষায় অসম্ভব বলে কোনো শব্দই নেই। সে যাই হোক, অপর কেউ যদি আমাকে এমন একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করতেন যার কোনো বিষয় নেই, তাহলে আমি ধরে নিতে পারতুম যে তিনি ঐ অনুরোধচ্ছলে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আমার লেখার ভিতর কোনো বস্তু নেই। আমার লেখা সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য মধ্যে মধ্যে আমার কর্ণগোচর হয়েছে। কারো কারো মতে আমার লেখার অন্তরে কোনো সার নেই, যা আছে সে হচ্ছে শুধু হাসি-তামাসা, কথার মারপেঁচ, অর্থাৎ—তাতে শ্লেষ আছে, উপমা আছে, অনুপ্রাস আছে, বক্রোক্তি আছে, ব্যঙ্গোক্তি আছে, আর কিছু নেই। আর কিছু যদি থাকে ত সে হচ্ছে অ-বস্তু। এক কথায়, সাহিত্যে আমি বিনি সূতোয় কথার মালা গাঁথি, এ কথা যদি সত্য হত তাহলে আমি সত্য সত্যই নিজেকে ধন্য মনে করতুম। আমার কলমের মুখ দিয়ে যদি কথার রঙ-বেরঙের ফোয়ারা ছুটত—তারপরে তার পুষ্পবৃষ্টি হত তাহলে সকলকেই স্বীকার করতে হত যে আমার ভারতী "নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী এবং অনন্য পরতন্ত্রা" অর্থাৎ—আমি একজন জাতকবি। সমালোচকেরা ভুলে যান

যে, একমাত্র আর্টিষ্টের লেখনীর ডগা দিয়েই ভাব ফুলের আকারে ফুটে ওঠে, আর ভাষা তারা কাটে। সুতরাং এ ব্যাজস্তুতি আমি আত্মসাৎ করতে একেবারেই অপারগ। এ জ্ঞান আমার আছে যে আমি কবিও নই, আর্টিষ্টও নই,---আমি হচ্ছি একজন একেলে নৈয়ায়িক, সাহিত্যের আসরে তর্ক করাই হচ্ছে আমার পেশা, এবং আমার লেখার ভিতর যদি কোনরূপ কৌশল থাকে ত সে হচ্ছে সহাস্য তর্ক করবার কৌশল। সম্ভবত ঐ হাসির আবরণই অনেককে তর্কিত বিষয়ের স্বরূপ দেখতে দেয় না। সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের বিশ্বাস, যে-কথা গম্ভীর ভাবে বলা হয় নি, সে-কথার ভিতর কোনো গুরুত্ব নেই। যে-কথা চোখের জলে ভিজে নয় তার ভিতর রস নেই। আমি ত কোন্ ছার,—যে অসামান্য প্রতিভাশালী লেখকের মতামত আজকের দিনে ইউরোপের দার্শনিক সমাজের মনের উপর প্রভুত্ব করছে সেই অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস্‌কে তাঁর ক্লাসের একটি ছাত্র একদিন জিজ্ঞাসা করে "Can't you ever be serious"? বলা বাহুল্য সে সময়ে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের লেকচার দিচ্ছিলেন।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত মনে করবেন যে, এ সব কথা আমি সাহিত্যসমাজে সাফাই হবার জন্যে বলছি এবং প্রকারান্তরে আত্মপ্রশংসা করছি। এর উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, পরনিন্দা করবার চাইতে আত্মপ্রশংসা করা ঢের বেশি নিরাপদ। নিজের প্রশংসা নিজে করলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু পরের নিন্দা করলে কেউ তা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমরা কি বলি, তার চাইতে তা আমরা কি করে বলি,—তার মূল্য কম

ত নয়ই, বরং অনেক বেশি। আজকের মতামত যে কাল টেঁকে না তার প্রমাণ ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছাপা রয়েছে। মানুষের জ্ঞানের সম্পদ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং এক যুগের স্বল্প-জ্ঞানের উপর যে মতামত প্রতিষ্ঠিত পরযুগের প্রবৃদ্ধজ্ঞানের আলোকে তার হীনাঙ্গতা ধরা পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হেগেলের দর্শন ইউরোপের মনের উপর কি রকম একাধিপত্য স্থাপন করেছিল তা সকলেই জানে। আর আজ সে দর্শনের কি দশা! সে দিন ষ্টেইন নামক জনৈক জর্ম্মান দার্শনিকের গ্রন্থে পড়লুম যে, এ যুগে হেগেলের গ্রন্থ কোনো জর্ম্মান দার্শনিক স্পর্শ মাত্রও করে না। ও হাড় নাকি জর্ম্মানির দার্শনিক সমাজের কোন কুকুরেও চিবয় না'! অপর পক্ষে প্লেটোর দর্শন অদ্যাবধি সকল দার্শনিকই শ্রদ্ধাভরে, ভক্তিভরে, সানন্দে ও সোৎসাহে পাঠ করেন। এর কারণ কি? প্রথমেই চোখে পড়ে যে Style-এর গুণে প্লেটোর দর্শন মানুষের চির-আনন্দের অতএব চির-আদরের সামগ্রী হয়ে রয়েছে, আর Style-এর দোষে হেগেলের দর্শন চিরদিনই কষ্টপাঠ্য ছিল, এবং যখন তাঁর মত অগ্রাহ্য হল, তখন তাঁর গ্রন্থ যথার্থই অপাঠ্য হয়ে পড়ল। এক কথায়, হেগেলের মতের পিছনে কোনো বড় মন নেই—আর প্লেটোর মতের পিছনে যে-মন আছে তার সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের কোনোই সীমা নেই। এই কারণে প্লেটোর দর্শন সাহিত্য, আর হেগেলের দর্শন হয় বিজ্ঞান, নয় ত কিছুই নয়।

এই সব দেখে শুনে এ কথা বলতে সাহস হয় যে, সাহিত্য হচ্ছে সেই বস্তু যার অন্তরে কোনো বিষয়ের নয়, মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সে মন যত মহৎ, যত সুন্দর, যত শক্তিশালী হবে

তার প্রকাশও তত উজ্জ্বল, তত মনোহারী হবে। সাহিত্য মানুষকে কোনও বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের শিক্ষা দেয় না। যাঁদের মন বড়, তাঁরা তাঁদের মনের মহত্ব আমাদের সকলেরি মনে অল্পবিস্তর সঞ্চারিত করে দিতে পারেন; এই কারণে মানুষে যত কিছু করেছে, সাহিত্যের স্থান সে সবের উপরে। কবিই হচ্ছে মানুষের যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা, কেননা তাঁর বাণী মানুষকে তার হৃদয়ের ও মনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে।

আর এক কথা, সাহিত্যে যে মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, সাহিত্যে এবং একমাত্র সাহিত্যেই মানুষের পূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়—অপর পক্ষে যাকে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান বলি তাতে মানুষের শুধু বুদ্ধিবৃত্তিরই খেলা দেখতে পাওয়া যায়। সকলেই জানে যে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট যে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন তার একখানির বিষয় ছিল pure reason, আর একখানির practical reason, আর একখানির Æsthetic judgment, অর্থাৎ তিনি প্রথমে সত্যাসত্য জ্ঞানের, তার পরে ভালমন্দ জ্ঞানের এবং সর্ব্বশেষে সুন্দর অসুন্দরের জ্ঞানের বিচার করেন। বলা বাহুল্য মানুষের অন্তরে এ কটি স্বতন্ত্র শক্তি নয়—আমরা যাকে মন বলি তার ভিতর এ তিনটি শক্তি একটি শক্তিরই ত্রিমূর্ত্তি। আমাদের মন যখন কোনো বিষয়ের সংস্পর্শে আসে তখন সেটিকে আমরা আমাদের সমগ্র মন দিয়ে—হয় চেপে ধরি, নয় ঠেলে দিই এবং তার সত্যতা, তার উপাদেয়তা, তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাদের আত্মা একযোগে রায় দেয়। বিষয় বিশেষের স্পর্শে যাঁর সমগ্র মন সাড়া দেয় এবং যিনি সেই সমগ্র মনের জীবন্ত ছবি বাণীর সাহায্যে লোকের

চোখের সুমুখে ধরে দিতে পারেন তিনিই যথার্থ সাহিত্যিক অতএব যথার্থ সাহিত্য একাধারে দর্শন বিজ্ঞান এবং আর্ট।

আর এক কথা, আমরা সকলে মানুষ হলেও সকলেই এক প্রকৃতির মানুষ নই। আমাদের কি দেহ কি মন কি চরিত্র কিছুই আর এক ছাঁচে ঢালাই হয় নি। তারপর শিক্ষা দীক্ষার গুণে অভ্যাসের বশে কতকটা অবস্থার প্রভাবে কতকটা স্বীয়কর্ম্মের ফলে আমাদের এই জন্মসুলভ বিশেষত্ব হয় ফুটে ওঠে, নয় চেপে যায়। সুতরাং সকল বিষয়ের সংস্পর্শে আমাদের সকলের মন সাড়া দেয় না, এবং যাদেরও দেয় তাদেরও একভাবে দেয় না। যাঁর বাণীর অন্তরে একটি বিশেষ মনের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর লেখাই সাহিত্য, এবং এই কারণেই সাহিত্যে style-এর মাহাত্ম্য এত বেশি, কেননা style-এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে মানুষের আত্মপ্রকাশের নিজস্ব ভঙ্গী, সাহিত্যের বিষয় ত হচ্ছে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মানুষের মনও বিভিন্ন এবং তার প্রকাশের ভঙ্গীও বিচিত্র, সে কারণ সাহিত্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্যও এত অসীম। আমার এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে জাতীয় সাহিত্য বলে কোনো পদার্থই নেই, আছে—শুধু নানা জাতীয় সাহিত্য, কেননা যে সব লোকের ব্যক্তিত্ব শিক্ষা দীক্ষার গুণে এবং আত্মচেষ্টার ফলে ফুটে ওঠে তাঁরা সত্য সত্যই পরস্পর বিভিন্ন জাতের মানুষ হয়ে ওঠেন।

দেখতে পাচ্ছ ঘুরে ফিরে আবার সেই individualism-এরই গুণকীর্ত্তন করছি—যার নাম শুনলে আঁতকে'ওঠা এদেশে পেট্রিয়ট্‌জমের একটা প্রধান নিদর্শন, কিন্তু কি করা যাবে? ও কথা বলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমাদের সকলেরই যদি, এক জ্ঞান, এক ধ্যান

এক মত, আর এক ভাষা হত, তাহলে আমাদের হাত থেকে যে সাহিত্য বেরত, তা এক কলে তৈরি জিনিষের মত সব এক আকার এক বর্ণ এক মাপ এক মূল্য হত। বলা বাহুল্য সে অবস্থায় আমাদের একাধিক গ্রন্থ পড়বার কোনো প্রয়োজন থাকত না। পড়বার কথা দূরে থাক লেখবার কোনো প্রয়োজন থাকত না, কেননা কেউ এমন কোন কথা বলতে পারতেন না, যে কথা সকলের কথা নয়। এ অবস্থা অবশ্য খুব আরামের অবস্থা, কেননা ও অবস্থায় মনের কোন খাটুনিই থাকত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেয়, এমন কি যা কিছু প্রেয়, তার রচনার ভিতরও আরাম নেই, ধারণার ভিতরও আরাম নেই। ইহজীবনে মানুষের দুটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় হচ্ছে— সত্যকে সুন্দর করে তোলা, আর সুন্দরকে সত্য করে তোলা এবং এ দুই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, অল্পবিস্তর সাধনার আবশ্যক। সুতরাং সাহিত্য রচনার জন্য রচয়িতার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা, অর্থাৎ--নিজের ব্যক্তিত্ব বিকসিত করে তোলা। Pericles এর যুগে আথেন্সের এবং এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের সাহিত্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্য যে এত বেশি, তার কারণ এ উভয় যুগে উভয় দেশেই বহু লোকের ভিতর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ স্ফুর্ত্তিলাভ করেছিল। অপর পক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরের জর্ম্মানীর সাহিত্যের যে কোনো ঐশ্বর্য্য নেই তার একটি প্রধান কারণ জর্ম্মানীর ইম্পিরিয়াল শাসন এবং জর্ম্মানীর ইম্পিরিয়াল শিক্ষা দেশসুদ্ধো লোকের মন ও চরিত্র একই ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করেছিল এবং জর্ম্মানীর দুর্ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টায় বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিল। আমাদের সমাজ-শাসন এবং আমাদেরও শিক্ষাদীক্ষা মানুষের individualism-

এর স্ফূর্ত্তির মোটেই অনুকূল নয়, সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যের উন্নতির জন্য আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যকে individualism-এর স্বপক্ষে লড়াই করতেই হবে। অর্থাৎ—বিষয়কে গৌণ করে বিষয়ীকে মুখ্য করে তুলতে হবে।

বীরবল।

পুনশ্চ—

এ প্রবন্ধ বহুদিন পূর্ব্বে লেখা হয়েছিল, যখন লেখবার কোন নতুন বিষয় ছিল না। যদি নতুন বিষয় চাও ত আজকের দিনে তার ত কোন অনাটন নেই। আমি একটা ছোট ফর্দ্দ ধরে দিচ্ছি, তার ভিতর থেকে যেটা খুসি তুমি বেছে নিতে পার।

১। Einstein-এর আবিষ্কার। আকাশের উঠোন বাঁকা, না আলোর চলন বাঁকা, এই সমস্যার আশ্রয়ে হরেকরকম দার্শনিক আকাশ-কুসুম রচনা করা যেতে পারে।

২। Marconi-র কাছে তারা থেকে বে-তার তার আসছে। এ তার পাঠাচ্ছে কে, দেবতারা, না যারা যুদ্ধে মরে জ্যোতির্ল্লোকে গিয়েছে? যুদ্ধে মরলেই যে মানুষ স্বর্গে যায় এ কথা ত সকল শাস্ত্রেই বলে। অতএব নক্ষত্রলোক হতে আগত টরেটক্কার অর্থ নিয়ে দেদার কল্পনা খেলানো যেতে পারে।

৩। যদি এই সব বিশ্বসমস্যা নিয়ে মাথা বকাতে না চাও ত Khalifate নিয়ে অনেক কথা বলতে পারো—যার ভিতর ঐহিক পারত্রিক সকল বস্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে,

অর্থাৎ কলমের বাঁটানে সসীমকে অসীম আর ডানটানে অসীমকে সসীম করতে পারবে।

৪। ওর চাইতে যদি নিরীহ বিষয় চাও তাহলে সুমুখেই ত Exchange পড়ে রয়েছে। রূপোর দর বাড়ে নি, সোনার দরও কমে নি, অথচ টাকার দাম যেমন বেড়েছে গিনির দাম তেমনি কমেছে। টাকা ও গিনির এই লুকোচুরি খেলা নিয়ে দেখ দেখি বুদ্ধি খেলাবার কি সুযোগ পাওয়া গেছে আর বলা বাহুল্য যে পৃথিবীতে হেন লোক নেই রজত-কাঞ্চনের এই মায়ার খেলায় যাকে মুগ্ধ না করবে।

আর যদি চাও ত উপরোক্ত চারিটি বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারো, যেহেতু ও চারিটিরি গোড়ায় রয়েছে একটি মাত্র সমস্যা—ভূলোকে সঙ্গে দ্যু-লোকের যোগাযোগের রহস্য। আলো বেঁকে যায় কেন? Einstein বলেন মাটির টানে। দেবতারা পৃথিবীতে তার পাঠাচ্ছেন কেন? উত্তর একই, মাটির টানে। Khalifate সমস্যার মূলে কি আছে, ইউরোপের মাটির টান, সোনারূপো এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায় কেন?—মাটির টানে।

এর থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, প্রথমে পৃথিবীতে যা ঘটে মানুষ যা করে তার মূলে আছে মাটির টান। দ্বিতীয় দ্যুলোক থেকে ভূলোকে যা কিছু আসে তা আলোকই হোক আর আকাশবাণীই হোক, সব বেঁকে যায়, সব বিগড়ে যায় ঐ মাটির টানে।

অতএব মানুষের কৃতীত্ব হচ্ছে সেই বস্তু সৃষ্টি করায়, যার উপর মাটির টান নেই, অর্থাৎ—আকাশকুসুম। ওবস্তু যে আমরা ভূলোক থেকে দ্যুলোকে পাঠাই।

বাপ ও ছেলে।

——ঃ০ঃ——

—"বাবা! বাবা! একটা গল্প বল।"

—"কিসের গল্প বাবা?"

—"এই—এই—এক্‌তা—এক্‌তা—বাগেল—এত্তবল বাঘেল—না, না, সেই কুমীলেল—সেই যে হাঁ ক'লে খেতে আসে।"

—"আচ্ছা,—এক যে ছিল কুমীর, সে করতো কি—না গর্ত্তের মধ্যে থাক্‌তো—"

—"না—না, গত্তেল মধ্যে নয়, তুমি জান না, জলেল মধ্যে। তালপল বলবো? শুন্‌বে? তালপল—তালপল—একদিন—এই যে সে—এই যে—একদিন—গত্তেল থেকে বেলিয়ে—সে—তালপল কি বাবা?"

—"তারপর সে দেখ্‌লে, একটা গরু—"

—"না—না, তুমি বল্‌চো কেন? আমি বল্‌বো। তালপল সে দেখ্‌লে—দেখলে—গলু—এক্‌তা গলু জল খাবো—না বাবা?"

—"হাঁ, হাঁ, লক্ষ্মী—কেমন গল্প শিখেচে আমার বাবা।"

স্নেহকাতর পিতা শিশুর কচি গাল দুটিতে বারবার চুম্বন করতে লাগলেন। পিতার এই অসাময়িক অর্থহীন দৌরাত্ম্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে শিশু দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে বল্‌তে লাগ্‌লো!

—"তালপল—শোন না বাবা—না, তুমি শোন—তালপল, কুমীল আস্তে আস্তে—এম্‌নি ক'লে—আস্তে আস্তে না গিয়ে—অাঁ—ক্।"

শিশু নিজেকে কুমীর এবং বাবাকে গরু করে পিতার হাত ধরে টান্‌তে লাগ্‌লো। পিতাকেও সহাস্যমুখে কুম্ভীর কবল গ্রস্ত গরুর মত ছট্‌ফট্‌ করতে হল কিন্তু ছেলে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিমানের সুরে বল্‌লে—"তুমি কাঁদ বাবা কাঁদ—আঁ—আঁ—অাঁ।"

—"গরু কি কাঁদতে পারে বাবা।"

—"হাঁ, পালে—কাঁদে।"

—"আচ্ছা, কাঁদ্‌চি—হাম্‌মা—"

—"গলু হাম্‌—মা বলে কাঁদে? গলুল মা কোথায় বাবা? হাঁসপাতালে? আবাল আস্‌বে?—আবাল গলুকে কোলে নিয়ে—হাম্—?"

মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি পিতাকে বলতে হল।

—"বাবা, কেমন ছবির বই!—কেমন ভাল ভাল ছবি!"

—"কৈ বাবা? কৈ? দেখবো।"

—"এই যে, এই দেখ—এই অজগর সাপ—এই ঈগল পাখী—"

—"এই উত্"।

—"হাঁ হাঁ—এই উট আর এই এক্কা গাড়ী"।

—এক্কা গালী খুব ছুটেছে"।

—"লক্ষ্মী, লক্ষ্মী—সব জানে বাবা আমার—এই গুল—এই—"

পিতা তাড়াতাড়ি পাতা উল্‌টে গিয়ে বল্লেন—"এই ক'য় কুকুর"

—"না কুকুল না—ঐ যে তুমি দেখালে না—ঐ যে ওলেল পল—"

—"ও কিছু না"।

অভিমানী ছেলে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বাপের দিকে একটি ছোট মুঠো তুলে বল্লে—"মাল্‌বো"।

বিপদ্‌গ্রস্ত পিতা বলে উঠ্‌লেন "বাবা, এই দেখ—উঃ কত বড় সিংহ—কত বড় কেশর"।

"—না ছিংহ না" মাটিতে শুয়ে পড়ে নির্ম্মমভাবে বইখানার উপর লাথি ছুড়্‌তে ছুড়্‌তে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বাপের কোলে মুখ লুকালো।

মা ছেলেকে অসুধ খাওয়াচ্চে এ ছবি কি সে না দেখে থাক্‌তে পারে? যে তার মা-ই তাকে কতবার দেখিয়েচে—সে জানে ও তার মায়েরই ছবি—অমন লম্বা চুল, অমন গয়না কাপড়—আর কোন্ স্ত্রীলোকের আছে! তার মা-ই যে তাকে কতবার পাছ্‌ড়ে কোলে ফেলে কাল-মেঘের রস খাইয়েচে।

বইখানাকে টেনে নিয়ে এসে পিতা বল্লেন—"আচ্ছা কেঁদোনা বাবা, দেখাচ্ছি" শিশু লাফিয়ে কোলের উপর উঠে বসলো। একটু-খানি দেখিয়েই তিনি আবার পাতা ওল্টাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শিশু তার গোল গোল কচি হাত পাতার উপর চাপা দিয়ে বল্লে—

—না, দেখি বাবা—মাকে আমি ভাল কলে দেখি"—

সে আজ কতকাল মাকে দেখে নি—কতদিন—কতমাস।

টস্ করে এক ফোঁটা গরম জল পিতার চোখ থেকে বইয়ের উপর পড়লো, তাড়াতাড়ি সেটাকে মুছে নিয়ে, ছেলেকে আরো ভাল করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লেন—

—"হয়েচে ত বাবা ছবি দেখা? এইবার বন্ধ করে রাখি—কেমন"?

ছেলে কোন উত্তর দিলে না—বিষাদ গম্ভীর মুখে শুধু বল্লে—

"বাবা, আমি ঘুমুবো—তোমার কোলে শুয়ে"।

তার শরীর ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েচে।

কোলে শুইয়ে তাকে নাচাতে নাচাতে পিতা বল্লেন—তুমি চোখ বোজ বাবা, আমি ঘুমপাড়ানো গান গাই—ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি আমাদের বাড়ী এসো—খাট নেই, চৌকি নেই—

"না বাবা, সেইটে—এ ধন যাল ঘলে নেই তাল"—

"ধন, ধন, ধন—আমার বাড়ীতে ফুলের বন—এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন—তারা কিসের গরব করে—তারা—"

আর গাইতে হল না—পিতা দেখ্‌লেন—শিশুর নিশ্বাস স্থিরভাবে পড়্‌চে—সে ঘুমিয়েচে। একদৃষ্টে তার চাঁদমুখখানির দিকে চেয়ে তিনি কার সাদৃশ্য তাতে দেখছিলেন কে জানে? কতক্ষণ নিশ্চলভাবে পাষাণে-গড়া মূর্ত্তির মত বসেছিলেন—সহসা চম্‌কে উঠে শুনলেন, শিশু ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলচে—

"আমি আলো অসুদ খাবো—আমি আল কাঁদব না।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

রায়তের কথা।

——:০:——

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

সুহৃদ্বরেষু—

বাঙলার নতুন কাউন্সেলের নতুন ইলেকসানের জন্যে কি প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে লোকের সুমুখে আমাদের খাড়া হওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তুমি আমার মত জানতে চেয়েছ। এ কথা শুনে লোকে হাসবে। একজন সখের সাহিত্যিকের কাছে কাজের পলিটিক্সের পরামর্শ চাওয়াটা সখের দলের পলিটিসিয়ানদের কাছে নিশ্চয়ই কামারের দোকানে দইয়ের ফরমায়েস দেওয়ার মত হাস্যাস্পদ ব্যাপারহিসেবে গণ্য হবে। তবুও তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছি। কারণ কি জানো?—এ যুগের পলিটিক্সে অধিকারীভেদ নেই। ডিমোক্রাসীর অর্থই কি এই নয় যে, রাজনীতি সম্বন্ধে সকলের সব রকম কথা কইবার সমান অধিকার আছে? এ ক্ষেত্রে লোকমত ত বেদবাক্য! আর অসংখ্য "আমার মতকে" ঠিক দিয়েই ত "আমাদের মত" পাওয়া যায়। এ হিসেবে আমারও মুখ খোলবার অধিকার আছে।

আর এক হিসেবে আমি বলতে পারি যে, তুমি এ ক্ষেত্রে ঠিক লোকের কাছেই এসেছ, কেননা আমি আমার কথা বাঙলায় বলতে

পারি। রিফরম বিলের ফল কি হল না হল, আর কি হবে না হবে—এ সব বিষয়ে ঢের মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই আইনের বলে আমাদের রাজনীতির ভাষা একদম বদলে গেল। এতদিন সে ভাষা ছিল রাজার, এবার হল তা প্রজার। ষোলআনার মধ্যে পোনেরোআনা ভোট যখন প্রজার হাতে তখন সে ভোট আদায় করতে হলে মাতৃভাষারই শরণাপন্ন হতেই হবে। ভিক্ষাটা, ভিক্ষাদাতার ভাষাতেই করতে আমরা বাধ্য; এই কারণেই ত সে ভাষা জানি আর না জানি—আমরা এ-যাবৎ আমাদের রাজনৈতিক আরজি-দরখাস্ত সব ইংরাজিতেই করতে বাধ্য হয়েছি। এখন থেকে দরখাস্ত যখন বাঙলা-তেই লিখতে হবে তখন যার ও-ভাষার কলম হাতে আছে তাকে বাদ দিয়ে পলিটিক্স করা আগেকার মত আর চলবে না। আর আমি যে বাঙলা জানি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, কেননা আমার লেখা পড়ে লোকে বলে আমি সংস্কৃত জানি নে। হাল পলিটিক্স সম্বন্ধে কথা কইবার বিশেষ অধিকার যে আমার আছে এই হচ্ছে তার প্রথম দলিল। আর যে সব দলিল আছে তা ক্রমে পেশ করছি।

(২)

কেন প্রোগ্রাম চাই।

তুমি ঠিক ধরেছ যে এ-ফেরা আমাদের যা-হোক্ একটা প্রোগ্রাম চাই-ই চাই। ইতিপূর্ব্বে যে সব ইলেকসান হয়ে গেছে তাতে প্রোগ্রামের কোনই আবশ্যকতা ছিল না। ভোটারের সংখ্যা ছিল দশ বিশটি আর সে ভোট যে যাঁর খাতির রাখে তিনি তাঁকে দিতেন। মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বাররা দেখতেন ভোটপ্রার্থী

লোকটা কে ; তাঁর মতটা কি, সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করত না। পূর্ব্বের ইলেকসান ছিল একরকম সামাজিক ব্যাপার, এমন কি সে ব্যাপারকে পারিবারিক বললেও অসঙ্গত হয় না, কেননা আমাদের দেশের পরিবার শুধু আত্মীয় স্বজন নিয়ে নয়, তার ভিতর আশ্রিত অনুগত লোকও ঢের থাকে। উকিল মোক্তার যেখানে ভোটার সেখানে জমিদারের সাহায্য ব্যতীত জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভোট আদায় করা কোনো অ-জমিদারের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ছিল, তা তিনি যতই বিদ্বান বুদ্ধিমান, যতই স্বদেশী ও "স্বরাজী" হোন না কেন। তোমার মনে থাকতে পারে যে গত ইলেকসানে, একটি জমিদার ভোটারের দল ভোটপ্রার্থী কি জাত সেই হিসেবে নিজেদের ভোট দেন। ফলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ডিডেটকে হারিয়ে রাঢ়ী কায়স্থ কাণ্ডিডেট পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে লাট সভায় ঢুকে গেলেন। বলা বাহুল্য এ দলে বেশির ভাগ ভোটার ছিল রাঢ়ী কায়স্থ।

কিন্তু রিফরম বিলের প্রসাদে ভোটারের সংখ্যা যখন দশ-লাখের উপর উঠে গেছে, তখন আর ইলেকসানের মামলা পারিবারিক ভোটে ফতে করা চলবে না। সুতরাং প্রোগ্রাম চাই।

প্রোগ্রাম চাই দু কারণে। এই নতুন ভোটারের দল প্রায় সবাই নিরক্ষর। পলিটিক্সের "প" অক্ষর তাদের কাছে হয় গোমাংস, নয় হারাম। তুমি অবশ্য জানো যে এই অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকারী করবার বিরুদ্ধে প্রধান কারণ দেখান হয়েছিল তাদের এই শিক্ষার অভাবটা, বাঙালী স্ত্রীলোকের দেহের মত, যাদের মনের পক্ষে "ঘর হতে আঙিনা বিদেশ", তাদের হাতে ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য নির্ব্বাচন করবার ভার দেওয়াটা যে প্রহসন মাত্র এ কথা দেশী বিদেশী, সরকারী বে-সরকারী অনেক লোক অনেক ভাবে বলে-ছেন, কেউ চটে কেউ হেসে, কেউ ধীরে কেউ জোরে। এ আপত্তির সার্থকতা আমি অবশ্য কখনো দেখতে পাই নি। গভর্ণমেণ্ট বলতে কি বোঝায়, গভর্ণমেণ্টের কটি সেরেস্তা আছে, প্রতি সেরেস্তার গঠন কি, কার অধীনে থেকে কি নিয়মে প্রতি সেরেস্তার কাজ চালাতে হয় এবং নানা বিভিন্ন সেরেস্তার আভ্যন্তরিক যোগাযোগটা কি, এ সব না জানলে যদি রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মত দেবার অধিকার না থাকে ত বাঙলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরও সে অধিকার নেই। অধি-কার নেই যে কেন তা শুনবে?—দু'বছর আগে পর্য্যন্ত কলিকাতার ল-কলেজে Constitutional Law পড়াবার ভার আমার হাতে ছিল। আমার ক্লাসে প্রতি বৎসর গোণাগাঁথা তিনশ' করে ছাত্র জড় হত এবং এরা প্রত্যেকেই হয় B. A., নয় B. Sc., অর্থাৎ—যুগপৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। এই অধ্যাপনাসূত্রে আমি কি আবিষ্কার করি জানো?—আমি নিত্য পরিচয় পেতুম যে এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর প্রভেদ যে কি সে বিষয়ে ওয়াকিব হাল নন। এ কথা তুমি সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না, কেননা কোনো আইনজ্ঞ লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নিজের অজ্ঞতা যদি গোপন রাখতে হয় তাহলে "শতং বদ মা লিখ" এই পরামর্শ মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভদ্রসন্তান-দের সে পন্থা অবলম্বন করবার ত উপায় নেই। এগজামিন আমাদের দিতেই হবে, লিখিত প্রশ্নের লিখিত জবাব দিতে আমরা বাধ্য, এবং কার কত বিদ্যে তা মুখ খুললেই ধরা পড়ে।

আমি আজ বছর দুয়েক আগে একবার Constitutional Law-এর কাগজ পরীক্ষা করি। "ভারতবর্ষের আইন কে তৈরী করে" এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর শতকরা নব্বইটি ছাত্র দিতে পারে নি, তাতে কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই নি, কেননা ছাত্রসাধারণের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে পাকা জবাব পাবার আশা আমি কোনো কালেই রাখি নে। মুখস্থজ্ঞান পত্রস্থ করতে গেলে কম বেশি গলদ হবেই হবে, বিশেষত সে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ বিলেতি পুঁথিগত। কিন্তু কতকগুলি উত্তর পড়ে আমারও চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল।

একজন লিখেছেন "ভারতবর্ষের সব আইন মুনিঋষিরা তৈরী করে গেছেন এবং আজও সেই সব বাহাল রয়েছে" আর এক জনের বিশ্বাস যে "ইংলণ্ডের রাজা হিন্দুস্থানের বড় লাটকে যে সব চিঠি পত্র লেখেন, সেই সব চিঠিতে তিনি যে হুকুমজারি করেন সেই সব হুকুমই হচ্ছে এদেশের আইন"। আর একজনের উত্তর—"ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আইন-কানুন তৈরী করে Native Prince-রা"। কিন্তু এঁদের সকলের মন ভারতবর্ষে আবদ্ধ নয়—এ দেশের আইন কর্ত্তার তল্লাসে বাঙলার নবীন ভাবুকদের কল্পনা "ভারতের নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ", অবশেষে "উপনীত হয়েছিল হিমালয়শিরে"। শেষে দেখলুম একজন লিখেছেন, "ভারতবর্ষের আইন বানান নেপালের রাজা"।

এরকম সব গাঁজাখুরি জবাবের কারণ আমি জানি। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে Constitutional Law-এর কোনো বই কখনো চক্ষেও দেখে নি, কেননা তারা জানে যে এ বিষয়ের কোনো জ্ঞান না থাকলেও তাদের পাশ আটকাবে না এবং পরে ওকালতিরও ঠেকা হবে না। কিন্তু এই সব উত্তরই প্রমাণ যে আমাদের দেশের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোনোরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই, এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে। এ অবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি লাটসভায় বসবার অধিকারী হন তাহ'লে অশিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সেখানে বসাবার অধিকার কেন না পাবে? এদেশের জনগণ নিরক্ষর বলে যে ভোটের অধিকারী হতে পারে না, এ আপত্তি মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে অগ্রাহ্য হয়েছে। কি কারণে অগ্রাহ্য হয়েছে তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উক্ত রিপোর্টের ৮৫ হতে ৯১, এই দশ পৃষ্ঠার ভিতর পাওয়া যাবে। ঐ পাতাক'টি বাঙলায় অনুবাদ করে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সে খাটুনি খাটবার অবসর আমার নেই। যাঁরা পলিটিক্সের ব্যবসা করেন তাঁদের ঐ দশ পৃষ্ঠা ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি। এস্থলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রিফরমের স্রষ্টাদের মতে এই ভোটসূত্রেই জনগণ পলিটিক্সের শিক্ষা লাভ করবে, আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তব্য হবে তাদের সে শিক্ষা দেওয়া, বই পড়িয়ে নয়—মুখে মুখে। অর্থাৎ—ইলেকসানের ক্ষেত্রেই হবে এ দেশের যথার্থ পলিটিক্যাল স্কুল, যেমন আদালতই হচ্ছে আইনের যথার্থ স্কুল।

জানই ত এ যুগের পলিটিক্সের গোড়ার কথা হচ্ছে প্রতি লোকের নিজের অধিকারের জ্ঞান। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ—একশ' আঠারো বৎসর আগে তখনকার ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থা জানবার জন্য জিলার কালেক্টরদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করে পাঠিয়ে দেন তার একটি প্রশ্ন ছিল এই—এদেশের প্রজাদের কি কি অধিকার আছে

এ প্রশ্নের উত্তরে মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্ট্রেচি সাহেব লেখেন :—

“অধিকার বলতে আমরা যা বুঝি, এদেশের জনসাধারণের কস্মিন্‌কালেও যে তা ছিল এরূপ বিশ্বাস আমার নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, তাদের কোনোরূপ অধিকার নেই, কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই। যদি কোথায়ও দেখা যায় যে তারা সুখ শান্তিতে বাস করছে তার অর্থ এ নয় যে, তাদের সুখে থাকবার কিম্বা শান্তিতে থাকবার কোনোরূপ অধিকার আছে। ও-দুই বস্তু হচ্চে তাদের শাসনকর্ত্তাদের দত্ত বরস্বরূপ। শাসনকর্ত্তারা উচিত জ্ঞান কিম্বা স্বার্থজ্ঞানের বশবর্ত্তী হয়ে তাদের উপর যদি জুলুম জবরদস্তি না করেন তাহলেই তারা নিজেদের কৃতার্থ এবং অনুগৃহীত মনে করে”—(Fifth Report, Vol. II, page 596.)

এ কথা যে সত্য তা কে অস্বীকার করবে? একটু চোখ-চেয়ে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আজকের দিনেও অধিকার সম্বন্ধে তারা যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই আছে। আজও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন-যাত্রা উপরওয়ালাদের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। হুজুরের মেহেরবানি ও ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহের জন্য আজও এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত।

মানুষের এই অধিকারজ্ঞান আমাদের দেশে ভুঁইফুঁড়ে ওঠে নি, সাগরপার থেকে জাহাজে চড়ে এসেছে। মনুষ্যত্বের দাবী আমরা ইংরাজি শিক্ষার গুণে করতে শিখেছি। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে দেখ তাতে আছে শুধু কর্ত্তব্যের কথা, অধিকারের ‘অ’ পর্য্যন্ত তাতে নেই। মানুষমাত্রেরই অধিকারের কথা (Rights of man) ইউরোপেও সেদিন উঠেছে, এই ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে। ও-জ্ঞান কোনো সমাজেই পুরাতন নয়। আমরা যে ভাবি ও-জ্ঞান সনাতন, তার কারণ আমরা

জন্মেছি ঐ জ্ঞানের আবহাওয়ার ভিতর, আর ইংরেজি স্কুলে ঢুকে পর্য্যন্ত ঐ বস্তু হয়েছে আমাদের মনের নিত্য নিয়মিত খোরাক। ইংলণ্ডের ইতিহাসের মত তার কাব্য সাহিত্যও স্বাধীনতার গন্ধে ভুরভুর করছে; সুতরাং ও-বস্তুর ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন আমাদের সবারই হয়ে গেছে।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে জনসাধারণের মনে তাদের অধিকারের জ্ঞান ঢুকিয়ে এবং বসিয়ে দেওয়া। ওর থেকে পালাবার জো নেই, কেননা সে পালানো হবে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য থেকে পালানো। কেউ কেউ অবশ্য বলবেন যে ও আমাদের মোটেই কর্ত্তব্য নয়, কেননা আমরা পরের জন্য ডিমোক্রাসি চাই নি, নিজেরা হতে চেয়েছিলুম স্বদেশী বুরোক্রাসি। পলিটিসিয়ানদের অনেকের নজর যে দেশের দিকে নয়, সিমলার উপর ছিল সে কথা আমরা জানি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে বললে গোল ত চুকেই যেত।

"অচল বলিয়া উচল সেবিনু
পড়িনু অগাধ জলে"—

অবস্থাটা যদি সত্য সত্যই তাই হয়ে থাকে ত ভদ্রলোকের পক্ষে সে কথা চেপে যাওয়াই শ্রেয়। সুতরাং কি চেয়েছিলুম আর না-চেয়েছিলুম, তা নিয়ে হা-হুতাশ করা নিস্ফল। ঘটনা যা ঘটেছে তাতে চাষার ভোট দিন দিন বাড়বে বই কমবে না, সুতরাং পলিটিক্যাল হিসেবে লোকশিক্ষার ভার আমাদের হাতে নিতেই হবে। অতএব প্রোগ্রাম চাই।

(৩)

(অধিকার সামান্য ও বিশেষ)

এ পর্য্যন্ত বোধহয় আমরা সকলেই একমত। কিন্তু আর বেশি এগোবার আগে অধিকার কথাটার ঠিক মানে যে কি তা বোঝবার একটু চেষ্টা করা যাক। এ চেষ্টা ফুজুল নয়, কেননা কথাটা হচ্ছে দ্ব্যর্থবাচক।

আমি এই খানিকক্ষণ হ'ল বলেছি যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে মানুষকে শুধু তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হয় আদেশ করা হয়েছে, নয়ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সে শাস্ত্রে ধর্ম্ম বলতে বোঝায় বিধি-নিষেধ-সম্বলিত বচন, অর্থাৎ—মানুষকে কি করতে হবে আর কি না করতে হবে, তাই জানানো হচ্ছে ধর্ম্মশাস্ত্রের কাজ। এক কথায় ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের শাস্ত্র।

সে শাস্ত্রে এই ধর্ম্ম আবার দু'ভাগে বিভক্ত। শাস্ত্রের ভাষায় দু-রকম ধর্ম্ম আছে, এক সামান্য ধর্ম্ম আর এক বিশেষ ধর্ম্ম। চুরি করো না, খুন করো না, পরদার হরণ করো না—এসব হচ্ছে সামান্য ধর্ম্মের কথা, কেননা এ সকল ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিচারে সকলের পক্ষে সমান মান্য। অপর পক্ষে বেদপাঠ করা ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্য ধর্ম্মের কথা এক রকম উহ্য রয়ে গিয়েছে। মেধাতিথি বলেন, যে-ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ তার বিশেষ করে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই, কেননা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে-ধর্ম্ম সর্ব্বলোকবিদিত। অপর পক্ষে বাইবেলে যিশুখৃষ্টের সব উপদেশই সামান্য ধর্ম্মগত। টাকা ধার

নিলে, কি হারে সুদ দিতে হবে সে বিষয়ে যিশুখ্রীষ্ট সম্পূর্ণ নীরব। অর্থাৎ—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে আইন আর বাইবেল হচ্ছে নীতিকথা।

বলাবাহুল্য এই সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মের ভিতর দা-কুমড়োর সম্পর্ক নেই, এদুয়ের উপরই সভ্য সমাজের ভিত্তি। বাইবেলে বিশেষ ধর্ম্মের কথা উহ্য রয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয় নি। কেননা যিশুখ্রীষ্ট এককথায় এ বিষয়ে সব কথা বলেছেন, "সিজারের প্রাপ্য তাঁকে দিয়ো", অর্থাৎ—আইন মেনে চলো।

তারপর কর্ত্তব্য ও অধিকার হচ্ছে দুটি আপেক্ষিক শব্দ। শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের সেবা করা যদি কর্ত্তব্য হয় তাহলে শূদ্রের কান ধরে সে সেবা আদায় করবার অধিকার ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং এ দু'-ই পরস্পর পরস্পরকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাচীন সভ্যতা ও নব সভ্যতার ভিতর আসল প্রভেদ এই যে, সেকালে লোক একমাত্র কর্ত্তব্যটাই মানুষের চোখের সুমুখে খাড়া করে রাখত, একালে বিশেষ করে অধিকারটাই আমরা খাড়া করতে চাই।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই কথাটা স্পষ্ট করা যে, কর্ত্তব্যের মত অধিকারও দুভাগে বিভক্ত, এক সামান্য অধিকার আর এক বিশেষ অধিকার। খুন করবার অধিকার যেখানে কারো নেই, বেঁচে থাকবার অধিকার সেখানে সবারই আছে, এই হচ্ছে মানুষের সামান্য অধিকারের প্রথম দফা। কিন্তু তুমি জান, আমি জানি আর সবাই জানে ফাঁসি দেবার, অর্থাৎ—মানুষের প্রাণবধ করবার বিশেষ অধিকার State-এর আছে, অর্থাৎ—সমাজ যখন প্রাণহিংসার বিশেষ অধিকার বিশেষ বিশেষ লোককে কিম্বা সম্প্রদায়কে দেয় তখন তা হয় বৈধহিংসা। অতএব

সামান্য অধিকারের কথাগুলো অনেক অংশে ফাঁকা, মস্ত হলেও ফাঁপা।

এখন আমার কথা এই যে মানুষের পক্ষে তার বিশেষ অধিকারের জ্ঞানটাই হচ্ছে তার পক্ষে সবিশেষ দরকারী। মানুষের সঙ্গে মানুষ মাত্রেরই একটা দূর সম্পর্ক অবশ্য আছে কিন্তু প্রতি লোকের, কোনো কোনো বিশেষ লোকের সঙ্গে যে বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাই নিয়েই তার জীবন। বাপ ও ছেলে, স্বামী ও স্ত্রী, মুনিব ও চাকর, এদের পরস্পরের ভিতর কর্ত্তব্য ও অধিকারের নানা রকম বিশেষ বন্ধন আছে। এবং সেই সব অধিকারের উপর দাঁড়িয়েই সামাজিক লোকে সংসার চালায়। এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। মোটামুটি ধরতে গেলে এ সব ক্ষেত্রে যে প্রবল, অধিকারটা বেশি করে তার হাতেই থাকে আর যে দুর্ব্বল কর্ত্তব্যটা বেশি করে তার ঘাড়েই পড়ে। আর এই দেনা-পাওনার হিসেবটা যতদূর সম্ভব দু-দিকে সমান করে নিয়ে আসাটা এ যুগের পলিটিক্সের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব জনসাধারণের মনে প্রধানত তাদের বিশেষঅধিকারের জ্ঞান জন্মিয়ে দিতে হবে এবং সামান্য অধিকারের কথা সেই স্থলেই পাড়তে হবে যেখানে আমরা তাদের অধিকার বাড়াতে চাইব। যা আছে সেই টুকুকে শুধু রক্ষা করার অর্থ স্থিতি, উন্নতি নয়। কিন্তু আমরা সবাই উন্নতি চাই, এ-ও হচ্ছে এ যুগের মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা। বিশেষ অধিকারের নিঃসম্পর্কিত সামান্য অধিকারের ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণকে ভোগা দেওয়া। সে দিন কংগ্রেস মানুষ মাত্রেরই সামান্য অধিকারের ফর্দ্দ ধরে দিয়েছেন। পলিটিসিয়ানরা যদি দেশের

লোকের কাছে সেই ফর্দ্দ পড়তে সুরু করেন তাহলে বোঝা যাবে যে তাঁরা চাষা-ভুষোকে কোনো বিশেষ অধিকার দিতে নারাজ। যাতে সকলের সমান অধিকার আছে তাতে কারো কোনো বিশেষঅধিকার না-ও থাক্‌তে পারে।

(৪)

(দেশের অবস্থা)

তার পর প্রশ্ন ওঠে দেশের লোককে পলিটিক্যাল শিক্ষা দেবার সদুপায় কি?

বই পড়ানো যে নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমাদের পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের লেকচার দিতে হবে? তাও অবশ্য নয়। কেননা ও-সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করা দরকার—B.A., M.A., পাশ করবার জন্যে এবং কলেজের প্রফেসারি করবার জন্যে। ও-জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয় নয়, অন্তত চাষাভুষোর পক্ষে ত নয়ই। তাদের অবস্থানুযায়ী অধিকারের কথা চাপা দিয়ে, তাদের কাছে rights of man-এর ব্যাখ্যান করার অর্থ গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। বিশেষ অধিকারের মূল থেকেই যে সামান্য অধিকারের ফুল ফুটেছে, এ কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে? তা ছাড়া এ শাস্ত্রের বড় বড় কথা প্রচার করবার ভিতর বিপদও আছে। জনগণ হয় সে সব বুঝবে না, নয় উল্টো বুঝবে আর তখন আমরা তাদের উপর হাত চালাতে প্রস্তুত হব।

এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিংকর্ত্তব্য? উত্তর খুব সোজা।

মানুষের বিশেষ অধিকারসকল তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তার স্বার্থ যে কোথায় এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদের পলিটিক্যাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগণ্ডাটা বুঝে নেবার ক্ষমতাটাও মানুষের একটা শক্তি, আর শক্তিই হচ্চে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র জনসাধারণের দিক থেকে নয়, সমগ্র জাতির দিক থেকে দেখলেও, যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করাটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে। আদমসুমারিতে জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য আর অসাধারণ জন, অর্থাৎ—ভদ্রলোকের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। আর যে জাতির বেশির ভাগ লোক দুর্দ্দশাপন্ন সে জাতির কি শরীরে কি অন্তরে কোনো শক্তিও নেই, কোনো উন্নতির আশাও নেই।

সুতরাং রাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাঙলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক্, সে দেশের অবস্থাই বা কি আর দেশ-বাসীদেরই বা অবস্থা কি? অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধে হবে। আমরা সকলে লাটদরবারে ঢুকতে চাচ্ছি শুধু যে উচিত ব্যবস্থা করবার জন্য, তা সে দরবারের নামেই প্রকাশ। কে না জানে সে সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা।

ছেলেবেলায় কথামালায় পড়েছিলুম যে জনৈক বৃদ্ধ কৃষক তার ছেলেদের ডেকে বলেন যে তার ক্ষেতে ধনরত্ন পোঁতা আছে। সেই ধনরত্নের লোভে তার ছেলেরা সেই ক্ষেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলট-পালট করলে; কিন্তু পোঁতাধনের কোথায়ও সাক্ষাৎ পেলে না, তবে এই খোঁড়ার ফলে এই ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত ফসল জন্মাল।

আমাদের বাঙলা দেশ হচ্ছে ঐ রকমের একটি প্রকাণ্ড কৃষকের ক্ষেত্র, ওর বুকের ভিতর কোনো গুপ্তধন পোঁতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ফসল জন্মায়। বাঙলা দেশ যে সোনার খনি নয়, এ বলে কোনো দুঃখ করবার দরকার নেই, কেননা আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা দু'দিনেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরন্ত ও চিরদিন ফলে।

বাঙলা দেশ যে শস্যক্ষেত্র এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাঙলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান জমিতে সার দিয়ে। তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয় তাহলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানব জমিন আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তাহলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হবে এই মানব জমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত—এ দু-ই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক্। আগামী ইলেকসানের জন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরী করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে, বাঙলার কৃষকের ওরফে বাঙলী জাতির অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্রজাতির দুরবস্থা দূর করা যে কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই একথা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে কেননা সে চেষ্টার ফল ভাল না হয়ে যায় না।

(৫)

(কৃষকের অবস্থা)

ইলেকসানের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিসিয়ানদেরই তৈরী করতে হবে, কেননা দেশ উদ্ধারের ভার তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। অতএব কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সেই মর্ম্মে প্রোগ্রাম তৈরী করা অবশ্য আমাদের পলিটিসিয়ানদের পক্ষেই কর্ত্তব্য। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও এ কর্ত্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না তাঁর পক্ষে দেশের মোড়লি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরী করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই তুমি যখন আধ আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে :—

"জমিদারের ঐশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সংবাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন"—

বঙ্কিমের যুগে পলিটিসিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল ইতি-মধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা ইতিমধ্যে বাঙলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি, ওকালতি ও ডাক্তারীর উপর। ডাক্তারী-কেরাণীগিরির সঙ্গে জমি-জমার কোনই সম্পর্ক নেই, আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকিল সম্প্র-দায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিরোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু Bengal Tenancy জানা এক কথা আর Bengal Tenantry জানা আর এক কথা। এর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে আর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমার বিশ্বাস বেশিরভাগ সহুরে উকিলরা কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নন্। আর যাঁরা জানেন তাঁরাও কৃষকের ব্যথার ব্যথী হতে পারেন কিন্তু তার কথার কথক নন। বাঙলার উকিলের দল জমিদারের মিত্রপক্ষ। এঁরা যে একমাত্র জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত তা অবশ্য নয়। জমিদার ও রায়ত উভয়েই এঁদের মক্কেল ; অতএব এঁরা গাছেরও পাড়েন তলার-ও কুড়োন। তবে তিল কুড়িয়ে তাল করার চাইতে গোটা তাল হাতে পাওয়া ঢের বেশি আরামের ও আহ্লাদের কথা। ফলে এঁদের লুব্ধ-দৃষ্টি উপরের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয় এবং আর নামে না। অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজামুড়ো দু-ই। পলি-টিসিয়ানরা প্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবী করতে প্রস্তুত নন, আমার এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয় তাহলে তার জন্য প্রধানত পলিটিসিয়ানরাই দায়ী। মডারেট, একষ্ট্রিমিষ্ট কোন দল থেকেই অদ্যাবধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয় নি এবং তা বার করবার তাঁদের যে কোনরূপ অভিপ্রায় আছে তার কোনরূপ আভাষও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শুনতে পাই যে মডারেট দল জমিদারদের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশ্বাস যে, নায়েব গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদায় করতে পারবেন, উপরন্তু জেলার হাকিম ও পুলিশের Co-operation-এর উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁদের প্রোগ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। "জোর যার ভোট তার" এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।

এ বিষয়ে Extremist দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে চেষ্টায় কোনো ফল হয় নি। এ দলের দু-চারজন কর্ত্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-দরবারে তাঁরা ঢুকলে বাঙলা দেশকে সেই দেশে পরিণত করবেন যে-দেশে আমাদের মেয়েরা খোকাবাবুর বিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ—যে-দেশে—

"লোকে গাই বলদে চষে।
দাঁতে হীরে ঘষে;
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে"—

এ উদ্দেশ্য যে অতি মহান সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই কিন্তু সন্দেহ আছে তার উপায় নিয়ে। স্বদেশকে "ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা" করে তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরণের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায়, কেননা ছেলেভুলোনো ছড়া ভাল করে বাঁধতে আমরাই পারি। কবিত্ব কবিতাতেই করা কর্ত্তব্য, ও-জিনিস গদ্যে খাপ খায় না। আর পলিটিক্সের তুল্য ঝুনো গদ্য এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে, হয় তাঁদের কোনও মত নেই আর না হয়ত সে মত এখন তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যে রকম অসোয়াস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন তাতে মনে হয় তাঁরা একটু উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে

প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে কোনো অধিকার দিতে রাজি নন এমন লোক সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই না বুরোক্রাটিক মনোভাব বলে? তবে এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে আমাদের শ্যাসনলিষ্টরা আপাতত বিদেশী বড় পলিটিক্স নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে স্বদেশী ছোট পলিটিক্সে মন দেবার তাঁদের একদম ফুরসৎ নেই। বড় পলিটিক্সের কারবার অবশ্য রাজরাজড়া নিয়ে। মানুষে যখন মুখে রাজা উজির মারতে বসে তখন কি কত ধানে কত চাল হয় তার ভাবনা সে ভাবতে পারে?

(রায়তের প্রোগ্রাম)

দেশের পলিটিসিয়ানরা যখন এ বিষয়ে ঔদাসিন্য দেখাচ্ছেন তখন যা হোক একটা একমেটে প্রোগ্রাম তৈরী করবার চেষ্টা করা যাক। যদি কেউ বলেন:—

"যার কর্ম্ম তার সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে"—

তার উত্তর, রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকার চর্চ্চা নয়, এর ভাল ভাল নজির আছে। বাঙালীর মধ্যে যে-শ্রেণীর লোকদের আমরা গুরু বলে মান্য করি তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথী এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন। এ বিষয়ে কথা কইবার এই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় দলীল।

তুমি আমি যখন বালক সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার প্রজার অবস্থা বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে রায়তকে যে অবস্থায় আমরা রেখেছি তার ফল ত্রিবিধঃ—

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব

তারপর তিনি আবার বলেন যে ঃ—

"ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে, ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়"।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ আজকের দিনেও বাঙলার রায়তের দল দরিদ্র, মূর্খ ও দাস।

তারা যে মূর্খ সে বিষয়ে ত আর কোনো মতভেদ নেই। তারপর তারা আইনত না হলেও বস্তুত যে দাস, "ক্রীতদাস" না হলেও যে "গর্ভদাস" এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও তারা নিজের অধিকারের উপর দাঁড়াতে পারে না, প্রভুর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরাজের আইন তাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। Tenancy Act আজকের দিনে জমিদারের হাতে সঙ্গীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও ত করো উচ্ছেদের মামলা, সত্ত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসলক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকী খাজানার নালিশ, আর তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও—কর তার নামে বাকীপড়া।

তবে যে প্রজা টিঁকে আছে তার কারণ বেশির ভাগ জমিদার আইনের মার রায়তদের মারেন না, তাছাড়া মুনসেফ বাবুরা জমিদারের

দাখিলী কাগজ, তা সে জমারই হোক সুমারেরই হোক, পারৎপক্ষে প্রামাণ্য বলে গ্রাহ্য করেন না। আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা। এঁরা যে জমিদারের প্রতি সব সময় সুবিচার করেন তা নয়, তবে প্রজা যে বেঁচে বর্ত্তে থাকে সে মুন্সেফবাবু ও Settlement office-এর গুণে। সরকারের বেতনভোগী এই রাজ-কর্ম্মচারীরাই হচ্ছেন বাঙলার রায়তের যথার্থ রক্ষক, জমিদারের বিত্তভোগী-রাজনীতি-ব্যবসায়ী উকিল মোক্তারেরা নন। অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে প্রজার দাসত্ব আজও ঘোচে নি।

আর তার দারিদ্র্য যে কি ভীষণ তা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহোদয়ের কথাতেই প্রকাশ। তিনি সেদিন Bengal Land-holders-দের তরফ থেকে গভর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখেছেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Bengal, if not the whole of India, Bengal probably more so than the rest of India, is an agricultural community—seventy-seven per cent of her population being agriculturists. It is an undeniable fact that seventy per cent of the peasantry out of the seventy-seven per cent of the whole population is so poor, that the income *per capita* is not more than a few rupees a year, and they go to bed every day without a square meal. (Statesman, 5th March 1920).

অন্য বাঙলা :—

বাঙলা, যদ্যপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হয়, বাঙলা সম্ভবত বাকী ভারতবর্ষের অধিক, হচ্ছে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়, কারণ তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্তর জন কৃষক। ইহা অস্বীকার করবার জো নেই যে কৃষকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন, যে কৃষকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাতাত্তর, এতাদৃশ দরিদ্র যে মাথা পিছু বাৎসরিক আয় দু-চার টাকা মাত্র, এবং তারা পেটভরে না খেয়েই শুতে যায়"—

চক্রবর্ত্তী সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব কথায় কথায় অনুবাদ করেছি, তার উপর সাহিত্যিক হাত চালাই নি এই ভয়ে যে, পাছে কেউ বলে যে আমি তার গায়ে রং চড়িয়েছি। বাঙলা দেশে শতকরা সত্তর জন লোক যে বারো মাস আধপেটা খেয়ে থাকে, স্বজাতির অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুতে যায় তারা যে আবার বিছানা থেকে ওঠে এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে একথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা যাঁর তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে চক্রবর্ত্তী সাহেবের কথনো ঠিকে ভুল হয় না। বিশেষত তিনি যখন জমিদারের পক্ষ থেকে প্রজার এই ভীষণ দারিদ্র্য কবুল করেছেন তখন রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহম্মকি। আর আজ আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে বসেছি।

প্রজার দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের কথা। সম্ভবত সে যুগে ম্যালেরিয়া দেশকে তেমন আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। আজকের দিনে জনসাধারণের শরীরগতিক কি রকম তার পরিচয় সরকারের তরফ

থেকে বর্দ্ধমানের মহারাজাই দিয়েছেন। তাঁর কথা তাঁর ভাষায় এস্থলে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent of the population has died, and unfortunately the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable." (Statesman, March 6, 1920.)

অস্যার্থ বাঙলা :—

"মোটামুটি বলতে গেলে, গত দুই বৎসরের প্রতি বৎসর বাঙলা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা চার জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে যত মৃত্যু হয়েছে তত জন্ম হয় নি। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, যে-সব কারণে লোকক্ষয় হচ্ছে তার একটিও অনিবার্য্য নয়।"

এই ত গেল মৃত্যুর তালিকা; কিন্তু যারা বেঁচে থাকে তার মধ্যেও অধিকাংশ লোক জ্বরজীর্ণ। আর বলাবাহুল্য যে এই রোগের অত্যাচার বিশেষ করে সহ্য করতে হয় আমাদের প্রজা সাধারণকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে রোগের যোগাযোগটা যে অতি ঘনিষ্ঠ সে কথা উল্লেখ করবার কি আর কোনো দরকার আছে। যারা বারোমাস এক সন্ধ্যে আধপেটা খেয়ে শুতে যায় তারা যে রোগ-শয্যায় শয়ন করলে সেখান থেকে আর ওঠে না, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে।

অতএব তোমাদের সেই প্রোগ্রাম খাড়া করতে হবে যার বলে বাঙলার রায়ত মূর্খতা, দারিদ্র্য, দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাঙলার না হোক, বেহারের প্রজাবর্গ পলিটিসিয়ানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বপক্ষের একটি প্রোগ্রাম খাড়া করেছে। সেই প্রোগ্রাম যদি সঙ্গত হয় তাহলে তা আমাদের শিরোধার্য্য করে নিতে হবে। এখন আমি সেই প্রোগ্রামের বিচার করতে প্রবৃত্ত হলুম।

(প্রোগ্রামের পরিচয়)

কিছুদিন আগে "ইংলিসম্যান" কাগজে হঠাৎ চোখে পড়ল যে বেহারের রায়তেরা মজফরপুরে এক প্রকাণ্ড সভা করে সকলে একমত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ক'টি পাশ করেছে।

প্রথম। দেশময় Compulsory Primary Education প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়। প্রতি চারমাইল অন্তর একটি করে Charitable Dispensary থাকা চাই।

তৃতীয়। প্রজার দখলীসত্ত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্ব্বত্র আইনত হস্তান্তর যোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

চতুর্থ। নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে, অর্থাৎ—প্রজা সে গাছের সত্ত্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

পঞ্চম। প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ী তৈরী করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজার দখলীসত্ত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না। অর্থাৎ—দখলী-সত্ত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই আইনত মৌরসী-মোকররী বলে গণ্য হবে।

প্রজা পক্ষের প্রথম দুটি দাবী যে ন্যায্য সে বিষয়ে কোনোরূপ মত-ভেদ নেই। লোকশিক্ষার বিস্তারের জন্য আজ বছর দশেক ধরে সকল দলের পলিটিসিয়ানরা ত সমান চীৎকার করছেন। এবং গভর্ণ-মেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন না বলে' আমরাও, সরকার কর্ত্তব্যের অবহেলা করেছেন বলে, তাঁর প্রতি নিত্য দোষারোপ করি। তারপর প্রজার রোগের প্রতিকার করাও যে গভর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তব্য সে কথা গভর্ণমেণ্টও মানেন। মণ্টেগু-চ্যাম্‌সফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশ যে আর পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে—the provision of schools and dispensaries within reasonable distance,—these are the things that make all the difference to his life.—

সুতরাং দেখা গেল যে প্রজাপক্ষ ও সরকারপক্ষ এ বিষয়ে একমত। জমিদার পক্ষও এ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ নন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী তাঁর পূর্ব্বোক্ত পত্রে লিখেছেন যে বাঙলার ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্টকে এই দুই কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে পালন করতে হবে :—

1. Sanitation involving, as it must, ways and

means as to how she is to combat the scourges of malaria and cholera and other similiar scourges.

অস্যার্থ—

"বাঙলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করতে হবে, অর্থাৎ—ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।"

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the ligt of the recent University Commission Report.

অস্যার্থ—

"নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাঙলার ঘাড়ে পড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিসনের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।"

বলা বাহুল্য যে, মণ্টেগু-চ্যামস্‌ফোর্ড রিপোর্ট যা দু-কথায় বলেছে, জমিদার পক্ষ তাই একটু ঘুরিয়ে ও ফলিয়ে বলেছেন। এ দু-মতের ভিতর কিন্তু একটু গরমিল আছে। মণ্টেগু-চ্যামস্‌ফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিস্‌পেন্‌সারি আর জমিদার পক্ষ চান দেশের আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন। অবশ্য এ দু-ই চাই। তবে সর্ব্বাগ্রে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে। যদি আমরা হাতে হাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করি তাহলে Sanitation-এর দৌলতে দেশকে যে-দিন স্বর্গ করে তুলব সে দিন হয়ত দেখব যে দেশে আর মানুষ নেই, সবারই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মণ্টেগু-চ্যামস্‌ফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্কুল ডিস্‌পেন্‌সারি প্রভৃতি প্রজার জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ—তার উন্নতি

ঘটায়। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নয়, মনের উপরও আছে। আজকের দিনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি?

রাশিয়ার সম্বন্ধে একজন জার্ম্মেন লেখকের বই সে দিন আমি পড়ছিলুম। রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যারিষ্টার উক্ত জার্ম্মেন ভদ্রলোককে যা বলেছিলেন তার গুটিকয়েক কথা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি।

—"আমার দেশের লোক অবিচারে অভ্যস্ত। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা আর না করা বড়লোকের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অন্যায় অত্যাহিত অদৃষ্টের নিয়তি বলে মেনে নেই। যে শীলাবৃষ্টি তাদের শস্য নষ্ট করে ও উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তারা বঞ্চিত ও পীড়িত হয়, রাশিয়ার কৃষকদের কাছে এ দুয়ের ভিতর কোনই তফাৎ নেই, দু-ই এক জাতীয় ঘটনা। (Hugo Ganz-Le Debacle Russe).

আমি জিজ্ঞেস করি যে আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান কৃষকদের মনোভাবের কোনো তফাৎ আছে কি? এরা উভয়েই কি একজাত নয়? একেই বলে 'দাস'-মনোভাব। আর আমার মতে মনের দাসত্বই হচ্ছে সব চেয়ে সর্ব্বনেশে দাসত্ব। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে তার প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং গ্রামে গ্রামে স্কুল বসালে আশা করা যেতে পারে যে, আমাদের প্রজাসাধারণের মনের আব-হাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসলে মনের sanitation বই আর কিছুই নয়। মণ্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্টে রায়তের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—

"His mind has been made up for him by his landlord or banker or his priest or his relatives or the nearest official"—

অর্থাৎ—রায়তের মন, হয় তার জমিদার নয় তার মহাজন, হয় তার পুরুত নয় তার আত্মীয়-স্বজন আর না হয়ত হাতের গোড়ায় যে রাজপুরুষ থাকেন তিনি গড়ে তোলেন।

আশা করা যায় শিক্ষা পেলে রায়তদেরও নিজের মন বলে একটা জিনিস জন্মাবে।

দেখা গেল যে রায়তদের শিক্ষার দাবী ও স্বাস্থ্যের দাবী সকলেই মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাদের সত্বের দাবীর কথা কানে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন এমন লোকের এ দেশে অভাব নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রজার পক্ষ যারা সমর্থন করতে উদ্যত হন তাঁদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন না। যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারো মতে সে Bolshevic; কারো মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে বা, সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের মারামারি কাটাকাটির পক্ষপাতী।

এঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে, এ সকল অপবাদ কতদূর অমূলক। প্রথমত Bolshevic জন্তুটি যে কি তা তাঁরাও জানেন না, আমরাও জানি নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে দেখানো অনুচিত, দেখাও ছেলেমি।

দ্বিতীয়ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার প্রস্তাব করা আমাদের

পক্ষে মূর্খতা হবে। কেননা উক্ত বন্দোবস্তে প্রজার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে State-এর। সমস্ত বাঙলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রজার দেয়-খাজানা কমবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রজার তরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

তৃতীয়ত। নতুন অধিকারের দাবী যে-কেউ করে তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিরকালই ঐ ঘর-ভাঙানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হলেও আমি তা বলতে বাধ্য। বাঙলার জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কু-সংস্কার আমার নেই, আর থাকতে পারে না। আমার আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব—সবাই জমিদার, কেউ বড় কেউ ছোট কেউ মাঝারি। আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আব-হাওয়াতেই বাস করে আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়। জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন সে আক্রমণ আমি করতে পারি নে, কেননা আমি জানি যে সে আক্রমণ অন্যায়। ভালমন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে কিন্তু এ কথা জোর করে বলতে পারা যায় যে সাধারণত জমিদারের দল অর্থলোভী নয়। জমিদার আর যাই হোক, মহাজন নয়। আয় বাড়ানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, প্রজার সত্ত্বের দাবী মঞ্জুর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হয়ত দু-দিন পরে দেখা যাবে যে, জমিদারেরাই প্রজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকী ক'টি দাবী যদি গ্রাহ্য হয় ত আমার বিশ্বাস তার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবী-গুলির পর পর বিচার করা যাক।

দখলিসত্ত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তর যোগ্য, কিম্বা নয় এ প্রশ্নের উত্তরে আইন এখন প্রথার দোহাই দেয়। আইনের কথা হচ্চে যে, যে-জেলায় উক্ত জোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে—সে জেলায় সে জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত হস্তান্তর করতে পারে—আর যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই সেস্থলে তার দান বিক্রয় জমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাহ্য করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাহ্য করতেও পারেন।

কিন্তু আসলে ঘটনা কি জানো?—ও-জোত সমগ্র বাঙলায় নিত্য নিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জমিদারও তা মেনে নিচ্চেন, কেননা তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে জমিদার যে প্রথার দোহাই দেন সে শুধু দাখিল-খারিজের মোটা রকম সেলামি আদায় করবার জন্য। কোথায়ও বা জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ আদায় করা হয়, কোথাও বা জমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই—যাঁর যে-রকম প্রবৃত্তি ও শক্তি, তিনি এই সুযোগে প্রজাকে সে অনুসারে দুয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাতাত্তর জনের মধ্যে সত্তরজন বারোমাসে একদিনও পেটভরে খেতে পায় না, তাদের এরূপ দোহন করা যে অত্যাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে কখনই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাড়া, এই দাখিল-খারিজসূত্রে প্রজাকে যে কি পর্য্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা জমিদারী সেরেস্তার সঙ্গে যাঁর কোনোরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

আছে তিনিই জানেন। দাখিল-খারিজের প্রার্থীদের জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যায়। জোত-খরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নামপত্তন করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ, বিয়ের জন্য লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব-গোমস্তা জমানবীশ সুমোর-নবীশ পাইক বরকন্দাজ যে পারে সেই মোচড় দিয়ে দু-পয়সা আদায় করে নেয়। সুতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে আশাকরি Bolshevism-এর পরিচয় দেওয়া হয় না।

তার পর নিজের জোতের গাছ কাটবার অধিকার। যার নিজের বোনা-শস্য কাটবার অধিকার আছে তার নিজের পোঁতা-গাছ কাটবার অধিকার যে কেন থাকবে না তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে।—উকিল বাবুরা আমাদের Transfer of Property Act পড়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি বলব যে বাঙলার রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও ত property সম্বন্ধে অনেক শেখা বিদ্যে ভুলতে হবে। বেঁচে থাকবার জন্যে, প্রজার আম কাঁটালের তক্তার প্রয়োজন আছে—শোবার তক্তাপোষের জন্যে, দুয়োরের কপাটের জন্যে, চালের খুঁটির জন্যে; আর যদি বলো যে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই তাহলেও তাদের কাঠের দরকার আছে—মলে পোড়াবার জন্যে। যেমন মুসলমান প্রজার সাড়ে তিন হাত জমিতে অধিকার আছে—তার গর্ভে অনন্ত শয্যায় শয়ন করবার জন্যে। সুতরাং গাছ কাটাটা এমন কিছু অপরাধ নয় যার জন্যে তাকে জরিমানা দিতে হবে। তার দারিদ্র্যের কথাটা

স্মরণ করলে এ জরিমানার দায় হতে তাকে মুক্তি দেওয়াটা কি অধর্ম্ম ?

তার পর আসে কুয়ো খোঁড়া কোঠাবাড়ী তৈরী করবার অধিকার। এ সম্বন্ধে আইনের কথা হচ্চে একটা বেজায় রহস্য। আইনে বলে যাতে জোতের উন্নতি হয় তা করবার অধিকার প্রজার আছে। এবং জোতের উন্নতি কাকে বলে সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক, দেদার নজির আছে। Bench এবং Bar-এর এই সব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম বিচারের গুণে এ বিষয়ে আইন ক্রমে সরু হতে হতে শেষটা লূতাতন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড দিতে হয়, একবার উকিলের কাছে আর একবার জমিদারের কাছে। নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ী তৈরী করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ চলে। বাস্তু পাকা করতে চেষ্টা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে উচ্ছন্ন হতে হবে এর চাইতে আর অদ্ভুত ব্যবস্থা কি হতে পারে ? তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে বোনা-আইনের মাকড়সার জালে বাঁধা পড়ে কীট, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাঙলার প্রজা আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রজার শেষ দাবী এই যে তার জোত মৌরসি ও মোকররি হবে। অর্থাৎ—অতঃপর জমাবৃদ্ধির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না। আমার মতে Record of Rights প্রজার জমি অনুসারে যে জমা ধার্য্য করে দেয় সেই জমাই আইনত চিরস্থায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—যতদিন State-এর সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে। এ দাবী অপূর্ব্বও নয় অদ্ভুতও নয়। ১৮৩২

খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে পার্লেমেণ্টারি কমিশনের সুমুখে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবী উপস্থিত করেছিলেন। বাঙলা দেশের এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধার্য্য। তাঁর সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে পলিটিক্স সম্বন্ধেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল। তারপর আমার মতের স্বপক্ষে আবার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন যে :—

"It would be iniquitous to think of taxing a population so poor as this, and my Committee venture to enter an emphatic protest against any idea of further taxation"—

অস্য বাঙলা :—

"এরূপ দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর টেক্স বসানোর চিন্তাও পাপ কার্য্য হবে এবং আমার কমিটি এস্থলে আবার নূতন কোনো টেক্স বসানোর বিরুদ্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জোরগলায় জানিয়ে রাখতে সাহসী হচ্ছে"—

উপরোক্ত কথা কটির মধ্যে "টেক্স" কথাটি বদলে তার জায়গায় "খাজনা" বসিয়ে দিলে, আমার বক্তব্যের একটা জোরালো সংস্করণ পাবে। টেক্স অবশ্য State আদায় করে আর খাজানা জমিদার, অর্থাৎ—প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং যে-টাকা জাতীয় কার্য্যে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আদায় করা পাপ কার্য্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি হিসেবে পুণ্যকার্য্য, তা বোঝবার মত সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান আমার নেই।

আমি জানি এর উত্তরে পলিটিসিয়ানরা কি বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, বর্ত্তমান State ত আমাদের জাতীয় নয়, ও-হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট, অতএব এ ক্ষেত্রে State-এর স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তথাস্তু। কিন্তু নূতন টেক্সের বিরুদ্ধে চক্রবর্ত্তীসাহেবপ্রমুখ জমিদার বর্গের জোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে রায়তের দারিদ্র্য। রায়ত যদি নতুন টেক্সের চাপ আর বিন্দুমাত্রও সইতে না পারে তাহলে জমাবৃদ্ধির চাপই যে সে কি করে সইতে পারবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তবে আমি বুঝতে পারি নে বলে যে পলিটিসিয়ানরা বুঝতে পারেন না, তা অবশ্য হতেই পারে না। সুতরাং জমিদার কর্ত্তৃক হত-দরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ দেবার কি সব পেট্রিয়টিক এবং ন্যাশনলিষ্ট ওরফে "স্বদেশী" ও "স্বরাজী" যুক্তি আছে তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিসিয়ানদের 'পেট্রিয়টিক'-জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের যাঁরা ভাল চান তাঁদের পক্ষে রায়তদের উপরোক্ত দাবী ক'টি প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমত, এ-ক'টি অধিকারে তারা অধিকারী হলে তাদের দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। দ্বিতীয়ত, তারা তাদের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার বলে তাদের 'দাস' বুদ্ধি দূর করা যাবে না, সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাই তাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটানো।

পূর্ব্বে যে রাশিয়ান ব্যারিষ্টারের উক্তি উদ্ধৃত করে দিয়েছি

তিনিই তাঁর জর্ম্মান অতিথিকে আর যে একটি কথা বলেছিলেন সেটি এখানে তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। সে কথা এই :—

"আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সব চাইতে কিসের বিশেষ অভাব আছে জানেন?—স্বাধিকারের জ্ঞান। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন যে সত্ত্বের জ্ঞান থেকেই মানুষের অধিকারের জ্ঞান জন্মায়। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এদেশের কৃষকদের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক লোকের জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি।"

বাঙলার প্রজা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠা-বাড়ী করবার, কুয়ো খোড়বার অধিকার পায় এবং সেই সঙ্গে তার জোত মৌরসী-মকররি হয়, তাহলে সে ইংরাজিতে যাকে বলে peasant proprietor, তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে, জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য্য যে কতদূর বেড়ে যায় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ—বর্ত্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে সত্ত্বহীন ও দরিদ্র করে রাখলে তার ফল যে-কি হয় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্ত্তমান রাশিয়া। যাঁরা Bolshevism-এর ভয়ে কাতর তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাঙলার রায়তকে বাঙলার peasant proprietor করবার জন্য তৎপর হোন। যে-রকম দিনকাল পড়েছে তাতে করে মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এ সব অধিকার আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই ত কাল তারা তা কেড়ে নিতে প্রস্তুত হবে। পৃথিবীর লোকের এখন মাথার ঠিক নেই, তার উপর তাদের ঐহিক উন্নতির পিপাসা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)

প্রজার এক নম্বর ও দু'নম্বর দাবী আমরা যে মুখে অত সহজে মেনে নিই তার কারণ, কাজে তা পূরণ করা অতিশয় কঠিন। দেশ-যোড়া রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই। এবং এই অতিরিক্ত টাকা যে কোথা থেকে আসবে তার সন্ধান আমরা আজও পাই নি। আয় বৃদ্ধি না করে অবশ্য ব্যয়বৃদ্ধি করা চলে না আর সরকারী তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মত বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মামলাটা এখন মুলতবি থাকবে। কত দিনের জন্য বলা কঠিন, কেননা আজকের দিনে ও-মামলার তারিখ ফেলতে কেউ প্রস্তুত হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের যে সব অকিঞ্চিৎকর বন্দোবস্ত করা হবে তাতে করে দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনই সুসার হবে না—মধ্যে থেকে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপর পক্ষে প্রজার অপর দাবীগুলি আমাদের পার্লামেণ্ট বসবা-মাত্র আমরা একদিনে পূরণ করে দিতে পারি। Tenancy Act-এর গুটিকয়েক ধারা বদলালেই কার্য্য উদ্ধার হয়ে যায়। এতে কোনো খরচা নেই।

তবে বর্ত্তমান Tenancy Act-এর উপর হস্তক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলেই অমনি চারিদিক থেকে চীৎকার উঠবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাব

যে, ও-কার্য্য করাও যা আর ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই। জানই ত আজকাল ধর্ম্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম্ম বলতে লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে লোকের পারলৌকিক ভয়-ভরসা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্ম্মের মানে হয়েছে temporal, অর্থাৎ—সাংসারিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্য্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা যে-কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম্ম, সে কালে ধর্ম্ম অবশ্য পলিটিক্স হতে বাধ্য। অতএব এখানে বলা দরকার যে প্রজার দাবী অনুযায়ী Tenancy Act-এর বদল করলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে জানো ?—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন এবং যে কথা আজ পর্য্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথা রাখা হবে, এর বেশি কিছুই নয়।

আমার এ কথা যে সত্য, তা যিনিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্ম-বৃত্তান্ত জানেন তিনিই স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ইতিবৃত্ত খুব কম লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয় স্মরণশক্তি এতই কম যে, যে-জিনিস ইংরাজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে আমরা মান্ধাতার আমলে রবলে মেনে নিই। অতএব এস্থলে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসটা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা দেশে ঘোর অরাজকতা ঘটেছিল। সেই অরাজকতার ফলে ইংরেজ এদেশের রাজা হয়ে বসলেন এবং সেই অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করলেন। এ আইন হচ্ছে

আসলে একটি emergency legislation, যেমন গতকল্যের Ghee Act এবং আগামী কল্যের Rent Act; এ রকম আইন অবশ্য মেয়াদীই (temporary) হয়ে থাকে; কিন্তু জমিদারের কপালজোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল। এরূপ হবার কারণ কতকটা দেশের অবস্থার গুণ আর কতকটা ইংরাজের বুদ্ধির দোষ।

দেশ যে কতদূর অরাজক হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং ভারতচন্দ্র। মোগলে-মারহাট্টায় মিলে বাঙলার অবস্থা যে কি করে তুলেছিল তার বর্ণনা অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনাতেই পাবে। সে বর্ণনার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"সুজা খাঁ নবাবসুত সরফ্রাজ খাঁ।
দেয়ান আমলচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিল পাতসা খেতাব॥

* * * * *

কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥

* * * * *

ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া॥

এই ত গেল মোগলের ব্যবহার। তারপর শোন মারহাট্টার কীর্ত্তি :—

* * * * *

স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইলা রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥

* * * * *

বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ॥
লুটি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম পুড়ি পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ি বহুড়ি ॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল ॥”

* * * * *

নবাব বর্গির ভয়ে পালিয়ে রইলেন বটে কিন্তু বাঙালীর উপর অত্যাচার তাঁর বাড়ল বই কমল না। আবার ভারতচন্দ্রের কথা শোনো :—

* * * * *

“নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥

নদীয়া প্রভৃতি চার সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি॥
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে' বারো লক্ষ টাকা চায়॥

* * * * *

লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার-লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥
বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন॥"

* * * * *

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়—খাঁটি ইতিহাস। আলিবর্দ্দি খাঁ যে প্রজাপীড়ন করে' টাকা আদায় করেছিলেন, সে বর্গির রাজাকে চৌৎ দেবার জন্য। একদিকে দিল্লীর বাদশাকে, আর একদিকে বর্গির রাজাকে কর দিতে না পারলে তার নবাবী থাকে না, কাজেই বাঙলার প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত করতে তিনি বাধ্য হলেন। এখানে একটি কথার মানে বলে দিই। সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারী কর্ম্মচারী যে সরকারের তরফ থেকে খাসে প্রজার কাছ থেকে খাজানা আদায় করে। এই সুজন সাজোয়ালটি যে কে তা জানি নে, কিন্তু সেকালে অমন সুজন দেদার মিলিত। এবং এই সব সুজনের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার অন্যতম কারণ।

ভারতচন্দ্রের কবিতার এতটা অংশ উদ্ধৃত করে দিতে এই কারণে বাধ্য হলুম যে "অন্নদামঙ্গল" আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে "মেঘনাদবধ"। বাঙলার চেয়ে লঙ্কা আমাদের মনকে বেশি পেয়ে বসেছে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাঙলার তক্তে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এঁর শাসন যে দেশের লোকের কাছে কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ বছর না পেরুতেই বাঙলায় ঘটল রাষ্ট্রবিপ্লব। যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈতৃক প্রাণ, দু-ই হারালেন, একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানীর সেকালের কর্ত্তাব্যক্তিরা সকলেই এ ব্যাপারকে Revolution বলেই উল্লেখ করেছেন। পলাসীর যুদ্ধ জেতবার ফলে কোম্পানী বাহাদুর বাঙলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ পরগণার জমিদারীসত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্য্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন বৎসর গোলেমালে কেটে গেল। ফলে বাঙলার অরাজকতা বাড়্‌ল বই কমল না।

তারপর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবীর মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাঙলার প্রজার রক্ত শোষণ করলেন। কি উপায়ে তা বলছি।—রাজা টোডর মলের সময় বাঙলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে Land Tax বলা যেতে পারে। এ জমাবৃদ্ধি কোনো নবাব করেন নি। আসল জমা স্থির রেখে নবাবের পর নবাব শুধু আবয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়ে চললেন। এই আবয়াবকে Cess বলা যেতে পারে।

মিরকাশিমের হাতে এই আবয়াব কি রকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষাৎ পাবে Fifth Report-য়ে। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।

তারপর ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে দিল্লীর বাদশা কোম্পানী বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ—সরফরাজ খাঁর আমলে আমলচন্দ্র রায় রায়-রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে আমলচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলার নবাবের কর্ত্তৃক নিযুক্ত হতেন আর কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লীর বাদশার সনন্দের বলে। ফলে কোম্পানী পেলেন বাঙলার অর্দ্ধেক রাজত্ব আর বাকী অর্দ্ধেক রইল নবাব নাজিমের হাতে। এ কালের ভাষায় বলতে হলে—দিল্লীর বাদশা Diarchy-র সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী সংক্রান্ত সকল রাজকার্য্য নবাব নাজিমের হাতে reserved subject-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানীর হাতে যে কি কি বিষয় transferred হয়ে এল, তার সন্ধান নেওয়া দরকার, কেননা এই transfer-সূত্রেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্মলাভ করলে। বলা বাহুল্য নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লীর বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানী বাঙলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন, কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হাতে নিলেন না—নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তারপর ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে মহা দুর্ভিক্ষে (বাঙলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্বন্তর) যখন বাঙলার এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে

প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহা শ্মশানে পরিণত হল তখন কোম্পানীর বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথায় টনক নড়ল। তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে Hastings সাহেবকে বাঙলার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন—প্রধানত খাজানা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে সুব্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা কর আদায় হয় তার পূর্ব্বে কোনো বৎসর তত টাকা হয় নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটেছিল, তার পরিচয় Hunter's Annals of Rural Bengal-এ পাবে। এর ভোগ বাঙালী জাতিকে আরও ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এ মন্বন্তরের ধাক্কা বাঙলা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আর সামলে উঠতে পারে নি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি Emergency legislation বলেছি।

Hastings সাহেব কলকাতায় এসে—বাঙলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকসুরত ইজারা-দারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্ব্বিচারে সর্ব্বোচ্চ ডাককারী-কেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহুল্য ইজারাদার বাঙলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে Hastings সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের ঝগড়া বাধল। কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং Hastings সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই সুযোগে Hastings সাহেবের পরম শত্রু Francis সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতি

ডিরেক্টারদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টার-মহোদয়দের এ বিষয়ে যা হোক একটি মনস্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলাকওয়া অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ উপদেশ মতই, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ—যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorship-এর সূত্রপাত হল সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা সকল সত্ত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠে:—

(১) বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে— প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে ?

(২) জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভূম্যধিকারী, না সরকারের টেক্স কালেক্টর ?

(৩) যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয় তাহলে সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে ?

(৪) জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয় তাহলে তার দেয়ো মাল খাজানা চিরদিনের মত নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হবে কি না ?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তার কারণ এই যে কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না, কেননা কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট।

কি সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হল তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ Fifth Report-য়ে দেখতে পাবে। এস্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে

Sir John Shore প্রমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তারি উল্লেখ করছি।

প্রথম। রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এদেশে জমি-জমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরাজ কর্ম্মচারীদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। বিশেষত তাঁরা যখন বাঙলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরী করবার খাজানা আদায় করবার, বাকী-বকেয়ার হিসাব কিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুসি তাই করবে, তহবিল তছরূপ করবে, রাজা প্রজা দু দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরাজ কালেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশিলদারদের কাছ থেকে হিসেব নিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরাজ কালেক্টরের নেই। অতএব খাজানা যদি নিয়ম মত ও নিয়মিত আদায় করতে হয় তাহলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিম্বা টেক্স কালেক্টর তা বলা অসম্ভব; কেননা Ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি Austin-এর ভাষায় সত্বের অর্থ হচ্ছে:—

"A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration"—

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ সত্ব আছে এ কথা সে কালে কোনো জমিদারও দাবী করেন নি। কেননা তাঁরা জানতেন যে,

রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তি জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাঙলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা এঁদের ভিতর যাঁর খুসি তিনিই যখন তখন জমিদারী জমিদারের গালে চড় মেরে কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদ কুলি খাঁ কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্ব্বংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী না'ও হয় ত, আইনত তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish tenant-দের যে সম্বন্ধ ছিল। এস্থলে Sir John Shore-এর মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be *singularly confused.* The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietory right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zamin-

dar to the simple principles of landlord and tenant". (Fifth Report, Vol. II, p. 520).

এই উদ্ধৃত বাক্য ক'টির বাঙলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই, কেননা কি বাঙলা কি সংস্কৃত এ দুই ভাষাতে এমন কোনো শব্দ নেই যা ইংরাজি real property-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাদের দেশে ও-বস্তু কস্মিন কালেও ছিল না।

Shore সাহেবের কথাই প্রমাণ যে এদেশের জমিদারের সঙ্গে এদেশের রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে লেগেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্ত্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। Lord Cornwallis-এর কিন্তু আর তর সইল না। তিনি আইনের ঠুক-ঠাকের বদলে একঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাঙলার প্রজা বাঙলার জমির উপর তার চিরকেলে সত্ব-স্বামীত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাঙলার জমির নির্ব্যূঢ় সত্বাধিকারী জমিদার নামক এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।

Lord Cornwallis যদি অত তাড়াহুড়ো করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে বসতেন তাহলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজা প্রজার যে সম্বন্ধ সে কালের ইংরাজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল; কালক্রমে তার মর্ম্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে

রায়তের আর যাই থাক জমির উপর কোনোরূপ মালিকীসত্ব নেই এবং পূর্ব্বেও ছিল না লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার। তাই এস্থলে ভারতবর্ষের জমিজমার বিষয় একজন বিশেষজ্ঞ ইংরাজের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"It is well-known that in the only place where the "Laws of Manu" allude to a right in land, the title is an individual one, and is attributed to the natural source—still so universally acknowledged throughout India—that a man was the first to remove the stumps and prepare the land for the plough. At the same time we see, from very early times, how the grain produce of every allotment is not all taken by the owner of the land, but part of it is taken by the owner of the land, and part of it is by custom assigned to this or that recipient. It is not, observe, that the land allotment itself is not completely separated, but when the crop is reaped, the owner (as we may call him) at once recognised that out of his grain heap at the threshing floor, not only the great Chief or Raja, and his immediate headman, but a variety of other villagers, have customary rights to certain shares—if it is only sometimes a few double-handfuls or other small measure. All this seems to spring

from the sense of co-operation (however indirect) in the work of settlement that made the holding possible. It seems to me quite clear that a sense of individual "property" may arise coincidently with a sense of a certain right in others to have a share of the produce (on the ground of co-operation) and the two are not felt to conflict.

(Baden Powell—Village Community. p. 130-31).

কষ্ট করে এর বাঙলা করবার কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা বিলেতি আইন চর্চ্চা করে যাঁদের মন ও মত Sir John Shore-এর অনুরূপ হয়ে উঠেছে তাঁদের দৃষ্টির জন্যই Baden Powell সাহেবের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথম রাজা, তারপর আর পাঁচ জনের, যথা—গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে Badan Powell সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরাজ-রাজ যখন বিদেশীরাজ তখন দেশে এমন একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরাজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদে বিপদে এই দল ইংরাজরাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে যখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হল, বলা বাহুল্য তখন সে মালিকী স্বত্ব চিরস্থায়ী বলে স্বীকৃত হল। যে

সত্ব unlimited in point of duration নয়, সে সত্ব ইংরাজের মতে আইনত মালিকীসত্ব হতেই পারে না।

চতুর্থ। তারপর জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত ধার্য্য করে দেবার প্রস্তাব Francis সাহেব প্রথমে উত্থাপন করেন। তাঁর কথা এই যে, কোম্পানী বাহাদুর বাঙলা থেকে যে রাজস্ব আদায় করবার অধিকারী, তা not a tribute imposed on a conquered people but its land revenue"।

মনে রেখো যে এ সময়ে জন কোম্পানী রাজা হিসেবে নয়, দিল্লীর বাদশার দেওয়ান হিসেবেই ভূমিকর আদায় করবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেরেস্তার ব্যয় সংকুলান করবার জন্য যে পরিমাণ টাকা আদায় করা আবশ্যক তার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা Francis সাহেবের মতে যুগপৎ অন্যায় ও অসঙ্গত। তাঁর নিজের কথা এই :—"The whole demand upon the country, to commence from April 1777, should be founded on an estimate of the permanent services, which the government must indispensably provide for ; with an allowance of a reasonable reserve for contingencies......I know not for what just or useful purpose any government can demand more from its subjects ; for unless expenses are collected for the express purpose of absorbing the surplus, it must be dead in the treasury, or be embezzled. Having ascertained the amount the Government needed to

raise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and "fixed for ever".

(Fifth Report, Vol. I, p. ccc").

সংক্ষেপে Francis সাহেবের মতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যত্র ব্যয় তত্র আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ করবার জন্য, সম্ভাবিত ব্যয় আয়ের একটা বজেট তৈরী করে আবহমান-কালের জন্য সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতানুসারে বাঙলার রাজস্বও চিরস্থায়ী করা হল। উপরোক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ঠিক যে এ দেশের জলবায়ুর গুণে সব জিনিষই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাসত্ত্ব)

এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার সত্ত্ব চিরস্থায়ী হ'ল কিম্বা একদম কেঁচেগল।

প্রজার যে ভিঁটে ও মাটী দুয়ের-ই উপর কিছু কিছু সত্ত্ব ছিল সে-সত্য Sir John Shore প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল! একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত—উভয়েরি যে একযোগে সত্ত্ব-স্বামীত্ব কি করে থাকতে পারে এ ব্যাপার তাঁদের ধারণার বহিভূর্ত ছিল। কেমনা, কি Roman Law, কি বিলাতের Common Law—ও-দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না।

ফলে যে-সম্বন্ধ ছিল মিশ্র তাকে তাঁরা শুদ্ধ করতে চাইলেন। ভারত-বর্ষের মাটীর এমনি গুণ যে সে মাটী যে মাড়ায় সে-ই শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল,—খোদকস্ত আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্ত ও ক্ষেত দু-ই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা। আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে-ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে সুরতজমি চাষ করে তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাসত্ব শুধু খোদকস্ত প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনোরূপ স্বামীত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনোরূপ সত্ব ছিল না।

সে কালের প্রজাসত্বের মোটামুটি ফর্দ্দ নেই।—

(১) প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ—তার জোত ছিল দখলীসত্ববিশিষ্ট।

(২) সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করবার অধিকার খোদকস্ত রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার সত্ব যে মালিকীসত্ব, এ বিষয়ে Privy Council-এর নজির আছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করবার সুযোগ ও প্রয়োজন—এ দুয়েরি বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে জমিদারেরা নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করাতেন।

(৩) জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি

প্রমাণ এই যে, বাঙলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়ান নি। আসল জমা স্থির রেখে আবয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তুর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশমাত্র, সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার রাজারও ছিল না।

খালি বাঙলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই সকল স্বত্বে স্বত্ববান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পি-আর-এস মহাশয়ের "পেশবাদিগের রাজ্য-শাসন পদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

মারাঠী পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় –মিরাসদার বা মিরাঠী (খোদকস্ত) ও উপরি (পাইকস্ত)। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজানা বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজানার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর সত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০ এমন কি ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। * * * * * মিরাসীরা গ্রাম প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকীস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। * * * অবশ্য সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রাম্যসমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্ম্মচারীগণ "পাটীলের" (মণ্ডল) সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন—" (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৬, পৃঃ ৪১১)।

এককথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এই রাজস্বেরই

এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরাজিতে যাকে বলে টেক্সকালেক্টর, অর্থাৎ—জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিসন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারীতে তহশীলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেত।

জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন—এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাঙলার মাটীর সত্ত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপসত্ত্বের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্ত্তন কোম্পানীর বড় কর্ত্তারা সচ্ছন্দ চিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, প্রথম Francis সাহেবের, তারপর Lord Cornwallis-এর; কারণ এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন তার জননী।

Mr Francis proposed, that it should be made an indispensable "condition with the zemindar, that in the course of a stated time, he shall grant new pottahs to his tenants either on the same footing with his own quit rents, that is as long as the

zemindar's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree—"

Francis সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে Shore সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই :—

"The former is the custom of the country, this will become a new *assil jumma* for each ryot, and ought to be as sacred as the zsmindar's quit rent—" (Fifth Report, Vol. II, p. 88).

এখন Lord Cornwallis-এর কথা শোনা যাক্।—

"—unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindar's :—every *begha* of land possessed by them, must have been cultivated under an express or implied agreement, that a certain sum should be paid for each *begha* of produce and no more.—"

(Fifth Report, Vol. II, p. 532).

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যে-সকল সত্ত্বের দাবী করছে সে-সকল সত্ত্ব প্রজার যে মান্ধাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, প্রজার ওই সব মামুলি সত্ত্ব যে তাঁরা আইনত রক্ষা করবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন—"It being the duty of

the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necssary for the protection and welfare of the dependent taluqdars, raiyats and other cultivators of the soil.—" (*Vide.* cl. I, s. 8, reg. I of 1793).

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টারি কমিটিকে কোম্পানী বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যখন মহারণীর আমল সুরু হল তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের দশ আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে Tenancy Act-এর প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য কালক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ আইনের প্রসাদে যে, শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ, ইংরাজিতে যাকে বলে half-measures; অর্থাৎ—আধা-খেঁচড়া ব্যবস্থা, তার ফলে শুধু নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবী আইনত গ্রাহ্য হলে, প্রজা যে হাঁফছেড়ে বাঁচবে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং জমিদার-বর্গের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার

প্রতিপক্ষ না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে সুরু না করি তাহলে দু-দিন বাদে হয়ত দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন :—

"তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার গুণে নহে, অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে সেও তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন সে তোমারই ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দাবে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা—"

তিনি আরও বলেন যে :—

"এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীব সর্ব্বত্র চলিবে—"

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো ?—ইংরাজিতে যাকে বলে Communal property. এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাঙলার প্রজাকে peasant proprietor না

করি তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশি দিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে জমিদারের co-operation-এর যে প্রয়োজন আছে, এই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য।—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।